বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

দুর্গেশনন্দিনী

[১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ত্রয়োদশ সংস্করণ হইতে]

জ্যেষ্ঠাগ্রজ

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

শ্রীচরণে এই গ্রন্থ উপহারস্বরূপ অর্পণ করিলাম।

দুর্গেশনন্দিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—পৌষ ১৩৪৫
দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৫৮

মূল্য আড়াই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
৭.২—১০।৭।১৯৫১

ভূমিকা

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঙ্গলা উপন্যাস এবং বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই বিশেষণটার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কোন নভেলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনা বর্ণিত হইলেই সব সময়ে সেই গ্রন্থকে ঠিকমত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের চিহ্ন এই যে, তাহার মধ্যে ঘটনায় এবং চরিত্রে, ইতিহাস হইতে যাহা জানা গিয়াছে, এরূপ উপাদানই বেশী পরিমাণে এবং নিছক দেওয়া হইয়াছে ; লেখকের কল্পনা তাহার পরিকল্পনায় এবং "অধম" চরিত্রগুলিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। উহাতে বর্ণিত শহর গ্রাম, ঘর বাড়ী, পুরুষ স্ত্রী, পোষাক অস্ত্রশস্ত্র, কথাবার্ত্তা, রীতিনীতি—আর যাহা সবচেয়ে বড়, চিন্তার ধারা এবং বিশ্বাস, এমন কি কুসংস্কার পর্য্যন্ত—ঠিক সেই যুগের জ্ঞাত সত্যের কিছুতেই ব্যতিক্রম করিবে না। লেখক যদি কোন কোন চরিত্রের রোমান্টিক ভাব অথবা আদর্শের প্রতি অনুরাগ বর্ত্তমান সমাজ হইতে চুরি করিয়া সেই পুরাতন অর্দ্ধ-সংস্কৃত যুগে আরোপ করেন, তবে তিনি হাস্যাস্পদ হইবেন। রাম লঙ্কার প্রাচীরের দিকে তোপ দাগিতেছেন—এরূপ ছবি যদি কোন চিত্রকর আঁকেন, তাহা যেমন হাস্যকর হইবে, এটাও ঠিক তাহার মত।

এই "যথার্থ ঐতিহাসিক নভেলের" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত সার্ ওয়াল্টার স্কট প্রথমে রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ (অর্থাৎ ১৮২৮-১৮৫০) ব্যাপিয়া তাঁহার এই আদর্শ ইউরোপময় সাহিত্যে রাজত্ব করে। কেপ্ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে পৌছিতে তাহার বছর দশেক দেরি হয়। কলেজের ছাত্র অবস্থায় বঙ্কিম এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন ; এবং তাঁহার প্রথম বাঙ্গলা উপন্যাস স্কটের প্রণালীর অনুকরণে লিখিত হয় ; যদিও এ কথা সত্য নহে যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' 'আইভ্যান্‌হো'র ছায়া মাত্র। আরও একটা পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে ; 'দুর্গেশনন্দিনী'র আকার এক একখানা ওয়েভার্লি নভেলের সিকি মাত্র, সুতরাং স্কট নিজ নভেলের মধ্যে যে সব জিনিস দিয়াছেন, বঙ্কিম তাহার সমস্তগুলি, অথবা কোন একটি জিনিস সেই প্রভূত পরিমাণে, দিতে পারেন নাই।

শেষ জীবনে বঙ্কিম যে সব গল্প রচনা করেন, তাহার পিছনে একটা করিয়া ইতিহাসের চিত্রপট ঝুলাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলিকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে ধরা যায় না। তাহারা অতিমাত্রায় রোমান্টিক এবং ঊর্দ্ধপ্রবাহিণী ভাবধারা দ্বারা চালিত হওয়ায়, বারো আনারও অধিক কল্পনার দেশে গিয়াছে,—নিছক ইতিহাস হইতে বড় দূরে। 'মৃণালিনী'তে রোমান্স 'দুর্গেশনন্দিনী' অপেক্ষা বেশী, তথাপি উহা ইতিহাসকে

অতিক্রম করে নাই। 'চন্দ্রশেখর'ও সেইরূপ প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস, যদিও রোমান্সের বুক্‌নি দেওয়ায় অতি মনোরম হইয়াছে।

বাহ্যতঃ 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিষয়বস্তু হইল মুঘল সম্রাট্ কর্ত্তৃক পাঠানদের হাত হইতে বঙ্গ-বিজয়। বঙ্কিম পদে পদে ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিয়া এটাকে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার "নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ"ও প্রায়শঃ সত্য ইতিহাস হইতে লওয়া এবং সেই যুগের উপযোগী চরিত্র ও ভাব দিয়া সাজাইয়া তাহাদের খাড়া করা হইয়াছে। এমন কি, মানসিংহের বহু-নারী-বল্লভত্ব, রাজপুত-সম্ভ্রান্তঘরে নিম্নজাতীয়া বাঁদী ("পাস্‌বান্" বা "পাত্রী") রাখা, বঙ্গে মানসিংহের প্রতিনিধির অতুলনীয় বীরত্ব এবং অধিকসংখ্যক পাঠান-সেনার পরাজয়, দুর্গমধ্যে অত্যাচার ও খুন—এ সব কথা সেই যুগের সত্য ইতিহাস হইতে জানা যায়। তাঁহার কল্পনা হইতে আসিয়াছে শুধু জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেমকাহিনী এবং আয়েষার দেবকন্যা-সদৃশ চরিত্র-কথা।

প্রকৃত ইতিহাস বেশী গভীরভাবে খুঁড়িলে রোমান্স অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়। কোনও তিলোত্তমা যদি সত্য জগৎসিংহকে বিবাহ করিতেন, তবে তাঁহার কপালে অকাল-বৈধব্য লেখা ছিল; কারণ, কুমার জগৎসিংহ অল্প বয়সে (১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) অতিমাত্রায় মদ খাইয়া মারা যান। এবং জগৎসিংহ স্বয়ং নহেন, তাঁহার রাজপুত স্ত্রীর পুত্র মহাসিংহ বাল্যকালেই মানসিংহের প্রতিনিধিরূপে বাঙ্গলায় গিয়া অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। (বেভরিজের অনুবাদ 'আকবরনামা,' ৩য় খণ্ড, ১২১৩-১৪ পৃষ্ঠা)।

বঙ্কিমের অজ্ঞাত, ১৯১৯ সালে আমার দ্বারা আবিষ্কৃত একখানা ফার্সী হস্তলিপি হইতে উস্‌মানের বীরচরিত্র সত্য ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির নাম 'বহারিস্তান্-ই-ঘাইবী,' ইহা মির্জা নাথন্ নামক একজন মুঘল কর্ম্মচারীর আত্মকাহিনী এবং ইহাতে জাহাঙ্গীর বাদশার প্রায় সমস্ত রাজ্যকাল ব্যাপিয়া (১৬০৮-১৬২৫ পর্য্যন্ত) বাঙ্গলা, বিহার উড়িষ্যা ও আসামের ঘটনাবলীর অতি বিস্তৃত বিবরণ আছে; কারণ, এই সমস্ত সময় নাথন্ বঙ্গদেশে সেনাপতির কাজ করিতেন। জগতে ইহার একমাত্র পুঁথি আছে, তাহা প্যারিস্ নগরীর সরকারী পুস্তকালয়ে রক্ষা পাইয়াছে। দুই বৎসর গত হইল, ঢাকার অধ্যাপক ডাক্তার বোরা ইহার ইংরেজী অনুবাদ ছাপিয়াছেন। এই বহারিস্তানের ফার্সী মূল হইতে আমি উস্‌মানের শেষ যুদ্ধের ও মৃত্যুর সত্য বিবরণ অনুবাদ করিয়া ১৩২৮ সালে প্রকাশিত করি, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"বাঙ্গলার সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া যশোহর রাজ্য অধিকার করিলেন।...উস্‌মানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুত হইল। ইহার প্রধান সেনাপতি হইলেন সুজায়েৎ খাঁ।... ঢাকা হইতে ছয় কুচে এগারসিন্দুরে পৌঁছিয়া এই সেনাপতি তথায় এক সপ্তাহ বিলম্ব করিলেন।...পরে

সরাইল হইতে স্থলপথে তরফের দুর্গে পৌঁছিলেন [তরফ্ সরাইল হইতে একটানে ৩৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, হবিগঞ্জ হইতে আট দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে।]...৩রা ফেব্রুয়ারি ১৬১২ খ্রীঃ কুর্বানী ইদ্ পালন করিয়া বাদশাহী সৈন্য পরদিন টুপিয়া দুর্গে পৌঁছিল।

"..নিজ রাজধানী 'উহার' [=পাটান উশার] হইতে রওনা হইয়া উস্‌মান দুই কুচে চৌয়ালিশ পরগণার দৌলম্বাপুর গ্রামে আসিয়া নামিলেন। [তখন তাঁহার বয়স ৪১ বৎসরে পড়িয়াছে।]...সম্মুখে কাদাপূর্ণ জলাভূমি রাখিয়া উস্‌মান নিজ শিবিরকে দুর্গে পরিণত করিলেন।...সুজায়েৎ খাঁ সংবাদ পাইয়া উস্‌মানের দুর্গের আধ ক্রোশ দূরে অর্থাৎ জলাভূমির এপারে, নিজ শিবির স্থাপন করিলেন।...পরদিন প্রত্যুষে যুদ্ধ হইবে।

"দৌলম্বাপুরের যুদ্ধ, ২রা মার্চ ১৬১২।...সেই নরম জলাভূমির ধারে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উস্‌মানের কতকগুলি সৈন্য বীরদর্পে জলা পার হইয়া আসিয়া মুঘলদের সম্মুখে অস্ত্র ঘুরাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বাদশাহী পক্ষ হইতে কয়েক জন সেনানী উহাদের উপর গিয়া পড়িল।...নিজদল ও শত্রুদল জলার সম্মুখে মিশিয়া যাওয়ায়, পশ্চাতে যে সব বাদশাহী তোপ ছিল, তাহার গুলিতে আহত হইয়া মুঘল বীরগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

"এদিকে বাদশাহী দক্ষিণ বাহুর নেতা ইফ্‌তিখার খাঁ কয়েক জন মাত্র অনুচর লইয়া জলা পার হইয়া (উস্‌মানের শিবিরের দিকে) পৌঁছিয়া উস্‌মানের ভ্রাতা ওলীকে এমন কাবু করিলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হন আর কি।

"উস্‌মান কেন্দ্র হইতে ইহা দেখিয়া ওলীকে ছেলেমানুষ বলিয়া গালি দিয়া, ও নিজ পাশে সজ্জিত দুই তিন হাজার পরিপক্ক সৈন্য ও বিখ্যাত রণহস্তীগুলি লইয়া আফঘান রণ-নাদ "হুঁ" "হুঁ" গর্জ্জন করিয়া, ছুটিয়া ইফ্‌তিখার খাঁকে আক্রমণ করিলেন।...আফঘানেরা রণ-শৃঙ্গার নামক বিখ্যাত বাদশাহী হস্তীকে চারি দিকে ঘিরিয়া শত আঘাতে কাবাবের মাংসের মত করিয়া কাটিয়া ফেলিল, মুঘলদের ঘোড়াগুলির পায়ের রগ্ কাটিয়া নিমেষে আরোহীদের ধরাশায়ী করিল।

"একজন আফঘানের সহিত ইফ্‌তিখার খাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি এক আঘাতে উহাকে ভূমিশায়ী করিলেন, কিন্তু উহার ভাই ছুটিয়া আসিয়া তরবারি ছুঁড়িয়া খাঁর বাম হস্তের বর্ম্মসহিত কব্‌জা কাটিয়া ফেলিল।...তখন শেখ আবদুল জলীল নামক ইফ্‌তিখারের এক জন অনুগত সৈন্য প্রভুর দুর্দ্দশা দেখিয়া, নিজের ঘোড়া ছুটাইয়া, উস্‌মানের হাতীর সম্মুখে পৌঁছিয়া তাঁহার মুখ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। তীরটি উস্‌মানের বাম চক্ষু দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। কিন্তু উস্‌মানের নিক্ষিপ্ত বর্শায় বুকে বিদ্ধ হইয়া শেখ পড়িয়া গেল।...

"নিজ সৈন্যগণ যেন তাঁহাকে জখম দেখিতে না পায়, এজন্য উস্‌মান এত মারাত্মক আঘাত পাইবার পরও দুই হাতে তীরটি টানিয়া বাহির করিলেন; তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুও ঐ সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল; কারণ, দুই চোখের রগ্‌গুলি একত্র জড়িত থাকে। বাম হাতে রুমাল লইয়া নিজমুখ ঢাকিয়া, উস্‌মান মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমর! সুজায়েৎ খাঁর সৈন্যবিভাগ কোন্ দিকে?"...সে উত্তর করিল, "মিয়াঁ, সালামৎ! ঐ যে সামনে মহুয়া গাছ দেখিতেছেন, তাহার নীচে পতাকা দেখা যাইতেছে।

সুজায়েৎ খাঁ নিশ্চয়ই উহার নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।” উস্‌মানের তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না; দক্ষিণ হস্ত মাহুতের পিঠে রাখিয়া সেখানে হাতী চালাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

“তাহার পর অনেক ক্ষণ যুদ্ধ চলিল; মুঘলেরা অনেকে হত-আহত হইলেও পরাস্ত হইল না; আফঘানদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে উস্‌মানের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পুত্র মুম্‌রেজ্‌ পিতার মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে সঙ্গে লইয়া আবার মুঘলদের সম্মুখীন হইল।···অনেক ক্ষণ ধরিয়া দুই পক্ষের অদ্ভুত গজযুদ্ধ চলিল।···

“প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হাতাহাতি যুদ্ধ চলিল, কেহই কাহারও খোঁজ লইবার অবসর পাইল না। বাতাস এত গরম হইয়া উঠিল যে, মানুষ ও ঘোড়ার যেন দম বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বাদশাহী সৈন্য হটিল না দেখিয়া অবশেষে আফঘানেরা হতাশ হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল।··· সেই জলাভূমির পশ্চিম ধার হইতে তাহারা আবার জলা পার হইয়া নিজ শিবিরের দিকে (অর্থাৎ পূর্ব্ব পারে) ফিরিয়া আসিল। আফঘান নেতারা উস্‌মানের মৃত্যু লুকাইয়া রাখিয়া মহাবিক্রমে হস্তীর সাহায্যে এত ক্ষণ যুদ্ধ চালাইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে দুই পক্ষই এত ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে, ঘোড়া আর চলিতে পারে না, অশ্বারোহী জিনের উপর বসিয়া থাকিতে পারে না,—যুদ্ধ করা ত দূরের কথা। বৈকাল ও রাত্রি জুড়িয়া দুই পক্ষ হইতে শুধু গোলাগুলি চলিতে লাগিল।

“পর দিন প্রভাত হইবার ছয় ঘড়ি মাত্র বাকী থাকিতে, আফঘানেরা শিবির খাড়া রাখিয়া সকলে উহারে পলায়ন করিল। রণক্ষেত্র হইতে এক রাত্রি ও দিনে পলাতকগণ উহারে পৌঁছিয়া সব কন্যা ও স্ত্রীগণকে হত্যা করিয়া···দুইটি পর্ব্বতের মধ্যে এমন স্থানে উস্‌মানকে গোপনে গোর দিল যে, মুঘলেরা যেন সে স্থান জানিতে পারিয়া বিদ্রোহী পাঠানরাজের মৃতদেহ হইতে মাথা কাটিয়া লইয়া বাদশাহের নিকট পাঠাইতে সক্ষম না হয়।”

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে সত্য ইতিহাস কতটুকু আছে? মানসিংহ, জগৎসিংহ, কুৎলু খাঁ, খ্বাজা ইসা, উস্‌মান—ইঁহারা সকলেই ঐতিহাসিক পুরুষ এবং সে যুগে বঙ্গের ঠিক সেই স্থলে বাস করিতেন। ইহাও সত্য ইতিহাস যে, জগৎসিংহ অগণিত পাঠানদের নিকট পরাজিত হইয়া এক দুর্গে আশ্রয় লন এবং তাহার কিছু দিন পরেই কুৎলু খাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দেওয়ান খ্বাজা ইসা কুৎলুর বালক পুত্রদের রাজ্য বাঁচাইবার জন্য মানসিংহের সহিত দেখা করিয়া বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন। ইহা ভিন্ন ‘দুর্গেশনন্দিনী’র আর সব কথা কাল্পনিক। এই সন্ধিতে জগৎসিংহ মধ্যস্থ ছিলেন না। তবে, বঙ্কিম কি বাকী সব ঐতিহাসিক দৃশ্যপট নিজ কল্পনা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলা, সকলেই কাল্পনিক, এ কথা পাঠক সহজেই ধরিয়া ফেলিবেন, এবং তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জগৎসিংহের আহত হওয়া, কুৎলুর দুর্গে আবদ্ধ থাকা, এবং তাঁহার দ্বারা কুৎলুর মরণকালে সন্ধি ভিক্ষা করা, এই শাখা-পল্লবগুলি ইতিহাসের বাহিরে হইলেও বঙ্কিমের নিজ কল্পনার সৃষ্টি নহে। এগুলি আসিয়াছে ঐতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কাল্পনিক সাহেবের লেখা হইতে, তিনি কাপ্তান এলেক্‌জাণ্ডার ডাও

(Alexander Dow)। এই সাহেবটি ফিরিস্তার রচিত হিন্দুস্থানের ইতিহাস ইংরাজীতে প্রায়শঃ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন বলিয়া এবং নিজ গ্রন্থের নামপত্রে ফিরিস্তার নাম সংযোগ করিয়া দিয়া অপর্য্যাপ্ত মেকী কথা চালাইয়াছেন, যাহা ফিরিস্তা ত লেখেন নাই ; এমন কি, কোন পারসিক লেখকের পক্ষে সেরূপ লেখাও সম্ভব ছিল না।

ইংরাজ ঐতিহাসিকশ্রেষ্ঠ এডওয়ার্ড গিবন্ পারসিক ভাষা জানিতেন না, কিন্তু দেবদত্ত প্রতিভাবলে তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ডাও ফিরিস্তার নাম দিয়া নিজ রচনা চালাইয়াছেন। এক স্থলে ডাও হইতে তথাকথিত ফিরিস্তার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া গিবন্ পাদটীকায় তাঁহার অতুলনীয় ব্যঙ্গ ভাষায় টিপ্পনী করিয়াছেন—

I have copied this passage as a specimen of the Persian manner ; but I suspect that by some odd fatality, the style of Ferishta has been improved by that of Ossian. (*Decline and Fall*, Bury's ed., vi. 230*n*)

সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ বলিয়াছেন—"I knew Dow, who understood little or nothing of Persian, and his history was translated [from Persian] into Hindoostanee by a native, from whose information the Colonel's work was framed." (Wraxall's *History of my own Times*)

অর্থাৎ "পারসিক রচনার বাগাড়ম্বরের দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এই কথাগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু আমার মন হইতে সন্দেহ যাইতেছে না যে, অদ্ভুত অদৃষ্টযোগে এইখানে ফিরিস্তার রচনা-পদ্ধতিকে অসিয়ানের গদ্যের ভেজাল মিশাইয়া চমৎকার উন্নত করা হইয়াছে !" [অসিয়ান একজন প্রাচীন স্কটীশ "গেলিক" কবি ছিলেন, তাঁহার দু-দশটি আসল পদ মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু ম্যাকফার্সন নামক একজন জালিয়াৎ আধুনিক কবি বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় নিজে কবিতা লিখিয়া তাহা অসিয়ানের নব-আবিষ্কৃত লুপ্ত পদাবলী বলিয়া কিছু দিন চালাইয়া দেন, ঠিক যেমন আমাদের সাহিত্যে "গোবিন্দদাসের কড়চা" অথবা "চণ্ডিদাস-চরিত"।]

ডাও সাহেবের মেকী ইতিহাস হইতে লইয়াছেন কাপ্তেন চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট, যাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাস (১৮১৩ খ্রীঃ প্রকাশিত) বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র সম্বল ছিল। তখনও আকবরের সমসাময়িক পারসিক ইতিহাসগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ হয় নাই, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র কি করিয়া মানসিংহের বঙ্গ-বিজয়ের নির্ভুল সংবাদ পাইবেন ? ডাও> ষ্টুয়ার্ট> বঙ্কিম এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

৯৯৮ হিজরী সালে রাজা মানসিংহ বিহার হইতে সসৈন্যে পাঠানদের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের দিকে রওনা হইলেন এবং বাঙ্গলায় নিজ প্রতিনিধি-সুবাদার সৈয়দ খাঁকে সৈন্য লইয়া যোগ দিতে লিখিলেন। বর্দ্ধমান পৌঁছিয়া রাজা জানিলেন যে, সৈয়দ খাঁ বর্ষা শেষ না হইলে সৈন্য গুছাইয়া লইয়া আসিতে পারিবেন না, এরূপ লিখিয়াছেন। মানসিংহ

জেহানাবাদে শিবির স্থাপন করিয়া বর্ষাশেষের প্রতীক্ষায় রহিলেন। এই অবসরে কুৎলু খাঁ নিজের এক দল সৈন্য ধীরপুরে—জেহানাবাদ হইতে ৫০ মাইল দূরে—পাঠাইয়া ঐ দেশটা লুঠ করিতে লাগাইয়া দিলেন; আফঘানদের এই ধ্বংসকাজ থামাইবার জন্য রাজা নিজ পুত্র জগৎসিংহকে পাঠাইয়া দিলেন; জগৎসিংহ প্রথমে পাঠানদের হটিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া, পরে তাহাদের কপট সন্ধিপ্রস্তাবে প্রতারিত হইয়া, অবশেষে আফঘানদের দ্বারা আক্রান্ত, পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাহারা তাঁহাকে বি স ন্ত পু রে ধরিয়া লইয়া গেল, এবং কয়েক দিন পর্য্যন্ত গুজব রটিল যে, তাহারা জগৎসিংহকে হত্যা করিয়াছে। বাদশাহের সৌভাগ্য-ফলে, কুৎলু খাঁ আগে হইতেই অসুস্থ ছিলেন, এবং এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরে মৃত হইলেন। আফঘান-প্রধানেরা জগৎসিংহকে মুক্তি দিয়া, তাঁহার মধ্যস্থতায় মানসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন, ইত্যাদি।

এখানে অসংখ্য ভুল আছে। তারিখের গোলমাল এবং ঘটনার উলটপালট সাজান ষ্টুয়ার্টের পুস্তকে এত বেশী যে, তাহার সংশোধন করিতে হইলে বইখানি আমূল নূতন করিয়া লিখিতে হয়। আমরা এখানে শুধু দুর্গেশনন্দিনীর বিষয়বস্তুরই খাঁটী ইতিহাস দিব। জগৎসিংহের এই যুদ্ধ একমাত্র 'আকবরনামা'য় (৩য় ভলুমে) আছে,—নিজামুদ্দীন, ফিরিশ্‌তা, মালদহবাসী ঘুলাম হুসেন সালিম, কেহই তাঁহার নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। প্রথমে বলিয়া রাখি যে, সৈয়দ খাঁ স্থলে "সাইদ" খাঁ হইবে (অর্থ ভাগ্যবন্ত, কিন্তু সৈয়দ বংশ-সম্ভূত নহে)। সে ছিল বাঙ্গলার পাকা সুবাদার, মানসিংহের ডেপুটী বা নায়েব নহে; মানসিংহ তখন শুধু বিহারের সুবাদার ছিলেন। বি স ন্ত পু র নামটি 'গড়বিষ্ণুপুর' শব্দের পারসিক লেখার ভুল আকার; সেই দুর্গ আকবরের ভক্ত সামন্তরাজা বীর হাম্বিরের রাজধানী, পাঠানদের হাতে ছিল না।

জগৎসিংহের ঐতিহাসিক কাহিনী

('আকবরনামা,' ৩য় খণ্ড, মূলের ৫৮০ পৃ., বেভরিজ-কৃত অনুবাদের ৮৮৯ পৃ.)

রাজা মানসিংহ বিহার প্রদেশের বিদ্রোহীদিগকে পূর্ব্ববৎসর দমন করিবার পর ৯৯৮ হিজরী সনে [বাঙ্গলা ৯৯৭ সালে] ঝাড়খণ্ডের পথে উড়িষ্যা জয় করিবার জন্য রওনা হইলেন।···ভাগলপুর ও বর্দ্ধমান হইয়া জেহানাবাদে পৌঁছিয়া তথায় শিবির স্থাপন করিলেন, বর্ষাশেষে জমিদারগণ সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিবে, এই প্রতীক্ষায়। কুৎলু যুদ্ধাভিলাষে উড়িষ্যা হইতে ধরপুর (১) আসিলেন। এই স্থানটি মানসিংহের শিবির হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে। সেখান হইতে কুৎলু নিজ সেনাপতি বাহাদুর কূরূঃকে প্রকাণ্ড সৈন্যদল সহ রায়পুরে (২) পাঠাইলেন। রাজা মানকুমার জগৎসিংহের অধীনে এক ফৌজ

তাহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন, এবং বাহাদুর একটি দুর্গে আশ্রয় লইয়া কুমারকে ভুলাইতে আরম্ভ করিল। বাহাদুর শয়তানি চালাকির দ্বারা এই অনভিজ্ঞ যুবক কুমারকে অসাবধান করিয়া ফেলিল, এবং তাহার পর কুৎলুর নিকট আরও সৈন্য সাহায্য চাহিল। ২১এ মে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন জগৎসিংহ মদের নেশায় ঘুমাইয়াছিলেন, তখন কুৎলুর অগণিত সৈন্য তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিল এবং পরাস্ত করিয়া দিল।...জমিদার হামির জগৎসিংহকে কত বলিয়াছিলেন যে, বাহাদুর প্রতারক এবং তাহার বলবৃদ্ধির জন্য আরও পাঠান সৈন্য আসিতেছে, কিন্তু কুমার তাঁহার কথা শুনিলেন না।...জগৎসিংহ আরও অধিক অসতর্ক হইয়া রহিলেন। দিনশেষে শত্রুরা আসিয়া [কুমারের শিবিরে] পেঁাছিল ; পরামর্শ ও বন্দোবস্তের সূত্র ছিন্ন হওয়ায় অধিকাংশ বাদশাহী সৈন্য যুদ্ধ না করিয়াই পালাইল। অল্প ক'জন বীর খাড়া থাকিয়া যুদ্ধ করিল ; তাহাদের মধ্যে বীকা রাঠোর, মহেশ দাস [গৌড় ?] এবং নরু চারণ বীরত্বের সহিত প্রাণ বিসর্জন করিল। যদিও বাদশাহী সৈন্যদলের পরাজয় হইল, তথাপি [শত্রুপক্ষে] উমর খাঁ, মীরু এবং হুমায়ুন কুলীর পুত্রগণ, তাহাদের কয়েক জন অনুচর সহিত রণে মারা গেল। হামির ঐ প্রমত্ত যুবক জগৎসিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ রাজধানী বিষ্ণুপুরে আনিলেন। একটা গুজব রটিল যে, কুমার মারা গিয়াছেন।...

এই সময় শাহান্‌শাহের ভাগ্য ফলিল। দশ দিন পরে কুৎলু মারা গেল ; তাহার রোগ হইয়াছিল এবং শীঘ্রই জীবন শেষ হইল। খ্বাজা ইসা [কুৎলুর দেওয়ান, এবং উস্‌মানের পিতা]...সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহী সৈন্যেরা অতিবৃষ্টি এবং মনঃপীড়াতে অভিভূত ছিল, এ জন্য সন্ধি করিতে সম্মত হইল। আফঘানেরা বাদশাহকে অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করিল, এবং আকবরের নামে খুৎবা পড়িতে ও মুদ্রা অঙ্কিত করিতে এবং পুরীর জগন্নাথমন্দির ও তাহার চতুর্দ্দিকের জমি বাদশাহী সরকারকে দিতে প্রতিশ্রুত হইল। ১৫ই আগষ্ট খ্বাজা ইসা কুৎলুর পুত্র (জ্যেষ্ঠ পুত্র নসীর)কে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং ১৫০টি হস্তী এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপহার দিল। তাহার পর মানসিংহ বিহারে ফিরিলেন।

[এখানে শুধু বলা আবশ্যক যে, জগৎসিংহ অতিশয় মদ খাওয়ার ফলে ৬ অক্টোবর ১৫৯৯ খ্রীঃ আগ্রার নিকট অকালমৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু মানসিংহের আর দুই পুত্র— হিম্মৎসিংহ এবং দুর্জনসিংহ বঙ্গে অনেক বার বীরত্ব দেখাইয়া যুদ্ধ করেন ; দুর্জনসিংহ কাত্রাভুর নিকট যুদ্ধে প্রাণ হারান।]

স্থানীয় কোন্ অনুসন্ধান আবশ্যক ?

জগৎসিংহের পরাজয় কোন্ স্থানে হয় ? মুঘলবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র ছিল জেহানাবাদে, অর্থাৎ বর্ত্তমান আরামবাঘে। পলাতক জগৎসিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে

বিষ্ণুপুরে অর্থাৎ আরামবাঘের উত্তর-পশ্চিমে লইয়া গিয়া রক্ষা করা হয়, সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, পাঠানরা দলবলে যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে, আরামবাঘের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্র বিষ্ণুপুর হইতে অত্যন্ত অধিক দূর হওয়া সম্ভব নয়; কারণ, (ক) জগৎসিংহের ক্ষুদ্র সৈন্যদল (ডিট্যাচ্‌মেণ্ট) তাঁহার আশ্রয় (base) আরামবাঘ হইতে বেশী দূরে যাইবে না, এবং (খ) পলাতকদের আশ্রয়স্থল বিষ্ণুপুর এক বা দুই দিনে হস্তিপৃষ্ঠে পৌঁছা গিয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত কাল্পনিক হইবে না। সুতরাং এই রায়পুর গ্রাম (অথবা মাটির গড়) ঐ অঞ্চলে কোথায় ছিল, তাহা খুঁজিতে হইবে। নামটা এখনও থাকিতে পারে।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত একখানা বড় সার্ভে ম্যাপে আমি পাইলাম—কস্‌বা জেহানাবাদ হইতে ৭ মাইল পশ্চিম দিকে মন্দারণ গ্রাম, এবং এই মন্দারণের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীপুর গ্রাম। পারসিক হস্তলিপিতে "শ্রীপুর" শব্দ অযত্নে লিখিলে এবং ঠিকমত নুক্‌তা না দিলে সহজেই "বা-রায়পুর" অর্থাৎ রায়পুরে পড়া অতি সহজ। শ্রীপুরের খুব কাছে আছে "ভিতর গড়," সেখানে নদীটি বাঁকিয়া গিয়াছে। গড়বিষ্ণুপুর শ্রীপুর হইতে সোজা লাইনে ২৪ মাইল। প্রথম প্রশ্ন, এই শ্রীপুর কি 'আকবরনামা'র রায়পুর?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই :—ধরপুর বা ধীরপুর কোথায়? ঐ ম্যাপে ঘাটাল হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে পাইতেছি "হীরা-ধর-পুর" (অদ্ভুত নাম!), স্থানটি বিখ্যাত রাধানগর গ্রাম হইতে ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। 'আকবরনামা'র মূল পারসিক গ্রন্থের তিনখানি প্রাচীন হস্তলিপি হইতে ঐ নামের তিনটি পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে; যথা—ধরপুর, ধীরপুর ও ধরমপুর। কিন্তু এই স্থানটি কস্‌বা জেহানাবাদ হইতে সোজা লাইনে ২০ মাইল মাত্র—২৫ ক্রোশ নহে। পথ কিন্তু কম্পাসে টানা সোজা লাইন হয় না। ঐ স্থানে মাটির দুর্গ ছিল কি?

অবশেষে দুটি কথা বলা আবশ্যক। বঙ্গদেশ পাঠান শের শাহের হাতে পড়িবার পর হইতে মানসিংহ কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় পর্য্যন্ত এই ষাট বৎসরে পাঠানদের রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী ও সেনাপতির মধ্যে এতগুলি লোক খুন হন যে, তাহার তালিকা ছাপিলে এক পৃষ্ঠারও অধিক হইবে। সুতরাং কুৎলু খাঁর অপঘাতমৃত্যু বঙ্গীয় লেখকের অসম্ভব কল্পনা ছিল না।

আর, জয়পুরের রাজপুত্র যে বঙ্গদেশের একজন জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করিলেন, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। কারণ, জয়পুরের নিজস্ব ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়, এই কয় বৎসরের মধ্যে মানসিংহ ও তাঁহার বংশীয় কুমারগণ কুচবিহার হইতে দুটি, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে একটি, উড়িষ্যা হইতে একটি, বিহার হইতে একটি, এই পাঁচটি রাজা ও জমিদার-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে কোন শাস্ত্রীয় বাধা হয় নাই।

শ্রীযদুনাথ সরকার

ভূমিকা

(সম্পাদকীয়)

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা উপন্যাস, বাংলায় প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসও বটে। ইহার প্রথম প্রকাশকাল ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্রে ইহাকে "ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস" বলিয়াছিলেন। ইতিহাসের দিক্ দিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিচার সার্ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট তাঁহার ভূমিকায় করিয়াছেন।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ দিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিকত্ব অসাধারণ; ইহাকে যুগান্তকারী উপন্যাস বলা চলে। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর বাঙালী অনুভব করিয়াছিল, বাংলা ভাষাতেও উচ্চশ্রেণীর শিল্পসৃষ্টি সম্ভব; বঙ্কিমচন্দ্রও নিজের ক্ষমতা এই পুস্তকেই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে অপরূপ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—

> বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।
>
> পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য!··· মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।—'আধুনিক-সাহিত্য,' পৃ. ২।

শচীশচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার যে ইতিবৃত্ত দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, ইহা ১৮৬২ সনে বঙ্কিমের ২৪ বৎসর বয়সে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৩ সনে তাঁহার খুলনায় অবস্থানকালে শেষ হয়। পুস্তকের গুণাগুণ তিনি নিজে ঠাহর করিতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে পাণ্ডুলিপি পড়িতে দেন। তাঁহারা পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করাতে "বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান" করেন।*

১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-সংখ্যা 'প্রদীপে' বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্ম্মী কালীনাথ দত্ত লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক স্মৃতিকথা পাঠে বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে আসিয়া

---

* 'বঙ্কিম-জীবনী,' তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৬১।

'দুর্গেশনন্দিনী' সমাপ্ত করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে বদলি হন। সুতরাং কালীনাথ দত্তের সাক্ষ্য মানিতে হইলে বলিতে হইবে, 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধেই প্রকাশিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনা ও প্রকাশ সম্পর্কে সহোদর পূর্ণচন্দ্রের সাক্ষ্যও মূল্যবান। তিনি লিখিয়াছেন—

> 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাবে প্রথমতঃ কলিকাতার সংস্কৃতওয়ালারা খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজীওয়ালারা অবশ্য দু'হাত তুলিয়া বাহবা দিয়াছিলেন।...বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোনও পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতেন না, অথবা সহোদর ভিন্ন কাহাকেও সে পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিতে দিতেন না, কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে উহা কাঁঠালপাড়ার বাটীতে অনেককে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।...দুই দিনে গল্পপাঠ শেষ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতেই ধারণা ছিল যে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা ব্যাকরণ-দোষে দূষিত। সে জন্য তিনি গল্পপাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাষায় ব্যাকরণ-দোষ আছে—উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?" ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন (সংস্কৃত কলেজের ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রীর পিতা) বলিলেন, "গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি যে অন্য দিকে মন নিবিষ্ট করি!" বিখ্যাত পণ্ডিত ৺চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে, "আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ-দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।"...'দুর্গেশনন্দিনী' প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভূদেববাবুর জামাতা) এবং সেকালের বিখ্যাত সমালোচক ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিয়াছিলেন, "তোমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি 'দুর্গেশনন্দিনী' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিবে, কিন্তু এই উপন্যাসটি যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিবে, তেমন তোমার অন্য উপন্যাস করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।" ...কোন প্রসিদ্ধ লেখক* ...লিখিয়াছেন যে, "বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করিয়া অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থখানি প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।" কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক।
> —'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ. ৬৯-৭২।

পূর্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, তাঁহাদের বাল্যকালে খুল্লপিতামহের নিকট শ্রুত গড় মান্দারণের একটি ঘটনা 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকিবে। বিষ্ণুপুর, জাহানাবাদ ও মান্দারণ অঞ্চলে উক্ত বৃদ্ধের যাতায়াত ছিল; তিনি জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বৃদ্ধের মুখে এ সকলের এবং স্থানীয় জমিদারের স্ত্রীকন্যা সহ পাঠানদের হাতে বন্দী হওয়ার ও তাঁহার সাহায্যার্থ জগৎসিংহের

* গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

আগমনের সরস গল্প শুনিয়াছিলেন।* 'রহস্য-সন্দর্ভে'র সমালোচনাতেও জাহানাবাদ অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীন কাহিনীর উল্লেখ আছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র 'আইভ্যান্‌হো'-সম্পর্কিত একটা অপবাদ বরাবর আছে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও কালীনাথ দত্তের নিকট বলিয়াছিলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার পূর্ব্বে তিনি 'আইভ্যান্‌হো' পড়েন নাই। কালীনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহার honesty unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।"† শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তৎপ্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকের ৬৭-৭৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্কটের পুস্তকের সহিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র সাদৃশ্য থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। ১৮৭১-৭৩ সনের *Macmillan's Magazine*এর ৪৬০ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক কাউয়েল (Cowell) বলিয়াছেন, "It is far from being a mere servile copy."

সমসাময়িক সাময়িক-পত্রিকায় 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকে একটি বিশেষ ঘটনা ধরিয়া লইয়া নানা বিচিত্র আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রশংসার ভাগই বেশী। নিম্নলিখিত আলোচনাগুলি উল্লেখযোগ্য—১। 'সংবাদ প্রভাকর,' ১৪ এপ্রিল ১৮৬৫ ; ২। 'রহস্য-সন্দর্ভ,' ২য় পর্ব্ব, ২১ খণ্ড, সংবৎ ১৯২১, পৃ. ১৩৯-৪৪ ; ৩। 'সোমপ্রকাশ,' ২৪ এপ্রিল ১৮৬৫ ; ৪। *Hindoo Patriot*, ২৪ এপ্রিল ও ১৫ মে ১৮৬৫।

'হিন্দু পেট্রিয়টে' 'আইভ্যান্‌হো'-সংক্রান্ত অপবাদ আলোচিত হইয়াছিল। মোটের উপর, সকলেই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, বাংলা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র যশ হয় নাই, এ কথা ঠিক নহে। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে একটি অভিনন্দন-পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে বলা হইয়াছে, "আপনি এক্ষণে আমাদিগকে নবপল্লবিত অক্ষয় বৃক্ষের অমৃত ফলের রসাস্বাদন করাইলেন।" ২ নবেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রেরিত পত্রের মধ্যে দেখা যায়, দুই জন মহিলাও 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'দুর্গেশনন্দিনী'র তেরটি সংস্করণ হয়। প্রথম সংস্করণ ১৮৬৫ এবং ত্রয়োদশ সংস্করণ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জে. এফ. ব্রাউন (J. F. Browne, B. C. S.) ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক কলিকাতা, থ্যাকার স্পিঙ্ক অ্যাণ্ড কোম্পানি দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। দামোদর মুখোপাধ্যায়

* 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ. ৪৯-৫০।

† 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ. ২১৫।

'আয়েসা' ও 'নবাব-নন্দিনী' নাম দিয়া 'তুর্গেশনন্দিনী'র অক্ষম "উপসংহার" ও "অনুসরণ" প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচলিত জীবনচরিতগুলিতে (হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, তারকনাথ বিশ্বাস, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতি) 'তুর্গেশনন্দিনী' লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আছে। এতদ্ব্যতীত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র বসু, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও 'তুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা, চিত্র ও চরিত্র লইয়া নানা আলোচনা করিয়াছেন। সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত 'তুর্গেশনন্দিনী'-বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে। বর্ত্তমান যুগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকেরা প্রায় প্রত্যেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং প্রসঙ্গতঃ 'তুর্গেশনন্দিনী' সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন।

'তুর্গেশনন্দিনী' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বর তারিখে নাট্যীকৃত হইয়া বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'তুর্গেশনন্দিনী'র নিম্নলিখিত অনুবাদগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—

১। ইংরেজী : *Durgesa Nandini ;* or, The Chieftain's Daughter : trans. into English prose by Charu Chandra Mookerjee, Calcutta 1880.

২। হিন্দুস্থানী : 'তুর্গেশনন্দিনী' by K. Krishna, Lucknow, 1876.

৩। হিন্দী : 'তুর্গেশনন্দিনী' by G. Simha, Benares, 1882.

৪। কানাড়ী : 'তুর্গেশনন্দিনী' by B. Venkatachar, Bangalore, 1885.

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবমন্দির

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে এক দিন এক জন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি-ধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে আশ্রয়-স্থান আছে জানিয়া, অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দ্বার রুদ্ধ; হস্তমার্জ্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দ্দিক্ হইতে রুদ্ধ হয় নাই। এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে এমন সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। মস্তকোপরি প্রবল বেগে ধারাপাত হইতেছিল, সুতরাং যে কোন ব্যক্তি দেবালয়-মধ্য-বাসী হউক, পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বারোন্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত

করেন, কিন্তু দেবালয়ের পাছে অমর্য্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় পথিক তত দূর করিলেন না; তথাপি তিনি কবাটে যে দারুণ করপ্রহার করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা অধিক ক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনই মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্ত্তে মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথা যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। মন্দিরমধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে, দেবই বা কি মূর্ত্তি, প্রবেষ্টা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবা পুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেবমূর্ত্তিকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকারমধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দিরমধ্যে কে আছ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না; কিন্তু অলঙ্কারঝঙ্কার-শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বৃষ্টিধারা ও ঝটিকার প্রবেশ রোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন, এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্ত্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ কর; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে, যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুত-হস্তে অসিচর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।"

"আপনি কে?" বামাস্বরে মন্দিরমধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল। শুনিয়া সবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, "স্বরে বুঝিতেছি, এ প্রশ্ন কোন সুন্দরী করিলেন। আমার পরিচয়ে আপনার কি হইবে?"

মন্দিরমধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমরা বড় ভীত হইয়াছি।"

যুবক তখন কহিলেন, "আমি যেই হই, আমাদিগের আত্মপরিচয় আপনারা দিবার রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে অবলাজাতির কোন প্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।"

রমণী উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমার সাহস হইল, এত ক্ষণ আমরা ভয়ে মৃতপ্রায় ছিলাম। এখনও আমার সহচরী অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা রহিয়াছেন। আমরা সায়াহ্নকালে এই শৈলেশ্বর শিবপূজার জন্য আসিয়াছিলাম। পরে ঝড় আসিলে, আমাদিগের বাহক দাস দাসীগণ আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না।"

যুবক কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব।" রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

অর্দ্ধরাত্রে ঝটিকা বৃষ্টি নিবারণ হইলে, যুবক কহিলেন, "আপনারা এইখানে কিছু কাল কোনরূপে সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাই।"

এই কথা শুনিয়া যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, "মহাশয়, গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। এই মন্দিরের রক্ষক এক জন ভৃত্য অতি নিকটেই বসতি করে; জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে, মন্দিরের বাহির হইতে তাহার কুটীর দেখিতে পাইবেন। সে ব্যক্তি একাকী প্রান্তরমধ্যে বাস করিয়া থাকে, এজন্য সে গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী রাখে।"

যুবক এই কথানুসারে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেবালয়-রক্ষকের গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহদ্বারে গমন করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। মন্দিররক্ষক ভয়প্রযুক্ত দ্বারোদ্ঘাটন না করিয়া, প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিল। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে পথিকের কোন দস্যুলক্ষণ দৃষ্ট হইল না; বিশেষতঃ তৎস্বীকৃত অর্থের লোভ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। সাত পাঁচ ভাবিয়া মন্দিররক্ষক দ্বার খুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।

পান্থ প্রদীপ আনিয়া দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে দুই জন মাত্র কামিনী। যিনি নবীনা, তিনি দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন। পরন্তু তাঁহার অনাবৃত প্রকোষ্ঠে হীরকমণ্ডিত চূড় এবং বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদ, তদুপরি রত্নাভরণপারিপাট্য দেখিয়া পান্থ নিঃসন্দেহ জানিতে পারিলেন যে, এই নবীনা হীনবংশসম্ভূতা নহে। দ্বিতীয় রমণীর পরিচ্ছদের অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘতায় পথিক বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন; অথচ সচরাচর দাসীর অপেক্ষা সম্পন্না। বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ বোধ হইল। সহজেই যুবা পুরুষের উপলব্ধি হইল যে, বয়োজ্যেষ্ঠারই সহিত তাঁহার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি সবিস্ময়ে ইহাও পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, তদুভয় মধ্যে কাহারও পরিচ্ছদ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নহে, উভয়েই পশ্চিমদেশীয়, অর্থাৎ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের বেশধারিণী। যুবক মন্দিরাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিয়া রমণীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মি-সমূহ প্রপতিত হইলে, রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে; শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে, অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌষ্ঠবের কারণ হইত। কিন্তু যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রীসম্পাদক হইয়াছে। প্রাবৃটসম্ভূত নবদূর্ব্বাদলতুল্য, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি;

বসন্তপ্রসূত নবপত্রাবলীতুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুত জাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল, কটিদেশে কটিবন্ধে কোষসম্বদ্ধ অসি, দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্শা ছিল ; মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি এক খণ্ড হীরক ; কর্ণে মুক্তাসহিত কুণ্ডল ; কণ্ঠে রত্নহার।

পরস্পর সন্দর্শনে উভয় পক্ষেই পরস্পরের পরিচয় জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কেহই প্রথমে পরিচয় জিজ্ঞাসার অভদ্রতা স্বীকার করিতে সহসা ইচ্ছুক হইলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলাপ

প্রথমে যুবক নিজ কৌতূহলপরবশতা প্রকাশ করিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অনুভবে বুঝিতেছি, আপনারা ভাগ্যবানের পুরস্ত্রী, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হইতেছে ; কিন্তু আমার পরিচয় দেওয়ার পক্ষে যে প্রতিবন্ধক, আপনাদের সে প্রতিবন্ধক না থাকিতে পারে, এজন্য জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি।"

জ্যেষ্ঠা কহিলেন, "স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি ? যাহারা কুলোপাধি ধারণ করিতে পারে না, তাহারা কি বলিয়া পরিচয় দিবে ? গোপনে বাস করা যাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহারা কি বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে ? যে দিন বিধাতা স্ত্রীলোককে স্বামীর নাম মুখে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই দিন আত্মপরিচয়ের পথও বন্ধ করিয়াছেন।"

যুবক এ কথায় উত্তর করিলেন না। তাঁহার মন অন্য দিকে ছিল। নবীনা রমণী ক্রমে ক্রমে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া সহচরীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে অনিমেষচক্ষুতে যুবকের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। কথোপকথন মধ্যে অকস্মাৎ পথিকেরও সেই দিকে দৃষ্টিপাত হইল ; আর দৃষ্টি ফিরিল না ; তাঁহার বোধ হইল, যেন তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি আর কখন দেখিতে পাইবেন না। যুবতীর চক্ষুর্দ্বয়ের সহিত পথিকের চক্ষু সংমিলিত হইল। যুবতী অমনি লোচনযুগল বিনত করিলেন। সহচরী বাক্যের উত্তর না পাইয়া পথিকের মুখপানে চাহিলেন। কোন্ দিকে তাঁহার দৃষ্টি, তাহাও নিরীক্ষণ করিলেন, এবং সমভিব্যাহারিণী যে যুবক প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিতেছিলেন, তাহা জানিতে পারিয়া, নবীনার কানে কানে কহিলেন, "কি লো! শিবসাক্ষাৎ স্বয়ম্বরা হবি না কি ?"

নবীনা, সহচরীকে অঙ্গুলিনিপীড়িত করিয়া তদ্রূপ মৃদুস্বরে কহিল, "তুমি নিপাত যাও।" চতুরা সহচারিণী এই দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, যে লক্ষণ দেখিতেছি, পাছে এই অপরিচিত যুবা পুরুষের তেজঃপুঞ্জ কান্তি দেখিয়া আমার হস্তসমর্পিতা এই

বালিকা মন্মথশরজালে বিদ্ধ হয়; তবে আর কিছু হউক না হউক, ইহার মনের সুখ চিরকালের জন্য নষ্ট হইবে, অতএব সে পথ এখনই রুদ্ধ করা আবশ্যক। কিরূপেই বা এ অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়? যদি ইঙ্গিতে বা ছলনাক্রমে যুবককে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে পারি, তবে তাহা কর্ত্তব্য বটে, এই ভাবিয়া নারী-স্বভাবসিদ্ধ চতুরতার সহিত কহিলেন, "মহাশয়! স্ত্রীলোকের সুনাম এমনই অপদার্থ বস্তু যে, বাতাসের ভর সহে না। আজিকার এ প্রবল ঝড়ে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর, অতএব এক্ষণে ঝড় থামিয়াছে, দেখি যদি আমরা পদব্রজে বাটী গমন করিতে পারি।"

যুবা পুরুষ উত্তর করিলেন, "যদি একান্ত এ নিশীথে আপনারা পদব্রজে যাইবেন, তবে আমি আপনাদিগকে রাখিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, আমি এত ক্ষণ নিজস্থানে যাত্রা করিতাম, কিন্তু আপনার সখীর সদৃশ রূপসীকে বিনা রক্ষকে রাখিয়া যাইব না বলিয়াই এখন এ স্থানে আছি।"

কামিনী উত্তর করিল, "আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে পাছে আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করেন, এজন্যই সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিতেছি না। মহাশয়! স্ত্রীলোকের মন্দ কপালের কথা আপনার সাক্ষাতে আর কি বলিব। আমরা সহজে অবিশ্বাসিনী; আপনি আমাদিগকে রাখিয়া আসিলে আমাদিগের সৌভাগ্য, কিন্তু যখন আমার প্রভু—এই কন্যার পিতা—ইহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি এ রাত্রে কাহার সঙ্গে আসিয়াছ, তখন ইনি কি উত্তর করিবেন?"

যুবক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এই উত্তর করিবেন যে, আমি মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে আসিয়াছি।"

যদি তন্মুহূর্ত্তে মন্দিরমধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও মন্দিরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা অধিকতর চমকিত হইয়া উঠিতেন না। উভয়েই অমনি গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কনিষ্ঠা শিবলিঙ্গের পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। বাগ্‌বিদগ্ধা বয়োধিকা গলদেশে অঞ্চল দিয়া দণ্ডবৎ হইলেন; অঞ্জলিবদ্ধকরে কহিলেন, "যুবরাজ! না জানিয়া সহস্র অপরাধ করিয়াছি, অবোধ স্ত্রীলোকদিগকে নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।"

যুবরাজ হাসিয়া কহিলেন, "এ সকল গুরুতর অপরাধের ক্ষমা নাই। তবে ক্ষমা করি, যদি পরিচয় দাও, পরিচয় না দিলে অবশ্য সমুচিত দণ্ড দিব।"

নরম কথায় রসিকার সকল সময়েই সাহস হয়; রমণী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কি দণ্ড, আজ্ঞা হউক, স্বীকৃত আছি।"

জগৎসিংহও হাসিয়া কহিলেন, "সঙ্গে গিয়া তোমাদের বাটী রাখিয়া আসিব।"

সহচরী দেখিলেন, বিষম সঙ্কট। কোন বিশেষ কারণে তিনি নবীনার পরিচয় দিল্লীশ্বরের সেনাপতির নিকট দিতে সম্মতা ছিলেন না ; তিনি যে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবেন, ইহাতে আরও ক্ষতি, সে ত পরিচয়ের অধিক ; অতএব সহচরী অধোবদনে রহিলেন।

এমন সময়ে মন্দিরের অনতিদূরে বহুতর অশ্বের পদধ্বনি হইল ; রাজপুত্র অতি ব্যস্ত হইয়া মন্দিরের বাহিরে যাইয়া দেখিলেন যে, প্রায় শত অশ্বারোহী সৈন্য যাইতেছে। তাহাদিগের পরিচ্ছদ দৃষ্টিমাত্র জানিতে পারিলেন যে, তাহারা তাঁহারই রাজপুত সেনা। ইতিপূর্ব্বে যুবরাজ যুদ্ধসম্বন্ধীয় কার্য্যসম্পাদনে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাইয়া, ত্বরিত এক শত অশ্বারোহী সেনা লইয়া পিতৃসমক্ষে যাইতেছিলেন। অপরাহ্ণে সমভিব্যাহারিগণের অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন ; পশ্চাৎ তাহারা এক পথে, তিনি অন্য পথে যাওয়াতে, তিনি একাকী প্রান্তরমধ্যে ঝটিকা বৃষ্টিতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলেন, এবং সেনাগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে কি না, জানিবার জন্য কহিলেন, "দিল্লীশ্বরের জয় হউক।" এই কথা কহিবামাত্র এক জন অশ্বারোহী তাঁহার নিকট আসিল। যুবরাজ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "ধরমসিংহ, আমি ঝড় বৃষ্টির কারণে এখানে অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

ধরমসিংহ নতভাবে প্রণাম করিয়া কহিল, "আমরা যুবরাজের বহু অনুসন্ধান করিয়া এখানে আসিয়াছি, অশ্বকে এই বটবৃক্ষের নিকটে পাইয়া আনিয়াছি।"

জগৎসিংহ বলিলেন, "অশ্ব লইয়া তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আর দুই জনকে নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে শিবিকা ও তদুপযুক্ত বাহক আনিতে পাঠাও, অবশিষ্ট সেনাগণকে অগ্রসর হইতে বল।"

ধরমসিংহ এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় প্রশ্ন অনাবশ্যক জানিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া সৈন্যদিগকে যুবরাজের অভিপ্রায় জানাইল। সৈন্যমধ্যে কেহ কেহ শিবিকার বার্ত্তা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অপরকে কহিল, "আজ যে বড় নূতন পদ্ধতি।" কেহ বা উত্তর করিল, "না হবে কেন? মহারাজ রাজপুতপতির শত শত মহিষী।"

এদিকে যুবরাজের অনুপস্থিতিকালে অবসর পাইয়া অবগুণ্ঠন মোচনপূর্ব্বক সুন্দরী সহচরীকে কহিল, "বিমল, রাজপুত্রকে পরিচয় দিতে তুমি অসম্মত কেন?"

বিমলা কহিল, "সে কথার উত্তর আমি তোমার পিতার কাছে দিব ; এক্ষণে আবার এ কিসের গোলযোগ শুনিতে পাই?"

নবীনা কহিল, "বোধ করি, রাজপুত্রের কোন সৈন্যাদি তাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়া থাকিবে; যেখানে স্বয়ং যুবরাজ রহিয়াছেন, সেখানে চিন্তা কর কেন?"

যে অশ্বারোহিগণ শিবিকা বাহকাদির অন্বেষণে গমন করিয়াছিল, তাহারা প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, যে বাহক ও রক্ষিবর্গ স্ত্রীদিগকে রাখিয়া বৃষ্টির সময় গ্রামমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল। দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া জগৎসিংহ মন্দিরমধ্যে পুনঃপ্রবেশপূর্ব্বক পরিচারিকাকে কহিলেন, "কয়েক জন অস্ত্রধারী ব্যক্তির সহিত বাহকগণ শিবিকা লইয়া আসিতেছে, উহারা তোমাদিগের লোক কি না, বাহিরে আসিয়া দেখ।" বিমলা মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, তাহারা তাহাদিগের রক্ষিগণ বটে।

রাজকুমার কহিলেন, "তবে আমি আর এখানে দাঁড়াইব না; আমার সহিত ইহাদিগের সাক্ষাতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব আমি চলিলাম। শৈলেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা নির্ব্বিঘ্নে বাটী উপনীত হও; তোমাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা সপ্তাহমধ্যে প্রকাশ করিও না; বিস্মৃত হইও না, বরং স্মরণার্থ এই সামান্য বস্তু নিকটে রাখ। আর আমি তোমার প্রভুকন্যার যে পরিচয় পাইলাম না, এই কথাই আমার হৃদয়ে স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ রহিল।" এই বলিয়া উষ্ণীষ হইতে মুক্তাহার লইয়া বিমলার মস্তকে স্থাপন করিলেন। বিমলা মহার্ঘ রত্নহার কেশপাশে ধরিয়া রাজকুমারকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া কহিল, "যুবরাজ, আমি যে পরিচয় দিলাম না, ইহাতে আমাকে অপরাধিনী ভাবিবেন না, ইহার অবশ্য উপযুক্ত কারণ আছে। যদি আপনি এ বিষয়ে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন, তবে অদ্য হইতে পক্ষান্তরে আপনার সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, বলিয়া দিন।"

জগৎসিংহ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "অদ্য হইতে পক্ষান্তরে রাত্রিকালে এই মন্দিরমধ্যেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এই স্থলে দেখা না পাও—সাক্ষাৎ হইল না।"

"দেবতা আপনাকে রক্ষা করুন" বলিয়া বিমলা পুনর্ব্বার প্রণতা হইল। রাজকুমার পুনর্ব্বার অনিবার্য্য তৃষ্ণাকাতর লোচনে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, লম্ফ দিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোগল পাঠান

নিশীথকালে জগৎসিংহ শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে যাত্রা করিলেন। আপাততঃ তাঁহার অনুগমনে অথবা মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী মনোমোহিনীর সংবাদকথনে পাঠক মহাশয়দিগের

কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না। জগৎসিংহ রাজপুত, কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তরমধ্যে একাকী গমন করিতেছিলেন, তৎপরিচয় উপলক্ষে এই সময়ের বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজকীয় ঘটনা কতক কতক সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। অতএব এই পরিচ্ছেদ ইতিবৃত্তসম্পর্কীয়। পাঠকবর্গ একান্ত অধীর হইলে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের পরামর্শ এই যে, অধৈর্য্য ভাল নহে।

প্রথমে বঙ্গদেশে বখ্‌তিয়ার খিলিজি মহম্মদীয় জয়ধ্বজা সংস্থাপিত করিলে পর, মুসলমানেরা অবাধে কয়েক শতাব্দী তদ্রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ৯৭২ হেঃ অব্দে সুবিখ্যাত সুলতান বাবর, রণক্ষেত্রে দিল্লীর বাদশাহ ইব্রাহিম লদীকে পরাভূত করিয়া, তৎসিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু তৎকালেই বঙ্গদেশ তৈমুরলঙ্গবংশীয়দিগের দণ্ডাধীন হয় নাই।

যত দিন না মোগল সম্রাট্‌দিগের কুলতিলক আক্‌বরের অভ্যুদয় হয়, তত দিন এ দেশে স্বাধীন পাঠান রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কুক্ষণে নির্ব্বোধ দাউদ খাঁ সুপ্ত সিংহের অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করিলেন; আত্মকর্ম্মফলে আক্‌বরের সেনাপতি মনাইম্‌ খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। দাউদ ৯৮২ হেঃ অব্দে সগণে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন; বঙ্গরাজ্য মোগল ভূপালের কর-কবলিত হইল। পাঠানেরা উৎকলে সংস্থাপিত হইলে, তথা হইতে তাহাদিগের উচ্ছেদ করা মোগলদিগের কষ্টসাধ্য হইল। ৯৮৬ অব্দে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি খাঁ জাঁহা খাঁ পাঠানদিগকে দ্বিতীয় বার পরাজিত করিয়া উৎকল দেশ নিজ প্রভুর দণ্ডাধীন করিলেন। ইহার পর আর এক দারুণ উপদ্রপ উপস্থিত হইয়াছিল। আক্‌বর শাহ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের রাজকর আদায়ের যে নূতন প্রণালী সংস্থাপিত হইল, তাহাতে জায়গীরদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের গুরুতর অসন্তুষ্টি জন্মিল। তাঁহারা নিজ নিজ পূর্ব্বাধিপত্য রক্ষার্থ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। অতি দুর্দ্দম্য রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে, সময় পাইয়া উড়িষ্যার পাঠানেরা পুনর্ব্বার মস্তক উন্নত করিল ও কতলু খাঁ নামক এক পাঠানকে আধিপত্যে বরণ করিয়া পুনরপি উড়িষ্যা স্বকরগ্রস্ত করিল। মেদিনীপুরও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল।

কর্ম্মঠ রাজপ্রতিনিধি খাঁ আজিম, তৎপরে শাহবাজ খাঁ, কেহই শত্রুবিজিত দেশ পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এই আয়াসসাধ্য কার্য্যোদ্ধার জন্য এক জন হিন্দু যোদ্ধা প্রেরিত হইলেন।

মহামতি আক্‌বর তাঁহার পূর্ব্বগামী সম্রাট্‌দিগের হইতে সর্ব্বাংশে বিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, এতদ্দেশীয় রাজকার্য্য সম্পাদনে এতদ্দেশীয় লোকই বিশেষ পটু—বিদেশীয়েরা তাদৃশ নহে; আর যুদ্ধে বা রাজ্যশাসনে রাজপুতগণ

দক্ষাগ্রগণ্য। অতএব তিনি সর্ব্বদা এতদ্দেশীয়, বিশেষতঃ রাজপুতগণকে গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

আখ্যায়িকাবর্ণিত কালে যে সকল রাজপুত উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে মানসিংহ এক জন প্রধান। তিনি স্বয়ং আক্‌বরের পুত্র সেলিমের শ্যালক। আজিম খাঁ ও শাহবাজ খাঁ উৎকলজয়ে অক্ষম হইলে, আক্‌বর এই মহাত্মাকে বঙ্গ ও বেহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন।

৯৯৬ সালে মানসিংহ পাটনা নগরীতে উপনীত হইয়া প্রথমে অপরাপর উপদ্রবের শান্তি করিলেন। পরবৎসরে উৎকলবিজিগীষু হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। মানসিংহ প্রথমে পাটনায় উপস্থিত হইলে পর, নিজে তন্নগরীতে অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় করিয়া বঙ্গপ্রদেশ শাসন জন্য সৈদ খাঁকে নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। সৈদ খাঁ এই ভার প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানী তণ্ডা নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে রণাশায় যাত্রা করিয়া মানসিংহ প্রতিনিধিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সৈদ খাঁকে লিখিলেন যে, তিনি বর্দ্ধমানে তাঁহার সহিত সসৈন্য মিলিত হইতে চাহেন।

বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া রাজা দেখিলেন যে, সৈদ খাঁ আসেন নাই, কেবলমাত্র দূত দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব সম্ভাবনা; এমন কি, তাঁহার সৈন্যসজ্জা করিয়া যাইতে বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে; অতএব রাজা মানসিংহ আপাততঃ বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত শিবির সংস্থাপন করিয়া থাকিলে তিনি বর্ষাপ্রভাতে সেনা সমভিব্যাহারে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। রাজা মানসিংহ অগত্যা তৎপরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া দারুকেশ্বরতীরে শিবির সংস্থাপিত করিলেন। তথায় সৈদ খাঁর প্রতীক্ষায় রহিলেন।

তথায় অবস্থিতিকালে লোকমুখে রাজা সংবাদ পাইলেন যে, কতলু খাঁ তাঁহার আলস্য দেখিয়া সাহসিক হইয়াছে; সেই সাহসে মান্দারণের অনতিদূর মধ্যে সসৈন্য আসিয়া দেশ লুঠ করিতেছে। রাজা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, শত্রুবল কোথায়, কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছে, কি করিতেছে, এই সকল সংবাদ নিশ্চয় জানিবার জন্য তাঁহার এক জন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। মানসিংহের সহিত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র জগৎসিংহ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। জগৎসিংহ এই দুঃসাহসিক কার্য্যের ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া, রাজা তাঁহাকেই শতেক অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে শত্রু-শিবিরোদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। রাজকুমার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া অচিরাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যৎকালে কার্য্য সমাধা করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন প্রান্তরমধ্যে পাঠক মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নবীন সেনাপতি

শৈলেশ্বর-মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া জগৎসিংহ পিতৃশিবিরে উপস্থিত হইলে পর, মহারাজ মানসিংহ পুত্রপ্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র পাঠান সেনা ধরপুর গ্রামের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া নিকটস্থ গ্রামসকল লুঠ করিতেছে, এবং স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ বা অধিকার করিয়া তদাশ্রয়ে এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে আছে। মানসিংহ দেখিলেন যে, পাঠানদিগের দুর্বৃত্তির আশু দমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু এ কার্য্য অতি দুঃসাধ্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ জন্য সমভিব্যাহারী সেনাপতিগণকে একত্র করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন এবং কহিলেন, "দিনে দিনে গ্রাম গ্রাম, পরগণা পরগণা দিল্লীশ্বরের হস্তস্খলিত হইতেছে, এক্ষণে পাঠানদিগকে শাসিত না করিলেই নয়, কিন্তু কি প্রকারেই বা তাহাদিগের শাসন হয়? তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় বলবান্; তাহাতে আবার দুর্গশ্রেণীর আশ্রয়ে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে; যুদ্ধে পরাজিত করিলেও তাহাদিগকে বিনষ্ট বা স্থানচ্যুত করিতে পারিব না; সহজেই দুর্গমধ্যে নিরাপদ্ হইতে পারিবে। কিন্তু সকলে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি রণে আমাদিগকে বিজিত হইতে হয়, তবে শত্রুর অধিকারমধ্যে নিরাশ্রয়ে একেবারে বিনষ্ট হইতে হইবে। এরূপ অন্যায় সাহসে ভর করিয়া দিল্লীশ্বরের এত অধিক সেনানাশের সম্ভাবনা জন্মান, এবং উড়িষ্যাজয়ের আশা একেবারে লোপ করা, আমার বিবেচনায় অনুচিত হইতেছে; সৈদ খাঁর প্রতীক্ষা করাই উচিত হইতেছে; অথচ বৈরিশাসনের আশু কোন উপায় করাও আবশ্যক হইতেছে। তোমরা কি পরামর্শ দাও?"

বৃদ্ধ সেনাপতিগণ সকলে একমত হইয়া এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, আপাততঃ সৈদ খাঁর প্রতীক্ষায় থাকাই কর্ত্তব্য। রাজা মানসিংহ কহিলেন, "আমি অভিপ্রায় করিতেছি যে, সমুদায় সৈন্যনাশের সম্ভাবনা না রাখিয়া কেবল অল্পসংখ্যক সেনা কোন দক্ষ সেনাপতির সহিত শত্রুসমক্ষে প্রেরণ করি।"

এক জন প্রাচীন মোগল সৈনিক কহিলেন, "মহারাজ! যথা তাবৎ সেনা পাঠাইতেও আশঙ্কা, তথা অল্পসংখ্যক সেনার দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধন হইবে?"

মানসিংহ কহিলেন, "অল্প সেনা সম্মুখ রণে অগ্রসর হইতে পাঠাইতে চাহিতেছি না। ক্ষুদ্র বল অস্পষ্ট থাকিয়া গ্রামপীড়নাসক্ত পাঠানদিগের সামান্য দলসকল কতক দমনে রাখিতে পারিবে।"

তখন মোগল কহিল, "মহারাজ! নিশ্চিত কালগ্রাসে কোন্ সেনাপতি যাইবে?"

মানসিংহ ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "কি! এত রাজপুত ও মোগল মধ্যে মৃত্যুকে ভয় করে না, এমন কি কেহই নাই?"

এই কথা শ্রুতিমাত্র পাঁচ সাত জন মোগল ও রাজপুত গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহারাজ! দাসেরা যাইতে প্রস্তুত আছে।" জগৎসিংহও তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ; সকলের পশ্চাতে থাকিয়া কহিলেন, "অনুমতি হইলে এ দাসও দিল্লীশ্বরের কার্য্যসাধনে যত্ন করে।"

রাজা মানসিংহ সস্মিতবদনে কহিলেন, "না হবে কেন? আজ জানিলাম যে, মোগল রাজপুত নাম লোপের বিলম্ব আছে। তোমরা সকলেই এ দুষ্কর কার্য্যে প্রস্তুত, এখন কাহাকে রাখিয়া কাহাকে পাঠাই?"

এক জন পারিষদ সহাস্যে কহিল, "মহারাজ! অনেকে যে এ কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন, সে ভালই হইয়াছে। এই উপলক্ষে সেনাব্যয়ের অল্পতা করিতে পারিবেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সেনা লইয়া যাইতে স্বীকৃত হয়েন, তাঁহাকেই রাজকার্য্য সাধনের ভার দিউন।"

রাজা কহিলেন, "এ উত্তম পরামর্শ।" পরে প্রথম উদ্যমকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কত সংখ্যক সেনা লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর?" সেনাপতি কহিলেন, "পঞ্চদশ সহস্র পদাতিবলে রাজকার্য্য উদ্ধার করিব।"

রাজা কহিলেন, "এ শিবির হইতে পঞ্চদশ সহস্র ভগ্ন করিলে অধিক থাকে না। কোন্ বীর দশ সহস্র লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিতে চাহে?"

সেনাপতিগণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরিশেষে রাজার প্রিয়পাত্র যশোবন্ত সিংহ নামক রাজপুত যোদ্ধা রাজাদেশ পালন করিতে অনুমতি প্রার্থিত হইলেন। রাজা হৃষ্টচিত্তে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কুমার জগৎসিংহ তাঁহার দৃষ্টির অভিলাষী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তৎপ্রতি রাজার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! রাজপ্রসাদ হইলে এ দাস পঞ্চ সহস্র সহায়ে কতলু খাঁকে সুবর্ণরেখাপারে রাখিয়া আইসে।"

রাজা মানসিংহ অবাক্ হইলেন। সেনাপতিগণ কানাকানি করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা কহিলেন, "পুত্র! আমি জানি যে, তুমি রাজপুতকুলের গরিমা; কিন্তু তুমি অন্যায় সাহস করিতেছ।"

জগৎসিংহ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "যদি প্রতিজ্ঞাপালন না করিয়া বাদশাহের সেনাবল অপচয় করি, তবে রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হইব।"

রাজা মানসিংহ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, “আমি তোমার রাজপুতকুলধর্ম্ম প্রতিপালনের ব্যাঘাত করিব না ; তুমিই এ কার্য্যে যাত্রা কর।”

এই বলিয়া রাজকুমারকে বাষ্পাকুললোচনে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিলেন। সেনাপতিগণ স্ব স্ব শিবিরে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গড় মান্দারণ

যে পথে বিষ্ণুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ জাহানাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। যে রমণীদিগের সহিত জগৎসিংহের মন্দির-মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া এই গ্রামাভিমুখে গমন করেন।

গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত ; এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ এক খণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইয়াছিল ; তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড় ছিল ; এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূলশিরঃপর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত ; দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্য্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলঙ্ঘ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন ; দুর্গের নিম্নভাগ-মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে ; তদুপরি তিন্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।

বাঙ্গালার পাঠান সম্রাট্‌দিগের শিরোভূষণ হোসেন শাহার বিখ্যাত সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কালক্রমে জয়ধরসিংহ নামে এক জন হিন্দু সৈনিক ইহা জায়গীর পান। এক্ষণে বীরেন্দ্রসিংহনামা জয়ধরসিংহের এক জন উত্তরপুরুষ এখানে বসতি করিতেন।

যৌবনকালে বীরেন্দ্রসিংহের পিতার সহিত সম্প্রীতি ছিল না। বীরেন্দ্রসিংহ স্বভাবতঃ দাম্ভিক এবং অধীর ছিলেন, পিতার আদেশ কদাচিৎ প্রতিপালন করিতেন, এজন্য পিতা-পুত্রে সর্ব্বদা বিবাদ বচসা হইত। পুত্রের বিবাহার্থ বৃদ্ধ ভূস্বামী নিকটস্থ স্বজাতীয় অপর কোন ভূস্বামিকন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কন্যার পিতা পুত্রহীন, এজন্য এই বিবাহে বীরেন্দ্রের সম্পত্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা; কন্যাও সুন্দরী বটে, সুতরাং এমত সম্বন্ধ বৃদ্ধের বিবেচনায় অতি আদরণীয় বোধ হইল; তিনি বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্র সে সম্বন্ধে আদর না করিয়া নিজ পল্লীস্থ এক পতিপুত্রহীনা দরিদ্রা রমণীর দুহিতাকে গোপনে বিবাহ করিয়া আবার বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধ রোষপরবশ হইয়া পুত্রকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; যুবা পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যোদ্ধৃবৃত্তি অবলম্বন করণাশয়ে দিল্লী যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা, এজন্য তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি মাতৃকুটীরে রহিলেন।

এদিকে পুত্র দেশান্তর যাইলে পর বৃদ্ধ ভূস্বামীর অন্তঃকরণে পুত্র-বিচ্ছেদে মনঃপীড়ার সঞ্চার হইতে লাগিল; গতানুশোচনার পরবশ হইয়া পুত্রের সংবাদ আনয়নে যত্নবান্ হইলেন; কিন্তু যত্নে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পুত্রকে পুনরানয়ন করিতে না পারিয়া তৎপরিবর্ত্তে পুত্রবধূকে দরিদ্রার গৃহ হইতে সাদরে নিজালয়ে আনিলেন। উপযুক্ত কালে বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী এক কন্যা প্রসব করিলেন। কিছু দিন পরে কন্যার প্রসূতির পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

বীরেন্দ্র দিল্লীতে উপনীত হইয়া মোগল সম্রাটের আজ্ঞাকারী রাজপুতসেনামধ্যে যোদ্ধৃত্বে বৃত হইলেন; অল্পকালে নিজগুণে উচ্চপদস্থ হইতে পারিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ কয়েক বৎসরে ধন ও যশ সঞ্চয় করিয়া পিতার লোকান্তরসংবাদ পাইলেন। আর এক্ষণে বিদেশ পর্য্যটন বা পরাধীনবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বীরেন্দ্রের সহিত দিল্লী হইতে অনেকানেক সহচর আসিয়াছিল। তন্মধ্যে জনৈক পরিচারিকা আর এক পরমহংস ছিলেন। এই আখ্যায়িকায় এই দুই জনের পরিচয় আবশ্যক হইবেক। পরিচারিকার নাম বিমলা, পরমহংসের নাম অভিরাম স্বামী।

বিমলা গৃহমধ্যে গৃহকর্ম্মে, বিশেষতঃ বীরেন্দ্রের কন্যার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন, তদ্ব্যতীত দুর্গমধ্যে বিমলার অবস্থিতি করার অন্য কারণ লক্ষিত হইত না, সুতরাং তাঁহাকে দাসী বলিতে বাধ্য হইয়াছি; কিন্তু বিমলাতে দাসীর লক্ষণ কিছুই ছিল না। গৃহিণী যাদৃশী মান্যা, বিমলা পৌরগণের নিকটে প্রায় তাদৃশী মান্যা ছিলেন; পৌর-জন সকলেই তাঁহার বাধ্য ছিল। মুখশ্রী দেখিলে বোধ হইত যে, বিমলা

যৌবনে পরমা সুন্দরী ছিলেন। প্রভাতে চন্দ্রাস্তের ন্যায় সে রূপের প্রতিভা এ বয়সেও ছিল। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ নামে অভিরাম স্বামীর এক জন শিষ্য ছিলেন, তাঁহার অলঙ্কারশাস্ত্রে যত ব্যুৎপত্তি থাকুক বা না থাকুক, রসিকতা প্রকাশ করার তৃষ্ণাটা বড় প্রবল ছিল। তিনি বিমলাকে দেখিয়া বলিতেন, "দাই যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত ; মদন-আগুন যত শীতল হইতেছে, দেহখানি ততই জমাট বাঁধিতেছে।" এইখানে বলা উচিত, যে দিন গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ এইরূপ রসিকতা করিয়া ফেলিলেন, সেই দিন অবধি বিমলা তাঁহার নাম রাখিলেন—"রসিকরাজ রসোপাধ্যায়।"

আকারেঙ্গিত ব্যতীত বিমলার সভ্যতা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এমন প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহা সামান্যা পরিচারিকার সম্ভবে না। অনেকে এরূপ বলিতেন যে, বিমলা বহুকাল মোগল সম্রাটের পুরবাসিনী ছিলেন। এ কথা সত্য, কি মিথ্যা, তাহা বিমলাই জানিতেন, কিন্তু কখন সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ করিতেন না।

বিমলা বিধবা, কি সধবা? কে জানে? তিনি অলঙ্কার পরিতেন, একাদশী করিতেন না। সধবার ন্যায় সকল আচরণ করিতেন।

দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমাকে বিমলা যে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, তাহার পরিচয় মন্দিরমধ্যে দেওয়া গিয়াছে। তিলোত্তমাও বিমলার তদ্রূপ অনুরাগিণী ছিলেন। বীরেন্দ্রসিংহের অপর সমভিব্যাহারী অভিরাম স্বামী সর্ব্বদা দুর্গমধ্যে থাকিতেন না। মধ্যে মধ্যে দেশপর্য্যটনে গমন করিতেন। দুই এক মাস গড় মান্দারণে, দুই এক মাস বিদেশ পরিভ্রমণে যাপন করিতেন। পুরবাসী ও অপরাপর লোকের এইরূপ প্রতীতি ছিল যে, অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহের দীক্ষাগুরু ; বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে যেরূপ সম্মান এবং আদর করিতেন, তাহাতে সেইরূপই সম্ভাবনা। এমন কি, সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য অভিরাম স্বামীর পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না ও গুরুদত্ত পরামর্শও প্রায় সতত সফল হইত। বস্তুতঃ অভিরাম স্বামী বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ; আরও নিজ ব্রতধর্ম্মে, সাংসারিক অধিকাংশ বিষয়ে রিপু সংযত করা অভ্যাস করিয়াছিলেন ; প্রয়োজন মতে রাগক্ষোভাদি দমন করিয়া স্থিরচিত্তে বিষয়ালোচনা করিতে পারিতেন। সে স্থলে যে অধীর দাম্ভিক বীরেন্দ্রসিংহের অভিসন্ধি অপেক্ষা তাঁহার পরামর্শ ফলপ্রদ হইবে আশ্চর্য্য কি?

বিমলা ও অভিরাম স্বামী ভিন্ন আশ্‌মানি নাম্নী এক জন দাসী বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে আসিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অভিরাম স্বামীর মন্ত্রণা

তিলোত্তমা ও বিমলা শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমনের তিন চারি দিবস পরে বীরেন্দ্রসিংহ নিজ দেওয়ানখানায় মছনদে বসিয়া আছেন, এমন সময় অভিরাম স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক দণ্ডবৎ হইলেন ; অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রের হস্তদত্ত কুশাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন, অনুমতিক্রমে বীরেন্দ্র পুনরুপবেশন করিলেন। অভিরাম স্বামী কহিলেন, "বীরেন্দ্র! অদ্য তোমার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে।"

বীরেন্দ্রসিংহ কহিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "এক্ষণে মোগল পাঠানের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত।"

বী। হাঁ ; কোন বিশেষ গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হওয়াই সম্ভব।

অ। সম্ভব—এক্ষণে কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ ?

বীরেন্দ্র সদর্পে উত্তর করিলেন, "শত্রু উপস্থিত হইলে বাহুবলে পরাঙ্মুখ করিব।"

পরমহংস অধিকতর মৃদুভাবে কহিলেন, "বীরেন্দ্র! এ তোমার তুল্য বীরের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর ; কিন্তু কথা এই যে, কেবল বীরত্বে জয়লাভ নাই ; যথানীতি সন্ধিবিগ্রহ করিলেই জয়লাভ। তুমি নিজে বীরাগ্রগণ্য ; কিন্তু তোমার সেনা সহস্রাধিক নহে ; কোন্ যোদ্ধা সহস্রেক সেনা লইয়া শতগুণ সেনা বিমুখ করিতে পারে ? মোগল পাঠান উভয় পক্ষই সেনা-বলে তোমার অপেক্ষা শতগুণে বলবান্ ; এক পক্ষের সাহায্য ব্যতীত অপর পক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে না। এ কথায় রুষ্ট হইও না, স্থিরচিত্তে বিবেচনা কর। আরও কথা এই যে, দুই পক্ষেরই সহিত শত্রুভাবে প্রয়োজন কি ? শত্রু ত মন্দ ; দুই শত্রুর অপেক্ষা এক শত্রু ভাল না ? অতএব আমার বিবেচনায় পক্ষাবলম্বন করাই উচিত।"

বীরেন্দ্র বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুমতি করেন ?"

অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ,—যে পক্ষ অবলম্বন করিলে অধর্ম্ম নাই, সেই পক্ষে যাও, রাজবিদ্রোহিতা মহাপাপ, রাজপক্ষ অবলম্বন কর।"

বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "রাজা কে ? মোগল পাঠান উভয়েই রাজত্ব লইয়া বিবাদ।"

অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, "যিনি করগ্রাহী, তিনিই রাজা।"

বী। আক্‌বর শাহা ?

অ। অবশ্য।

এই কথায় বীরেন্দ্রসিংহ অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিলেন; ক্রমে চক্ষু আরক্তবর্ণ হইল; অভিরাম স্বামী আকারেঙ্গিত দেখিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্র! ক্রোধ সংবরণ কর, আমি তোমাকে দিল্লীশ্বরের অনুগত হইতে বলিয়াছি; মানসিংহের আনুগত্য করিতে বলি নাই।"

বীরেন্দ্রসিংহ দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া পরমহংসকে দেখাইলেন; দক্ষিণ হস্তের উপর বাম হস্তের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ও পাদপদ্মের আশীর্ব্বাদে এই হস্ত মানসিংহের রক্তে প্লাবিত করিব।"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "স্থির হও; রাগান্ধ হইয়া আত্মকার্য্য নষ্ট করিও না; মানসিংহের পূর্ব্বকৃত অপরাধের অবশ্য দণ্ড করিও, কিন্তু আক্‌বর শাহের সহিত যুদ্ধে কার্য্য কি ?"

বীরেন্দ্র সক্রোধে কহিতে লাগিলেন, "আক্‌বর শাহের পক্ষ হইলে কোন্ সেনাপতির অধীন হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে ? কোন্ যোদ্ধার সাহায্য করিতে হইবে ? কাহার আনুগত্য করিতে হইবে ? মানসিংহের। গুরুদেব! এ দেহ বর্ত্তমানে এ কার্য্য বীরেন্দ্রসিংহ হইতে হইবে না।"

অভিরাম স্বামী বিষণ্ণ হইয়া নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি পাঠানের সহায়তা করা তোমার শ্রেয়ঃ হইল ?"

বীরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা কি শ্রেয়ঃ ?"

অ। হাঁ, পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা শ্রেয়ঃ।

বী। তবে আমার পাঠান-সহকারী হওয়া শ্রেয়ঃ।

অভিরাম স্বামী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় নীরব হইলেন; চক্ষে তাঁহার বারিবিন্দু উপস্থিত হইল। দেখিয়া বীরেন্দ্রসিংহ যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "গুরো! ক্ষমা করুন; আমি না জানিয়া কি অপরাধ করিলাম আজ্ঞা করুন।"

অভিরাম স্বামী উত্তরীয় বস্ত্রে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, "শ্রবণ কর, আমি কয়েক দিবস পর্য্যন্ত জ্যোতিষী গণনায় নিযুক্ত আছি, তোমা অপেক্ষা তোমার কন্যা আমার স্নেহের পাত্রী, ইহা তুমি অবগত আছ; স্বভাবতঃ তৎসম্বন্ধেই বহুবিধ গণনা করিলাম।" বীরেন্দ্রসিংহের মুখ বিশুষ্ক হইল; আগ্রহসহকারে পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গণনায় কি দেখিলেন ?" পরমহংস কহিলেন, "দেখিলাম যে, মোগল সেনাপতি হইতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল।" বীরেন্দ্রসিংহের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল। অভিরাম স্বামী কহিতে লাগিলেন, "মোগলেরা বিপক্ষ হইলেই তৎকর্ত্তৃক তিলোত্তমার অমঙ্গল সম্ভবে;

স্বপক্ষ হইলে সম্ভবে না, এজন্যই আমি তোমাকে মোগলপক্ষে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছিলাম। এই কথা ব্যক্ত করিয়া তোমাকে মনঃপীড়া দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; মনুষ্যযত্ন বিফল; বুঝি ললাটলিপি অবশ্য ঘটিবে, নহিলে তুমি এত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইবে কেন?"

বীরেন্দ্রসিংহ মৌন হইয়া থাকিলেন। অভিরাম স্বামী কহিলেন, "বীরেন্দ্র, দ্বারে কতলু খাঁর দূত দণ্ডায়মান; আমি তাহাকে দেখিয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি, আমার নিষেধক্রমেই দৌবারিকেরা এ পর্য্যন্ত তাহাকে তোমার সম্মুখে আসিতে দেয় নাই। এক্ষণে আমার বক্তব্য সমাপন হইয়াছে, দূতকে আহ্বান করিয়া উচিত প্রত্যুত্তর দাও।" বীরেন্দ্রসিংহ নিশ্বাসসহকারে মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব! যত দিন তিলোত্তমাকে না দেখিয়াছিলাম, তত দিন কন্যা বলিয়া তাহাকে স্মরণও করিতাম না; এক্ষণে তিলোত্তমা ব্যতীত আর আমার সংসারে কেহই নাই; আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম; অদ্যাবধি ভূতপূর্ব্ব বিসর্জ্জন দিলাম; মানসিংহের অনুগামী হইব; দৌবারিক দূতকে আনয়ন করুক।"

আজ্ঞামতে দৌবারিক দূতকে আনয়ন করিল। দূত কতলু খাঁর পত্র প্রদান করিল। পত্রের মর্ম্ম এই যে, বীরেন্দ্রসিংহ এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা আর পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠানশিবিরে প্রেরণ করুন, নচেৎ কতলু খাঁ বিংশতি সহস্র সেনা গড় মান্দারণে প্রেরণ করিবেন।

বীরেন্দ্রসিংহ পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, "দূত! তোমার প্রভুকে কহিও, তিনিই সেনা প্রেরণ করুন।" দূত নতশির হইয়া প্রস্থান করিল।

সকল কথা অন্তরালে থাকিয়া বিমলা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অসাবধানতা

দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূল বিধৌত করিয়া আমোদর নদী কলকল রবে প্রবহণ করে, সেই অংশে এক কক্ষবাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা নদীজলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত, পশ্চিমগগনে অস্তাচলগত দিনমণির ম্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চনকান্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বরপ্রতিবিম্ব স্রোতস্বতীজলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল; নদীপারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল; দুর্গমধ্যে ময়ূর সারসাদি কলনাদী পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল;

কোথাও রজনীর উদয়ে নীড়ান্বেষণে ব্যস্ত বিহঙ্গম নীলাম্বর-তলে বিনা শব্দে উড়িতেছিল ; আম্রকানন দোলাইয়া আমোদর-স্পর্শ-শীতল নৈদাঘ বায়ু তিলোত্তমার অলককুন্তল অথবা অংসারূঢ় চারু বাস কম্পিত করিতেছিল।

তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠক! কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমল-প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন ? একবার মাত্র দেখিয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই ; কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্ভ বয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, পুনঃ পুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণ-পথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখনও চিত্তমালিন্যজনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন ? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিবেন। যে মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যপ্রভাপ্রাচুর্য্যে মন প্রদীপ্ত করে, যে মূর্ত্তি লীলালাবণ্যাদির পারিপাট্যে হৃদয়মধ্যে বিষধরদন্ত রোপিত করে, এ সে মূর্ত্তি নহে ; যে মূর্ত্তি কোমলতা, মাধুর্য্যাদি গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়, এ সেই মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি সন্ধ্যাসমীরণ-কম্পিতা বসন্তলতার ন্যায় স্মৃতিমধ্যে দুলিতে থাকে, এ সেই মূর্ত্তি।

তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্ভবয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতিপ্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব-প্রকাশক ; তৎপার্শ্বে অতি নিবিড়-বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশসকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে ; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে ; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড়বর্ণ, চিত্রকরলিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার ; আর এক সূতা স্থূল হইলে নির্দ্দোষ হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস ? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবে না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত ; তাহাতে "বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ-চকিত" কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না। চক্ষু দুটি অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি শান্তজ্যোতিঃ। আর চক্ষুর বর্ণ, ঊষাকালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, চন্দ্রাস্তের সময়ে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ ; সেই প্রশস্ত পরিষ্কার চক্ষে যখন তিলোত্তমা দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলতা থাকিত না ; তিলোত্তমা অপাঙ্গে অর্দ্ধদৃষ্টি করিতে জানিতেন না, দৃষ্টিতে কেবল স্পষ্টতা আর সরলতা ; দৃষ্টির সরলতাও বটে, মনের সরলতাও বটে ; তবে যদি তাঁহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ কোমল পল্লব দুখানি পড়িয়া যাইত ; তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি করিতেন না। ওষ্ঠাধর দুইখানি গোলাবী, রসে টলমল করিত ; ছোট ছোট, একটু ঘুরান, একটু ফুলান,

একটু হাসি হাসি ; সে ওষ্ঠাধরে যদি একবার হাসি দেখিতে, তবে যোগী হও, মুনি হও, যুবা হও, বৃদ্ধ হও, আর ভুলিতে পারিতে না। অথচ সে হাসিতে সরলতা ও বালিকাভাব ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

তিলোত্তমার শরীর সুগঠন হইয়াও পূর্ণায়ত ছিল না ; বয়সের নবীনতা প্রযুক্তই হউক বা শরীরের স্বাভাবিক গঠনের জন্যই হউক, এই সুন্দর দেহে ক্ষীণতা ব্যতীত স্থূলতাগুণ ছিল না। অথচ তন্বীর শরীরমধ্যে সকল স্থানই সুগোল আর সুললিত। সুগোল প্রকোষ্ঠে রত্নবলয় ; সুগোল বাহুতে হীরকমণ্ডিত তাড় ; সুগোল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ; সুগোল উরুতে মেখলা ; সুগঠন অংসোপরে স্বর্ণহার, সুগঠন কণ্ঠে রত্নকণ্ঠী ; সর্ব্বত্রের গঠন সুন্দর।

তিলোত্তমা একাকিনী কক্ষবাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন ? সায়াহ্নগগনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন ? তাহা হইলে ভূতলে চক্ষু কেন ? নদীতীরজ কুসুমসুবাসিত বায়ু সেবন করিতেছেন ? তাহা হইলে ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইবে কেন ? মুখের এক পার্শ্ব ব্যতীত ত বায়ু লাগিতেছে না। গোচারণ দেখিতেছেন ? তাও নয়, গাভীসকল ত ক্রমে ক্রমে গৃহে আসিল ; কোকিল-রব শুনিতেছেন ? তবে মুখ এত ম্লান কেন ? তিলোত্তমা কিছুই দেখিতেছেন না, শুনিতেছেন না, চিন্তা করিতেছেন।

দাসীতে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। তিলোত্তমা চিন্তা ত্যাগ করিয়া একখান পুস্তক লইয়া প্রদীপের কাছে বসিলেন। তিলোত্তমা পড়িতে জানিতেন ; অভিরাম স্বামীর নিকট সংস্কৃত পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পুস্তকখানি কাদম্বরী। কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কাদম্বরী পরিত্যাগ করিলেন। আর একখান পুস্তক আনিলেন ; সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তা ; কখন পড়েন, কখন ভাবেন, আর বার পড়েন, আর বার অন্যমনে ভাবেন ; বাসবদত্তাও ভাল লাগিল না। তাহা ত্যাগ করিয়া গীতগোবিন্দ পড়িতে লাগিলেন ; গীতগোবিন্দ কিছু ক্ষণ ভাল লাগিল, পড়িতে পড়িতে সলজ্জ ঈষৎ হাসি হাসিয়া পুস্তক নিক্ষেপ করিলেন। পরে নিষ্কর্ম্মা হইয়া শয্যার উপরে বসিয়া রহিলেন। নিকটে একটা লেখনী ও মসীপাত্র ছিল ; অন্যমনে তাহা লইয়া পালঙ্কের কাষ্ঠে এ ও তা "ক" "স" "ম" ঘর, দ্বার, গাছ, মানুষ ইত্যাদি লিখিতে লাগিলেন ; ক্রমে ক্রমে খাটের এক বাজু কালির চিহ্নে পরিপূর্ণ হইল ; যখন আর স্থান নাই, তখন সে বিষয়ে চেতনা হইল। নিজ কার্য্য দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন ; আবার কি লিখিয়াছেন, তাহা হাসিতে হাসিতে পড়িতে লাগিলেন। কি লিখিয়াছেন ? "বাসবদত্তা," "মহাশ্বেতা," "ক," "ঈ," "ই," "প," একটা বৃক্ষ, সেঁজুতির শিব, "গীতগোবিন্দ," "বিমলা," লতা, পাতা, হিজি, বিজি, গড়—সর্ব্বনাশ, আর কি লিখিয়াছেন ?

"কুমার জগৎসিংহ।"

লজ্জায় তিলোত্তমার মুখ রক্তবর্ণ হইল। নির্ব্বুদ্ধি! ঘরে কে আছে যে লজ্জা?

"কুমার জগৎসিংহ।" তিলোত্তমা দুই বার, তিন বার, বহু বার পাঠ করিলেন; দ্বারের দিকে চাহেন আর পাঠ করেন; পুনর্ব্বার চাহেন আর পাঠ করেন, যেন চোর চুরি করিতেছে।

বড় অধিক ক্ষণ পাঠ করিতে সাহস হইল না, কেহ আসিয়া দেখিতে পাইবে। অতি ব্যস্তে জল আনিয়া লিপি ধৌত করিলেন; ধৌত করিয়া মনঃপূত হইল না; বস্ত্র দিয়া উত্তম করিয়া মুছিলেন; আবার পড়িয়া দেখিলেন, কালির চিহ্ন মাত্র নাই; তথাপি বোধ হইল, যেন এখনও পড়া যায়; আবার জল আনিয়া ধুইলেন, আবার বস্ত্র দিয়া মুছিলেন, তথাপি বোধ হইতে লাগিল, যেন লেখা রহিয়াছে—

"কুমার জগৎসিংহ।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিমলার মন্ত্রণা

বিমলা অভিরাম স্বামীর কুটীরমধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। অভিরাম স্বামী ভূমির উপর যোগাসনে বসিয়াছেন। জগৎসিংহের সহিত যে প্রকারে বিমলা ও তিলোত্তমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বিমলা তাহা আদ্যোপান্ত অভিরাম স্বামীর নিকট বর্ণন করিতেছিলেন; বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "আজ চতুর্দ্দশ দিবস; কাল পক্ষ পূর্ণ হইবেক।" অভিরাম স্বামী কহিলেন, "এক্ষণে কি স্থির করিয়াছ?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "উচিত পরামর্শ জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

স্বামী কহিলেন, "উত্তম, আমার পরামর্শ এই যে, এ বিষয় আর মনে স্থান দিও না।"

বিমলা অতি বিষণ্ণ বদনে নীরব হইয়া রহিলেন। অভিরাম স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিষণ্ণ হইলে কেন?"

বিমলা কহিলেন, "তিলোত্তমার কি উপায় হইবে?"

অভিরাম স্বামী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তিলোত্তমার মনে কি অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে?"

বিমলা কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "আপনাকে কত কহিব! আমি আজ চৌদ্দ দিন অহোরাত্র তিলোত্তমার ভাবগতিক বিলক্ষণ করিয়া দেখিতেছি, আমার মনে এমন বোধ হইয়াছে যে, তিলোত্তমার মনোমধ্যে অতি প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে।"

পরমহংস ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমরা স্ত্রীলোক; মনোমধ্যে অনুরাগের লক্ষণ দেখিলেই গাঢ় অনুরাগ বিবেচনা কর। বিমলে, তিলোত্তমার মনের সুখের জন্য চিন্তিত হইও না; বালিকা-স্বভাববশতঃই প্রথম দর্শনে মনশ্চাঞ্চল্য হইয়াছে; এ বিষয়ে কোন কথাবার্ত্তা উত্থাপন না হইলেই শীঘ্র জগৎসিংহকে বিস্মৃত হইবে।"

বিমলা কহিল, "না না, প্রভু, সে লক্ষণ নয়। পক্ষমধ্যে তিলোত্তমার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তিলোত্তমা আমার সঙ্গে কি বয়স্যাদিগের সঙ্গে সেরূপ দিবারাত্র হাসিয়া কথা কহে না; তিলোত্তমা আর প্রায় কথা কয় না; তিলোত্তমার পুস্তকসকল পালঙ্কের নীচে পড়িয়া পচিতেছে; তিলোত্তমার ফুলগাছসকল জলাভাবে শুষ্ক হইল; তিলোত্তমার পাখীগুলিতে আর সে যত্ন নাই; তিলোত্তমা নিজে আহার করে না; রাত্রে নিদ্রা যায় না; তিলোত্তমা বেশভূষা করে না; তিলোত্তমা কখন চিন্তা করে না, এক্ষণে দিবানিশি অন্যমনে থাকে। তিলোত্তমার মুখে কালিমা পড়িয়াছে।"

অভিরাম স্বামী শুনিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলেন, "আমার বোধ ছিল যে, দর্শনমাত্র গাঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না; তবে স্ত্রীচরিত্র, বিশেষতঃ বালিকাচরিত্র, ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু কি করিবে? বীরেন্দ্র এ সম্বন্ধে সম্মত হইবে না।"

বিমলা কহিল, "আমি সেই আশঙ্কায় এ পর্য্যন্ত ইহার কোন উল্লেখ করি নাই, মন্দিরমধ্যেও জগৎসিংহকে পরিচয় দিই নাই। কিন্তু এক্ষণে যদি সিংহ মহাশয়,"—এই কথা বলিতে বিমলার মুখের কিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইল—"এক্ষণে যদি সিংহ মহাশয় মানসিংহের সহিত মিত্রতা করিলেন, তবে জগৎসিংহকে জামাতা করিতে হানি কি?"

অ। মানসিংহই বা সম্মত হইবে কেন?

বি। না হয়, যুবরাজ স্বাধীন।

অ। জগৎসিংহই বা বীরেন্দ্রসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিবে কেন?

বি। জাতিকুলের দোষ কোন পক্ষেই নাই, জয়ধরসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরাও যদুবংশীয়।

অ। যদুবংশীয় কন্যা মুসলমানের শ্যালকপুত্রের বধূ হইবে?

বিমলা উদাসীনের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া কহিল, "না হইবেই বা কেন, যদুবংশের কোন্ কুল ঘৃণ্য?"

এই কথা বলিবামাত্র ক্রোধে পরমহংসের চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুরিত হইতে লাগিল; কঠোর স্বরে কহিলেন, "পাপীয়সি! নিজ হতভাগ্য বিস্মৃত হও নাই? দূর হও!"

নবম পরিচ্ছেদ

কুলতিলক

জগৎসিংহ পিতৃচরণ হইতে সসৈন্য বিদায় হইয়া যে যে কার্য্য করিলেন, তাহাতে পাঠান সৈন্যমধ্যে মহাভীতি প্রচার হইল। কুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া তিনি কতলু খাঁর পঞ্চাশৎ সহস্রকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া দিবেন, যদিও এ পর্য্যন্ত তত দূর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখাইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি শিবির হইতে আসিয়া দুই সপ্তাহে যে পর্য্যন্ত যোদ্ধৃপতিত্ব গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মানসিংহ কহিয়াছিলেন, "বুঝি আমার কুমার হইতে রাজপুত নামের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।"

জগৎসিংহ উত্তমরূপে জানিতেন, পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া পঞ্চাশৎ সহস্রকে সম্মুখ-সংগ্রামে বিমুখ করা কোন রূপেই সম্ভব নহে, বরং পরাজয় বা মৃত্যুই নিশ্চয়। অতএব সম্মুখসংগ্রামের চেষ্টায় না থাকিয়া, যাহাতে সম্মুখসংগ্রাম না হয়, এমন প্রকার রণপ্রণালী অবলম্বন করিলেন। তিনি নিজ সামান্যসংখ্যক সেনা সর্ব্বদা অতি গোপনে লুক্কায়িত রাখিতেন; নিবিড় বনমধ্যে বা ঐ প্রদেশে সমুদ্র-তরঙ্গবৎ কোথাও নিম্ন, কোথাও উচ্চ যে সকল ভূমি আছে, তন্মধ্যে এমন স্থানে শিবির করিতেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ ভূমিখণ্ড সকলের অন্তরালে, অতি নিকট হইতেও কেহ তাঁহার সেনা দেখিতে পাইত না। এইরূপ গোপন ভাবে থাকিয়া, যখন কোথাও স্বল্পসংখ্যক পাঠান সেনার সন্ধান পাইতেন, তরঙ্গ-প্রপাতবৎ বেগে তদুপরি সসৈন্য পতিত হইয়া তাহা একেবারে নিঃশেষ করিতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক চর ছিল; তাহারা ফলমূলমৎস্যাদিবিক্রেতা বা ভিক্ষুক উদাসীন ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদির বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পাঠান-সেনার গতিবিধির সন্ধান আনিয়া দিত। জগৎসিংহ সংবাদ পাইবামাত্র অতি সাবধানে অথচ দ্রুতগতি এমন স্থানে গিয়া সৈন্য সংস্থাপন করিতেন যে, যেন আগন্তুক পাঠান-সেনার উপরে সুকৌশলে এবং অপূর্ব্বদৃষ্ট হইয়া আক্রমণ করিতে পারেন। যদি পাঠান-সেনা অধিকসংখ্যক হইত, তবে জগৎসিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করার কোন স্পষ্ট উদ্যম করিতেন না; কেন না, তিনি জানিতেন, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় এক যুদ্ধে পরাজয় হইলে সকল নষ্ট হইবে। তখন কেবল পাঠান-সেনা চলিয়া গেলে সাবধানে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাদিগের আহারীয় দ্রব্য, অশ্ব, কামান ইত্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া চলিয়া আসিতেন। আর যদি পাঠান-সেনা প্রবল না হইয়া স্বল্পসংখ্যক হইত, তবে যত ক্ষণে সেনা নিজ মনোমত স্থান পর্য্যন্ত না

আসিত, সে পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গোপনীয় স্থানে থাকিতেন ; পরে সময় বুঝিয়া, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় চীৎকার শব্দে ধাবমান হইয়া হতভাগ্য পাঠানদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেন। সে অবস্থায় পাঠানেরা শত্রুর নিকটস্থিতি অবগত থাকিত না ; সুতরাং রণ জন্য প্রস্তুত থাকিত না। অকস্মাৎ শত্রুপ্রবাহমুখে পতিত হইয়া প্রায় বিনা যুদ্ধে প্রাণ হারাইত।

এইরূপে বহুতর পাঠান-সৈন্য নিপাত হইল। পাঠানেরা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইল ; এবং সম্মুখসংগ্রামে জগৎসিংহের সৈন্য বিনষ্ট করিবার জন্য বিশেষ সযত্ন হইল। কিন্তু জগৎসিংহের সৈন্য কোথায় থাকে, কোন সন্ধান পাওয়া যায় না ; কেবল যমদূতের ন্যায় পাঠান-সেনার মৃত্যুকালে এক বার দেখা দিয়া মৃত্যুকার্য্য সম্পাদন করিয়া অন্তর্ধান করে। জগৎসিংহ কৌশলময় ; তিনি পঞ্চ সহস্র সেনা সর্ব্বদা একত্র রাখিতেন না ; কোথায় সহস্র, কোথায় পঞ্চ শত, কোথায় দ্বিশত, কোথায় দ্বিসহস্র, এইরূপে ভাগে ভাগে, যখন যথায় যেরূপ শত্রু সন্ধান পাইতেন, তখন সেইরূপ পাঠাইতেন ; কার্য্য সম্পাদন হইলে আর তথায় রাখিতেন না। কখন্ কোন্খানে রাজপুত আছে, কোন্খানে নাই, পাঠানেরা কিছুই স্থির করিতে পারিত না। কতলু খাঁর নিকট প্রত্যহই সেনানাশের সংবাদ আসিত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সকল সময়েই অমঙ্গল সংবাদ আসিত। ফলে যে কার্য্যেই হউক না, পাঠান-সেনার অল্প সংখ্যায় দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া দুঃসাধ্য হইল। লুঠপাট একেবারে বন্ধ হইল ; সেনাসকল দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল ; অধিকন্তু আহার আহরণ করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। শত্রুপীড়িত প্রদেশ এইরূপ সুশাসিত হওয়ার সংবাদ পাইয়া মহারাজ মানসিংহ পুত্রকে এই পত্র লিখিলেন,

"কুলতিলক! তোমা হইতে রাজ্যাধিকার পাঠানশূন্য হইবে জানিলাম ; অতএব তোমার সাহায্যার্থ আর দশ সহস্র সেনা পাঠাইলাম।"

যুবরাজ প্রত্যুত্তর লিখিলেন,—

"মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায় ; আর সেনা আইসে ভাল ; নচেৎ ও শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাস পঞ্চ সহস্রে ক্ষত্রকুলোচিত প্রতিজ্ঞাপালন করিবেক।"

কুমার বীরমদে মত্ত হইয়া অবাধে রণজয় করিতে লাগিলেন। শৈলেশ্বর! তোমার মন্দিরমধ্যে যে সুন্দরীর সরল দৃষ্টিতে এই যোদ্ধা পরাভূত হইয়াছিলেন, সে সুন্দরীকে সেনা-কোলাহলমধ্যে কি তাঁহার এক বারও মনে পড়ে নাই ? যদি না পড়িয়া থাকে, তবে জগৎসিংহ তোমারই ন্যায় পাষাণ।

দশম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণার পর উদ্যোগ

যে দিবস অভিরাম স্বামী বিমলার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহার পরদিন প্রদোষকালে বিমলা নিজ কক্ষে বসিয়া বেশভূষা করিতেছিলেন। পঞ্চত্রিংশৎবর্ষীয়ার বেশভূষা ? কেনই বা না করিবে ? বয়সে কি যৌবন যায় ? যৌবন যায় রূপে আর মনে ; যার রূপ নাই, সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা ; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ ; যার রস আছে, সে চিরকাল নবীন। বিমলার আজও রূপে শরীর ঢলঢল করিতেছে, রসে মন টলটল করিতেছে। বয়সে আরও রসের পরিপাক ; পাঠক মহাশয়ের যদি কিঞ্চিৎ বয়স হইয়া থাকে, তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন।

কে বিমলার সে তাম্বূলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর দেখিয়া বলিবে, এ যুবতী নয় ? তাহার কজ্জলনিবিড় প্রশস্ত লোচনের চকিত কটাক্ষ দেখিয়া কে বলিবে যে, এ চতুর্ব্বিংশতির পরপারে পড়িয়াছে ? কি চক্ষু ! সুদীর্ঘ ; চঞ্চল ; আবেশময়। কোন কোন প্রগল্ভ-যৌবনা কামিনীর চক্ষু দেখিবামাত্র মনোমধ্যে বোধ হয় যে, এই রমণী দর্পিতা ; এ রমণী সুখলালসাপরিপূর্ণা। বিমলার চক্ষু সেইরূপ। আমি নিশ্চিত পাঠক মহাশয়কে বলিতেছি, বিমলা যুবতী, স্থিরযৌবনা বলিলেও বলা যায়। তাঁহার সে চম্পকবর্ণ ত্বকের কোমলতা দেখিলে কে বলিবে যে, ষোড়শী তাঁহার অপেক্ষা কোমলা ? যে একটি অতি ক্ষুদ্র গুচ্ছ অলককেশ কুঞ্চিত হইয়া কর্ণমূল হইতে অসাবধানে কপোলদেশে পড়িয়াছে, কে দেখিয়া বলিবে যে, যুবতীর কপোলে যুবতীর কেশ পড়ে নাই ? পাঠক ! মনশ্চক্ষু উন্মীলন কর ; যেখানে বসিয়া দর্পণসম্মুখে বিমলা কেশবিন্যাস করিতেছে, তাহা দেখ ; বিপুল কেশগুচ্ছ বাম করে লইয়া, সম্মুখে রাখিয়া যে প্রকারে তাহাতে চিরণী দিতেছে, দেখ ; নিজ যৌবনভাব দেখিয়া টিপি টিপি যে হাসিতেছে, তাহা দেখ ; মধ্যে মধ্যে বীণানিন্দিত মধুর স্বরে যে মৃদু মৃদু সঙ্গীত করিতেছে, তাহা শ্রবণ কর ; দেখিয়া শুনিয়া বল, বিমলা অপেক্ষা কোন্ নবীনা তোমার মনোমোহিনী ?

বিমলা কেশ বিন্যস্ত করিয়া কবরী বন্ধন করিলেন না ; পৃষ্ঠদেশে বেণী লম্বিত করিলেন। গন্ধবারিসিক্ত রুমালে মুখ পরিষ্কার করিলেন ; গোলাপপূগকর্পূরপূর্ণ তাম্বূলে পুনর্ব্বার ওষ্ঠাধর রঞ্জন করিলেন ; মুক্তাভূষিত কাঁচলি লইয়া বক্ষে দিলেন ; সর্ব্বাঙ্গে কনকরত্নভূষা পরিধান করিলেন ; আবার কি ভাবিয়া তাহার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলেন ;

বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত বসন পরিলেন; মুক্তা-শোভিত পাদুকা গ্রহণ করিলেন; এবং সুবিন্যস্ত চিকুরে যুবরাজদত্ত বহুমূল্য মুক্তাহার রোপিত করিলেন।

বিমলা বেশ করিয়া তিলোত্তমার কক্ষে গমন করিলেন। তিলোত্তমা দেখিবামাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন; হাসিয়া কহিলেন, "এ কি, বিমলা! এ বেশ কেন?"

বিমলা কহিলেন, "তোর সে কথায় কাজ কি?"

তি। সত্য বল না, কোথায় যাবে?

বি। আমি যে কোথায় যাব, তোমাকে কে বলিল?

তিলোত্তমা অপ্রতিভ হইলেন। বিমলা তাঁহার লজ্জা দেখিয়া সকরুণে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমি অনেক দূর যাব।"

তিলোত্তমার মুখ প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় হর্ষবিকসিত হইল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাবে?"

বিমলা সেইরূপ মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আন্দাজ কর না?"

তিলোত্তমা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বিমলা তখন তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া, "শুন দেখি" বলিয়া গবাক্ষের নিকট লইয়া গেলেন। তথায় কাণে কাণে কহিলেন, "আমি শৈলেশ্বর-মন্দিরে যাব; তথায় কোন রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

তিলোত্তমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কিছুই উত্তর করিলেন না।

বিমলা বলিতে লাগিলেন, "অভিরাম ঠাকুরের সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল, ঠাকুরের বিবেচনায় জগৎসিংহের সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারে না। তোমার বাপ কোন মতে সম্মত হইবেন না। তাঁর সাক্ষাতে এ কথা পাড়িলে ঝাঁটা লাথি না খাই ত বিস্তর।"

"তবে কেন"—তিলোত্তমা অধোবদনে, অস্ফুটস্বরে, পৃথিবী পানে চাহিয়া এই দুইটি কথা বলিলেন, "তবে কেন?"

বি। কেন? আমি রাজপুত্রের নিকট স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ রাত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিচয় দিব। শুধু পরিচয় পাইলে কি হইবে? এখন ত পরিচয় দিই, তার পর তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তিনি করিবেন। রাজপুত্র যদি তোমাতে অনুরক্ত হন—

তিলোত্তমা তাঁহাকে আর বলিতে না দিয়া মুখে বস্ত্র দিয়া কহিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া লজ্জা করে; তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাও না কেন, আমার কথা কাহাকে বলিও না, আর আমার কাছে কাহারও কথা বলিও না।"

বিমলা পুনর্ব্বার হাসিয়া কহিলেন, "তবে এ বালিকা-বয়সে এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে কেন ?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "তুই যা ! আমি আর তোর কোন কথা শুনিব না।"

বি। তবে আমি মন্দিরে যাব না।

তি। আমি কি কোথাও যেতে বারণ করিতেছি ? যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাও না।

বিমলা হাসিতে লাগিলেন ; কহিলেন, "তবে আমি যাইব না।"

তিলোত্তমা পুনরায় অধোমুখী হইয়া কহিলেন, "যাও।" বিমলা আবার হাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "আমি চলিলাম ; আমি যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ নিদ্রা যাইও না।"

তিলোত্তমাও ঈষৎ হাসিলেন ; সে হাসির অর্থ এই যে, "নিদ্রা আসিবে কেন ?" বিমলা তাহা বুঝিতে পারিলেন। গমনকালে বিমলা এক হস্ত তিলোত্তমার অংসদেশে ন্যস্ত করিয়া, অপর হস্তে তাঁহার চিবুক গ্রহণ করিলেন ; এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সরল প্রেমপবিত্র মুখ প্রতি দৃষ্টি করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। তিলোত্তমা দেখিতে পাইলেন, যখন বিমলা চলিয়া যান, তখন তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু বারি রহিয়াছে।

কক্ষদ্বারে আশ্‌মানি আসিয়া বিমলাকে কহিল, "কর্ত্তা তোমাকে ডাকিতেছেন।"

তিলোত্তমা শুনিতে পাইয়া, আসিয়া কাণে কাণে কহিলেন, "বেশ ত্যাগ করিয়া যাও।"

বিমলা কহিলেন, "ভয় নাই।"

বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের শয়নকক্ষে গেলেন। তথায় বীরেন্দ্রসিংহ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। এক দাসী পদসেবা, অন্যে ব্যজন করিতেছিল। পালঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া বিমলা কহিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা ?"

বীরেন্দ্রসিংহ মস্তকোত্তোলন করিয়া চমৎকৃত হইলেন ; বলিলেন, "বিমলা, তুমি কর্ম্মান্তরে যাইবে না কি ?"

বিমলা কহিলেন, "আজ্ঞা। আমার প্রতি কি আজ্ঞা ছিল ?"

বী। তিলোত্তমা কেমন আছে ? শরীর অসুস্থ ছিল, ভাল হইয়াছে ?

বি। ভাল হইয়াছে।

বী। তুমি আমাকে ক্ষণেক ব্যজন কর, আশ্‌মানি তিলোত্তমাকে আমার নিকট ডাকিয়া আনুক।

ব্যজনকারিণী দাসী ব্যজন রাখিয়া গেল।

বিমলা আশ্‌মানিকে বাহিরে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন। বীরেন্দ্র অপরা দাসীকে কহিলেন, "লচমণি, তুই আমার জন্য পান তৈয়ার করিয়া আন।" পদসেবাকারিণী চলিয়া গেল।

বী। বিমলা, তোমার আজ এ বেশ কেন ?

বি। আমার প্রয়োজন আছে।

বী। কি প্রয়োজন আছে আমি শুনিব।

বি। "তবে শুনুন" বলিতে বলিতে বিমলা মন্মথশয্যারূপী চক্ষুর্দ্বয়ে বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, "তবে শুনুন, আমি এখন অভিসারে গমন করিব।"

বী। যমের সঙ্গে না কি ?

বি। কেন, মানুষের সঙ্গে কি হইতে নাই ?

বী। সে মানুষ আজিও জন্মে নাই।

বি। এক জন ছাড়া।

এই বলিয়া বিমলা বেগে প্রস্থান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আশ্‌মানির দৌত্য

এদিকে বিমলার ইঙ্গিতমত আশ্‌মানি গৃহের বাহিরে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিমলা আসিয়া তাহাকে কহিলেন, "আশ্‌মান্, তোমার সঙ্গে কোন বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।"

আশ্‌মানি কহিল, "বেশভূষা দেখিয়া আমিও ভাবিতেছিলাম, আজ কি একটা কাণ্ড।"

বিমলা কহিলেন, "আমি আজ কোন প্রয়োজনে অধিক দূর যাইব। এ রাত্রে একাকিনী যাইতে পারিব না ; তুমি ছাড়া আর কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া সঙ্গে লইতে পারিব না ; তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

আশ্‌মানি জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবে ?"

বিমলা কহিলেন, "আশ্‌মানি, তুমি ত সেকালে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে না ?"

আশ্‌মানি কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "তবে তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি কতকগুলা কাজ সারিয়া আসি।"

বিমলা কহিলেন, "আর একটা কথা আছে ; মনে কর, যদি তোমার সঙ্গে আজ সেকালের কোন লোকের দেখা হয়, তবে কি তোমাকে সে চিনিতে পারিবে ?"

আশ্‌মানি বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সে কি ?"

বিমলা কহিলেন, "মনে কর, যদি কুমার জগৎসিংহের সহিত দেখা হয় ?"

আশ্‌মানি অনেক ক্ষণ নীরব থাকিয়া গদ্গদ স্বরে কহিল, "এমন দিন কি হবে ?"

বিমলা কহিলেন, "হইতেও পারে।"

আশ্‌মানি কহিল, "কুমার চিনিতে পারিবেন বৈ কি।"

বিমলা কহিলেন, "তবে তোমার যাওয়া হইবে না, আর কাহাকে লইয়া যাই,—একাও ত যাইতে পারি না।"

আশ্‌মানি কহিল, "কুমার দেখিব মনে বড়ই সাধ হইতেছে।"

বিমলা কহিলেন, "মনের সাধ মনে থাক্ ; এখন আমি কি করি ?"

বিমলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশ্‌মানি অকস্মাৎ মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। বিমলা কহিলেন, "মর্ ! আপনা আপনি হেসে মরিস্ কেন ?"

আশ্‌মানি কহিল, "মনে মনে ভাবিতেছিলাম, বলি আমার সোণার চাঁদ দিগ্‌গজকে তোমার সঙ্গে পাঠাইলে কি হয় ?"

বিমলা হাসিয়া উল্লাসে কহিলেন, "সেই কথাই ভাল ; রসিকরাজকেই সঙ্গে লইব।"

আশ্‌মানি বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কি, আমি যে তামাসা করিতেছিলাম ?"

বিমলা কহিলেন, "তামাসা না, বোকা বামুনকে আমার অবিশ্বাস নাই। অন্ধের দিন রাত্রি নাই, ও ত কিছুই বুঝিতে পারিবে না, সুতরাং ওকে অবিশ্বাস নাই। তবে বামুন যেতে চাবে না।"

আশ্‌মানি হাসিয়া কহিল, "সে ভার আমার ; আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিতেছি, তুমি ফটকের সম্মুখে একটু অপেক্ষা করিও।"

এই বলিয়া আশ্‌মানি হাসিতে হাসিতে দুর্গমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র কুটীরাভিমুখে চলিল।

অভিরাম স্বামীর শিষ্য গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ইতিপূর্ব্বেই পাঠক মহাশয়ের নিকট একবার পরিচিত হইয়াছেন। যে হেতুতে বিমলা তাঁহার রসিকরাজ নাম রাখিয়াছিলেন, তাহাও পাঠক মহাশয় অবগত আছেন। সেই মহাপুরুষ এই কুটীরের অধিকারী। দিগ্‌গজ মহাশয় দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত হইবেন, প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙ্গুল। পা দুইখানি কাঁকাল হইতে মাটি পর্য্যন্ত মাপিলে চৌদ্দপুয়া চারি হাত হইবেক ; প্রস্থে রলা কাষ্ঠের পরিমাণ। বর্ণ দোয়াতের কালি ; বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ঠভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছু মাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধেক অঙ্গার করিয়া

ফেলিয়া দিয়াছেন। দিগ্‌গজ মহাশয় অধিক দৈর্ঘ্যবশতঃ একটু একটু কুঁজো ; অবয়বের মধ্যে নাসিকা প্রবল, শরীরে মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন হইয়াছে। মাথাটি বেহারা-কামান, কামান চুলগুলি যাহা আছে, তাহা ছোট ছোট, আবার হাত দিলে সূচ ফুটে। আর্ক-ফলার ঘটাটা জাঁকাল রকম।

গজপতি 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' উপাধি সাধ করিয়া পান নাই। বুদ্ধিখানা অতি তীক্ষ্ণ। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সাড়ে সাত মাসে "সহর্ণে র্ঘঃ" সূত্রটি ব্যাখ্যা শুদ্ধ মুখস্থ হয়! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুগ্রহে আর দশ জনের গোলে হরিবোলে পঞ্চদশ বর্ষ পাঠ করিয়া শব্দকাণ্ড শেষ করিলেন। পরে অন্য কাণ্ড আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অধ্যাপক ভাবিলেন, "দেখি দেখি কাণ্ডখানাই কি ?" শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি বাপু, রাম শব্দের উত্তর অম্‌ করিলে কি হয় ?" ছাত্র অনেক ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "রামকান্ত।" অধ্যাপক কহিলেন, "বাপু, তোমার বিদ্যা হইয়াছে ; তুমি এক্ষণে গৃহে যাও, তোমার এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে ; আমার আর বিদ্যা নাই যে তোমাকে দান করিব।"

গজপতি অতি সাহঙ্কার-চিত্ত হইয়া কহিলেন, "আমার এক নিবেদন—আমার উপাধি ?"

অধ্যাপক কহিলেন, "বাপু, তুমি যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছ, তোমার নূতন উপাধি আবশ্যক, তুমি 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' উপাধি গ্রহণ কর।"

দিগ্‌গজ হৃষ্টচিত্তে গুরুপদে প্রণাম করিয়া গৃহে চলিলেন।

গৃহে আসিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত মনে মনে ভাবিলেন, "ব্যাকরণাদিতে ত কৃতবিদ্য হইলাম। এক্ষণে কিঞ্চিৎ স্মৃতি পাঠ করা আবশ্যক। শুনিয়াছি, অভিরাম স্বামী বড় পণ্ডিত, তিনি ব্যতীত আমাকে শিক্ষা দেয়, এমন লোক আর নাই, অতএব তাঁহার নিকটে গিয়া কিছু স্মৃতি শিক্ষা করা উচিত।" এই স্থির করিয়া দিগ্‌গজ দুর্গমধ্যে অধিষ্ঠান করিলেন। অভিরাম স্বামী অনেককে শিক্ষা দিতেন ; কাহারও প্রতি বিরক্ত ছিলেন না। দিগ্‌গজ কিছু শিখুক বা না শিখুক, অভিরাম স্বামী তাহাকে পাঠ দিতেন।

গজপতি ঠাকুর কেবল বৈয়াকরণ আর স্মার্ত্ত নহেন ; একটু আলঙ্কারিক, একটু একটু রসিক, ঘৃতভাণ্ড তাহার পরিচয়ের স্থল। তাঁহার রসিকতার আড়ম্বরটা কিছু আশ্‌মানির প্রতি গুরুতর হইত ; তাহার কিছু গূঢ় তাৎপর্য্যও ছিল। গজপতি মনে করিতেন, "আমার তুল্য ব্যক্তির ভারতে কেবল লীলা করিতে আসা ; এই আমার শ্রীবৃন্দাবন ; আশ্‌মানি আমার রাধিকা।" আশ্‌মানিও রসিকা ; মদনমোহন পাইয়া বানরপোষার সাধ মিটাইয়া লইত। বিমলাও সন্ধান পাইয়া কখনও বানর নাচাইতে যাইতেন। দিগ্‌গজ মনে করিতেন,

"এই আমার চন্দ্রাবলী জুটিয়াছে ; না হবে কেন ? যে ঘৃতভাণ্ড ঝাড়িয়াছি ; ভাগ্যে বিমলা জানে না, ওটি আমার শোনা কথা ।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আশ্‌মানির অভিসার

দিগ্‌গজ গজপতির মনোমোহিনী আশ্‌মানি কিরূপ রূপবতী, জানিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার সাধ পূরাইব। কিন্তু স্ত্রীলোকের রূপবর্ণনবিষয়ে গ্রন্থকারগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, আমার সদৃশ অকিঞ্চন জনের তৎপদ্ধতিবহির্ভূত হওয়া অতি ধৃষ্টতার বিষয়। অতএব প্রথমে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য।

হে বাগ্‌দেবি ! হে কমলাসনে ! শরদিন্দুনিভাননে ! অমলকমল-দলনিন্দিত-চরণ-ভক্তজন-বৎসলে ! আমাকে সেই চরণকমলের ছায়া দান কর ; আমি আশ্‌মানির রূপ বর্ণন করিব। হে অরবিন্দানন-সুন্দরীকুল-গর্ব্ব-খর্ব্বকারিণি ! হে বিশাল রসাল দীর্ঘ-সমাস-পটল-সৃষ্টিকারিণি ! একবার পদনখের এক পার্শ্বে স্থান দাও, আমি রূপ বর্ণন করিব। সমাস-পটল, সন্ধি-বেগুন, উপমা-কাঁচাকলার চড়চড়ি রাঁধিয়া এই খিচুড়ি তোমায় ভোগ দিব। হে পণ্ডিতকুলেপ্সিত-পয়ঃপ্রস্রবিণি ! হে মূর্খজনপ্রতি ক্বচিৎ কৃপাকারিণি ! হে অঙ্গুলি-কণ্ডুয়ন-বিষমবিকার-সমুৎপাদিনি ! হে বটতলা-বিদ্যাপ্রদীপ-তৈলপ্রদায়িনি ! আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও। মা ! তোমার দুই রূপ ; যে রূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল, যে প্রকৃতির ধ্যান করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ, ভবভূতি উত্তরচরিত, ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছিলেন, সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইও না ; যে মূর্ত্তি ভাবিয়া শ্রীহর্ষ নৈষধ লিখিয়াছিলেন, যে প্রকৃতিপ্রসাদে ভারতচন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব্ব রূপবর্ণন করিয়া বঙ্গদেশের মনোমোহন করিয়াছেন, যাহার প্রসাদে দাশরথি রায়ের জন্ম, যে মূর্ত্তিতে আজও বটতলা আলো করিতেছ, সেই মূর্ত্তিতে একবার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশ্‌মানির রূপ বর্ণন করি।

আশ্‌মানির বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায় ; ফণিনী সেই তাপে মনে ভাবিল, যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজনটা কি ! আমি গর্ত্তে যাই। এই ভাবিয়া সাপ গর্ত্তের ভিতর গেলেন। ব্রহ্মা

দেখিলেন প্রমাদ; সাপ গর্ত্তে গেলেন, মানুষ দংশন করে কে? এই ভাবিয়া তিনি সাপকে ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলেন, সাপ বাহিরে আসিয়া, আবার মুখ দেখাইতে হইল, এই ক্ষোভে মাথা কুটিতে লাগিল; মাথা কুটিতে কুটিতে মাথা চেপ্টা হইয়া গেল, সেই অবধি সাপের ফণা হইয়াছে। আশ্‌মানির মুখচন্দ্র অধিক সুন্দর, সুতরাং চন্দ্রদেব উদিত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট নালিশ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, ভয় নাই, তুমি গিয়া উদিত হও, আজি হইতে স্ত্রীলোকদিগের মুখ আবৃত হইবে; সেই অবধি ঘোমটার সৃষ্টি। নয়ন দুটি যেন খঞ্জন, পাছে পাখী ডানা বাহির করিয়া উড়িয়া পলায়, এই জন্য বিধাতা পল্লবরূপ পিঁজরার কবাট করিয়া দিয়াছেন। নাসিকা গরুড়ের নাসার ন্যায় মহাবিশাল; দেখিয়া গরুড় আশঙ্কায় বৃক্ষারোহণ করিল, সেই অবধি পক্ষিকুল বৃক্ষের উপরেই থাকে। কারণান্তরে দাড়িম্ব বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পাটনা অঞ্চলে পলাইয়া রহিলেন; আর হস্তী কুম্ভ লইয়া ব্রহ্মদেশে পলাইলেন; বাকি ছিলেন ধবলগিরি, তিনি দেখিলেন যে, আমার চূড়া কতই বা উচ্চ, আড়াই ক্রোশ বই ত নয়, এ চূড়া অন্যূন তিন ক্রোশ হইবেক; এই ভাবিতে ভাবিতে ধবলগিরির মাথা গরম হইয়া উঠিল, বরফ ঢালিতে লাগিলেন, তিনি সেই অবধি মাথায় বরফ দিয়া বসিয়া আছেন।

কপালের লিখনদোষে আশ্‌মানি বিধবা! আশ্‌মানি দিগ্‌গজের কুটীরে আসিয়া দেখিল যে, কুটীরের দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাকিল, "ও ঠাকুর!"

কেউ উত্তর দিল না।

"বলি ও গোঁসাই!"

উত্তর নাই।

"মর্ বিট্‌লে কি করিতেছে? ও রসিকরাজ রসোপাধ্যায় প্রভু!"

উত্তর নাই।

আশ্‌মানি কুটীরের দ্বারের ছিদ্র দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছে, এই জন্য কথা নাই, কথা কহিলে ব্রাহ্মণের আহার হয় না। আশ্‌মানি ভাবিল, "ইহার আবার নিষ্ঠা; দেখি দেখি, কথা কহিয়া আবার খায় কি না।"

"বলি ও রসিকরাজ!"

উত্তর নাই।

"ও রসরাজ!"

উত্তর। "হুম্।"

বামুন ভাত গালে করিয়া উত্তর দিতেছে, ও ত কথা হলো না—এই ভাবিয়া আশ্‌মানি কহিল, "ও রসমাণিক!"

উত্তর। "হুম্।"

আ। বলি কথাই কও না, খেও এর পরে।

উত্তর। "হ—উ—উম্!"

আ। বটে, বামুন হইয়া এই কাজ—আজি স্বামিঠাকুরকে বলে দেব, ঘরের ভিতর কে ও?

ব্রাহ্মণ সশঙ্কচিত্তে শূন্য ঘরের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ নাই দেখিয়া পুনর্ব্বার আহার করিতে লাগিল।

আশ্‌মানি বলিল, "ও মাগি যে জেতে চাঁড়াল! আমি যে চিনি!"

দিগ্‌গজের মুখ শুকাইল। বলিল, "কে চাঁড়াল? ছুঁয়া পড়ে নি ত?"

আশ্‌মানি আবার কহিল, "ও, আবার খাও যে? কথা কহিয়া আবার খাও?"

দি। কই, কখন কথা কহিলাম?

আশ্‌মানি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "এই ত কহিলে।"

দি। বটে, বটে, বটে, তবে আর খাওয়া হইল না।

আ। হাঁ ত; উঠে আমায় দ্বার খুলে দাও।

আশ্‌মানি ছিদ্র হইতে দেখিতেছিল, ব্রাহ্মণ যথার্থই অন্নত্যাগ করিয়া উঠে। কহিল, "না, না, ও কয়টি ভাত খাইয়া উঠিও।"

দি। না, আর খাওয়া হইবে না, কথা কহিয়াছি।

আ। সে কি? না খাও ত আমার মাথা খাও।

দি। রাধে মাধব! কথা কহিলে কি আর আহার করিতে আছে?

আ। বটে, তবে আমি চলিলাম; তোমার সঙ্গে আমার অনেক মনের কথা ছিল, কিছুই বলা হইল না। আমি চলিলাম।

দি। না, না, আশ্‌মান্! তুমি রাগ করিও না; আমি এই খাইতেছি।

ব্রাহ্মণ আবার খাইতে লাগিল; দুই তিন গ্রাস আহার করিবামাত্র আশ্‌মানি কহিল, "উঠ, হইয়াছে; দ্বার খোল।"

দি। এই কটা ভাত খাই।

আ। এ যে পেট আর ভরে না; উঠ, নহিলে কথা কহিয়া ভাত খাইয়াছ, বলিয়া দিব।

দি। আঃ নাও; এই উঠিলাম।

ব্রাহ্মণ অতি ক্ষুণ্ণমনে অন্নত্যাগ করিয়া, গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আশ্‌মানির প্রেম

দ্বার খুলিলে আশ্‌মানি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দিগ্‌গজের হৃদ্বোধ হইল যে, প্রণয়িনী আসিয়াছেন, ইহার সরস অভ্যর্থনা করা চাই, অতএব হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি !"

আশ্‌মানি কহিল, "এটি যে বড় সরস কবিতা, কোথা পাইলে ?"

দি। তোমার জন্য এটি আজ রচনা করিয়া রাখিয়াছি।

আ। সাধ করিয়া কি তোমায় রসিকরাজ বলেছি ?

দি। সুন্দরি ! তুমি বইস ; আমি হস্ত প্রক্ষালন করি।

আশ্‌মানি মনে মনে কহিল, "আলোপ্পেয়ে ! তুমি হাত ধোবে ? আমি তোমাকে ঐ এঁটো আবার খাওয়াব।"

প্রকাশ্যে কহিল, "সে কি, হাত ধোও যে, ভাত খাও না।"

গজপতি কহিলেন, "কি কথা, ভোজন করিয়া উঠিয়াছি, আবার ভাত খাব কিরূপে ?"

আ। কেন, তোমার ভাত রহিয়াছে যে ? উপবাস করিবে ?

দিগ্‌গজ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "কি করি, তুমি তাড়াতাড়ি করিলে।" এই বলিয়া সতৃষ্ণনয়নে অন্ন পানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

আশ্‌মানি কহিল, "তবে আবার খাইতে হইবে।"

দি। রাধে মাধব ! গণ্ডূষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, আবার খাইব ?

আ। "হাঁ, খাইবে বই কি। আমারই উৎসৃষ্ট খাইবে।" এই বলিয়া আশ্‌মানি ভোজনপাত্র হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া আপনি খাইল।

ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

আশ্‌মানি উৎসৃষ্ট অন্ন ভোজনপাত্রে রাখিয়া কহিল, "খাও।"

ব্রহ্মণের বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই।

আ। খাও, শোন, কাহাকে বলিব না যে, তুমি আমার উৎসৃষ্ট খাইয়াছ। কেহ না জানিতে পারিলে দোষ কি ?

দি। তাও কি হয় ?

কিন্তু দিগ্‌গজের উদরমধ্যে অগ্নিদেব প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন। দিগ্‌গজ মনে মনে করিতেছিল যে, আশ্‌মানি যেমন সুন্দরী হউক না কেন, পৃথিবী ইহাকে গ্রাস করুন, আমি গোপনে ইহার উৎসৃষ্টাবশেষ ভোজন করিয়া দহ্যমান উদর শীতল করি।

আশ্‌মানি ভাব বুঝিয়া বলিল, "খাও—না খাও, একবার পাতের কাছে বসো।"

দি। কেন? তাতে কি হইবে?

আ। আমার সাধ। তুমি কি আমার একটা সাধ পুরাইতে পার না?

দিগ্‌গজ বলিলেন, "শুধু পাতের কাছে বসিতে কি? তাহাতে কোন দোষ নাই। তোমার কথা রাখিলাম।" এই বলিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত আশ্‌মানির কথায় পাতের কাছে গিয়া বসিলেন। উদরে ক্ষুধা, কোলে অন্ন, অথচ খাইতে পারিতেছেন না—দিগ্‌গজের চক্ষে জল আসিল।

আশ্‌মানি বলিল, "শূদ্রের উৎসৃষ্ট ব্রাহ্মণে ছুঁলে কি হয়?"

পণ্ডিত বলিলেন, "নাইতে হয়।"

আ। তুমি আমায় কেমন ভালবাস, আজ বুঝিয়া পড়িয়া তবে আমি যাব। তুমি আমার কথায় এই রাত্রে নাইতে পার?

দিগ্‌গজ মহাশয় ক্ষুদ্র চক্ষু রসে অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া দীর্ঘ নাসিকা বাঁকাইয়া, মধুর হাসি আকর্ণ হাসিয়া বলিলেন, "তার কথা কি? এখনই নাইতে পারি।"

আশ্‌মানি বলিল, "আমার ইচ্ছা হইয়াছে তোমার পাতে প্রসাদ পাইব! তুমি আপন হাতে আমাকে দুইটি ভাত মাখিয়া দাও।"

দিগ্‌গজ বলিল, "তার আশ্চর্য্য কি? স্নানেই শুচি।" এই বলিয়া উৎসৃষ্টাবশেষ একত্রিত করিয়া মাখিতে লাগিল।

আশ্‌মানি বলিল, "আমি একটি উপকথা বলি শুন। যত ক্ষণ আমি উপকথা বলিব, তত ক্ষণ তুমি ভাত মাখিবে, নইলে আমি খাইব না।"

দি। আচ্ছা।

আশ্‌মানি এক রাজা আর তাহার দুয়ো শুয়ো দুই রাণীর গল্প আরম্ভ করিল। দিগ্‌গজ হাঁ করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া শুনিতে লাগিল—আর ভাত মাখিতে লাগিল।

শুনিতে শুনিতে দিগ্‌গজের মন আশ্‌মানির গল্পে ডুবিয়া গেল—আশ্‌মানির হাসি, চাহনি ও নথের মাঝখানে আটকাইয়া রহিল। ভাত মাখা বন্ধ হইল—পাতে হাত লাগিয়া রহিল—কিন্তু ক্ষুধার যাতনাটা আছে। যখন আশ্‌মানির গল্প বড় জমিয়া আসিল—দিগ্‌গজের মন তাহাতে বড়ই নিবিষ্ট হইল—তখন দিগ্‌গজের হাত বিশ্বাসঘাতকতা করিল। পাত্রস্থ হাত, নিকটস্থ মাখা-ভাতের গ্রাস তুলিয়া, চুপি চুপি দিগ্‌গজের মুখে

লইয়া গেল। মুখ হাঁ করিয়া তাহা গ্রহণ করিল। দন্ত বিনা আপত্তিতে তাহা চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল। রসনা তাহা গলাধঃকরণ করাইল। নিরীহ দিগ্‌গজের কোন সাড়া ছিল না। দেখিয়া আশ্‌মানি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তবে রে বিট্‌লে—আমার এঁটো না কি খাবি নে ?"

তখন দিগ্‌গজের চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি আর এক গ্রাস মুখে দিয়া গিলিতে গিলিতে এঁটো হাতে আশ্‌মানির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। চর্ব্বণ করিতে করিতে কাঁদিয়া বলিল, "আমায় রাখ ; আশ্‌মান্! কাহাকেও বলিও না।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দিগ্‌গজহরণ

এমন সময় বিমলা আসিয়া, বাহির হইতে দ্বার নাড়িল। বিমলা দ্বারপার্শ্ব হইতে অলক্ষ্যে সকল দেখিতেছিল। দ্বারের শব্দ শুনিয়া দিগ্‌গজের মুখ শুকাইল। আশ্‌মানি বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, বিমলা আসিতেছে—লুকোও লুকোও।"

দিগ্‌গজ ঠাকুর কাঁদিয়া কহিল, "কোথায় লুকাইব ?"

আশ্‌মানি বলিল, "ঐ অন্ধকার কোণে একটা কেলে-হাঁড়ি মাথায় দিয়া বসো গিয়া—অন্ধকারে ঠাওর পাইবে না।" দিগ্‌গজ তাহাই করিতে গেল—আশ্‌মানির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় বিস্মিত হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাড়াতাড়িতে ব্রাহ্মণ একটা অড়হর ডালের হাঁড়ি পাড়িয়া মাথায় দিল—তাহাতে আধ হাঁড়ি রাঁধা অড়হর ডাল ছিল—দিগ্‌গজ যেমন হাঁড়ি উল্‌টাইয়া মাথায় দিবেন, অমনি মস্তক হইতে অড়হর ডালের শতধারা বহিল—টিকি দিয়া অড়হর ডালের স্রোত নামিল—স্কন্ধ, বক্ষ, পৃষ্ঠ ও বাহু হইতে অড়হর ডালের ধারা, পর্ব্বত হইতে ভূতলগামিনী নদীসকলের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে নামিতে লাগিল ; উচ্চ নাসিকা অড়হরের প্রস্রবণবিশিষ্ট গিরিশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই সময়ে বিমলা গৃহ প্রবেশ করিয়া দিগ্‌গজের শোভারাশি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দিগ্‌গজ বিমলাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেখিয়া বিমলার দয়া হইল। বিমলা বলিলেন, "কাঁদিও না। তুমি যদি এই অবশিষ্ট ভাতগুলি খাও, তবে আমরা কাহারও সাক্ষাতে এ সকল কথা বলিব না।"

ব্রাহ্মণ তখন প্রফুল্ল হইল ; প্রফুল্ল বদনে পুনশ্চ আহারে বসিল—ইচ্ছা, অঙ্গের অড়হর ডালটুকুও মুছিয়া লয়, কিন্তু তাহা পারিল না, কিংবা সাহস করিল না। আশ্‌মানির জন্য যে ভাত মাখিয়াছিল, তাহা খাইল। বিনষ্ট অড়হরের জন্য অনেক পরিতাপ করিল।

আহার সমাপনান্তে আশ্‌মানি তাহাকে স্নান করাইল। পরে ব্রাহ্মণ স্থির হইলে বিমলা কহিলেন, "রসিক! একটা বড় ভারি কথা আছে।"

রসিক কহিলেন, "কি ?"

বি। তুমি আমাদের ভালবাস ?

দি। বাসি নে ?

বি। তুই জনকেই ?

দি। তুই জনকেই।

বি। যা বলি, তা পারিবে ?

দি। পারিব না ?

বি। এখনই ?

দি। এখনই।

বি। এই দণ্ডে ?

দি। এই দণ্ডে।

বি। আমরা তুজনে কেন এসেছি জান ?

দি। না।

আশ্‌মানি কহিল, "আমরা তোমার সঙ্গে পলাইয়া যাব।"

ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া রহিলেন। বিমলা কষ্টে উচ্চ হাসি সম্বরণ করিলেন। কহিলেন, "কথা কও না যে ?"

"অ্যাঁ অ্যাঁ, তা তা তা তা"—বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইয়া উঠিল না।

আশ্‌মানি কহিল, "তবে কি পারিবে না ?"

"অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, তা তা—স্বামিঠাকুরকে বলিয়া আসি।"

বিমলা কহিলেন, "স্বামিঠাকুরকে আবার বল্‌বে কি ? এ কি তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত যে, স্বামিঠাকুরের কাছে ব্যবস্থা নিতে যাবে ?"

দি। না না, তা যাব না ; তা কবে যেতে হবে ?

বি। কবে ? এখনই চল, দেখিতেছ না, আমি গহনাপত্র লইয়া বাহির হইয়াছি।

দি। এখনই ?

বি। এখনই না ত কি ? নহিলে বল, আমরা অন্য লোকের তল্লাস করি।

গজপতি আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "চল, যাইতেছি।"

বিমলা বলিলেন, "দোছোট লও।"

দিগ্‌গজ নামাবলী গায়ে দিলেন। বিমলা অগ্রে, ব্রাহ্মণ পশ্চাতে যাত্রা করেন, এমন সময়ে দিগ্‌গজ বলিলেন, "সুন্দরি!"

বি। কি?

দি। আবার আসিবে কবে?

বি। আসিব কি আবার? একবারে চলিলাম।

হাসিতে দিগ্‌গজের মুখ পরিপূর্ণ হইল, বলিলেন, "তৈজসপত্র রহিল যে।"

বি। ও সব তোমায় কিনে দিব।

ব্রাহ্মণ কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন; কি করেন, স্ত্রীলোকেরা মনে করিবে, আমাদের ভালবাসে না, অভাবপক্ষে বলিলেন, "খুঙ্গীপুতি?"

বিমলা বলিলেন, "শীঘ্র লও।"

বিদ্যাদিগ্‌গজের সবে দুখানি পুতি,—ব্যাকরণ আর একখানি স্মৃতি। ব্যাকরণখানি হস্তে লইয়া বলিলেন, "এখানিতে কাজই বা কি, এ ত আমার কণ্ঠে আছে।" এই বলিয়া কেবল স্মৃতিখানি খুঙ্গীর মধ্যে লইলেন। 'দুর্গা শ্রীহরি' বলিয়া বিমলা ও আশ্‌মানির সহিত যাত্রা করিলেন।

আশ্‌মানি কহিল, "তোমরা আগু হও, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

এই বলিয়া আশ্‌মানি গৃহে গেল, বিমলা ও গজপতি একত্র চলিলেন। অন্ধকারে উভয়ে অলক্ষ্য থাকিয়া দুর্গদ্বারের বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দিগ্‌গজ কহিলেন, "কই, আশ্‌মানি আসিল না?"

বিমলা কহিলেন, "সে বুঝি আসিতে পারিল না। আবার তাকে কেন?"

রসিকরাজ নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তৈজসপত্র।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দিগ্‌গজের সাহস

বিমলা দ্রুতপাদবিক্ষেপে শীঘ্র মান্দারণ পশ্চাৎ করিলেন। নিশা অত্যন্ত অন্ধকার, নক্ষত্রালোকে সাবধানে চলিতে লাগিলেন। প্রান্তরপথে প্রবেশ করিয়া বিমলা কিঞ্চিৎ শঙ্কান্বিতা হইলেন; সমভিব্যাহারী নিঃশব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, বাক্যব্যয়ও নাই।

এমন সময়ে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিলে কিছু সাহস হয়, শুনিতে ইচ্ছাও করে। এই জন্য বিমলা গজপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রসিকরতন! কি ভাবিতেছ?"

রসিকরতন বলিলেন, "বলি তৈজসপত্রগুলা!"

বিমলা উত্তর না দিয়া, মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক কাল পরে, বিমলা আবার কথা কহিলেন, "দিগ্‌গজ, তুমি ভূতের ভয় কর?"

"রাম! রাম! রাম! রামনাম বল," বলিয়া দিগ্‌গজ বিমলার পশ্চাতে দুই হাত সরিয়া আসিলেন।

একে পায়, আরে চায়। বিমলা কহিলেন, "এ পথে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য।" দিগ্‌গজ আসিয়া বিমলার অঞ্চল ধরিলেন। বিমলা বলিতে লাগিলেন, "আমরা সে দিন শৈলেশ্বরের পূজা দিয়া আসিতেছিলাম, পথের মধ্যে বটতলায় দেখি যে, এক বিকটাকার মূর্ত্তি!"

অঞ্চলের তাড়নায় বিমলা জানিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মণ থরহরি কাঁপিতেছে; বুঝিলেন যে, আর অধিক বাড়াবাড়ি করিলে ব্রাহ্মণের গতিশক্তি রহিত হইবে। অতএব ক্ষান্ত হইয়া কহিলেন, "রসিকরাজ! তুমি গাইতে জান?"

রসিক পুরুষ কে কোথায় সঙ্গীতে অপটু? দিগ্‌গজ বলিলেন, "জানি বই কি।"

বিমলা বলিলেন, "একটি গীত গাও দেখি।"

দিগ্‌গজ আরম্ভ করিলেন,

"এ হুম্—উ, হুম্—
সই, কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে কদম্বেরি ডালে।"

পথের ধারে একটা গাভী শয়ন করিয়া রোমন্থ করিতেছিল, অলৌকিক শব্দ শুনিয়া বেগে পলায়ন করিল।

রসিকের গীত চলিতে লাগিল।

"সেই দিন পুড়িল কপাল মোর—
কালি দিলাম কুলে।
মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশী, কথা কয় হাসি হাসি;
বলে ও গোয়ালা মাসী—কলসী দিব ফেলে।"

দিগ্‌গজের আর গান হইল না; হঠাৎ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল; অমৃতময়, মানসোন্মাদকর অপ্সরোহস্তস্থিত বীণাশব্দবৎ মধুর সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বিমলা নিজে পূর্ণস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন।

নিস্তব্ধ প্রান্তরমধ্যে নৈশ গগন ব্যাপিয়া সেই সপ্তস্বরপরিপূর্ণ ধ্বনি উঠিতে লাগিল। শীতল নৈদাঘ পবনে ধ্বনি আরোহণ করিয়া চলিল।

দিগ্‌গজ নিশ্বাস রহিত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। যখন বিমলা সমাপ্ত করিলেন, তখন গজপতি কহিলেন, "আবার।"

বি। আবার কি?

দি। আবার একটি গাও।

বি। কি গায়িব?

দি। একটি বাঙলা গাও।

"গায়িতেছি" বলিয়া বিমলা পুনর্ব্বার সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

গীত গায়িতে গায়িতে বিমলা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার অঞ্চলে বিষম টান পড়িয়াছে; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, গজপতি একেবারে তাঁহার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণপণে তাঁহার অঞ্চল ধরিয়াছেন। বিমলা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "কি হইয়াছে? আবার ভূত না কি?"

ব্রাহ্মণের বাক্য সরে না, কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, "ঐ।"

বিমলা নিস্তব্ধ হইয়া সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন প্রবল নিশ্বাসশব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, এবং নির্দ্দিষ্ট দিকে পথপার্শ্বে একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন।

সাহসে নির্ভর করিয়া নিকটে গিয়া বিমলা দেখিলেন, একটি সুগঠন সুসজ্জীভূত অশ্ব মৃত্যুযাতনায় পড়িয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

বিমলা পথ বাহন করিতে লাগিলেন। সুসজ্জীভূত সৈনিক অশ্ব পথিমধ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া তিনি চিন্তামগ্না হইলেন। অনেক ক্ষণ কথা কহিলেন না। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অতিবাহিত করিলে, গজপতি আবার তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিলেন।

বিমলা বলিলেন, "কি?"

গজপতি একটি দ্রব্য লইয়া দেখাইলেন। বিমলা দেখিয়া বলিলেন, "এ সিপাহির পাগ্‌ড়ি।" বিমলা পুনর্ব্বার চিন্তায় মগ্না হইলেন, আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "যারই ঘোড়া, তারই পাগ্‌ড়ি? না, এ ত পদাতিকের পাগ্‌ড়ি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। বিমলা অধিকতর অন্যমনা হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে গজপতি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি, আর কথা কহ না যে?"

বিমলা কহিলেন, "পথে কিছু চিহ্ন দেখিতেছ?"

গজপতি বিশেষ মনোযোগের সহিত পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া কহিলেন, "দেখিতেছি, অনেক ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন।"

বি। বুদ্ধিমান্—কিছু বুঝিতে পারিলে?

দি। না।

বি। ওখানে মরা ঘোড়া, সেখানে সিপাহির পাগ্‌ড়ি, এখানে এত ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন, এতে কিছু বুঝিতে পারিলে না?—কারেই বা বলি!

দি। কি?

বি। এখনই বহুতর সেনা এই পথে গিয়াছে।

গজপতি ভীত হইয়া কহিলেন, "তবে একটু আস্তে হাঁট; তারা খুব আগু হইয়া যাক।"

বিমলা হাস্য করিয়া বলিলেন, "মূর্খ! তাহারা আগু হইবে কি? কোন্ দিকে ঘোড়ার খুরের সম্মুখ, দেখিতেছ না? এ সেনা গড় মান্দারণে গিয়াছে" বলিয়া বিমলা বিমর্ষ হইয়া রহিলেন।

অচিরাৎ শৈলেশ্বরের মন্দিরের ধবল শ্রী নিকটে দেখিতে পাইলেন। বিমলা ভাবিলেন যে, রাজপুত্রের সহিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন নাই; বরং তাহাতে অনিষ্ট আছে। অতএব কি প্রকারে তাহাকে বিদায় দিবেন, চিন্তা করিতেছিলেন। গজপতি নিজেই তাহার সূচনা করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার বিমলার পৃষ্ঠের নিকট আসিয়া অঞ্চল ধরিয়াছেন; বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"

ব্রাহ্মণ অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "সে কত দূর?"

বি। কি কত দূর?

দি। সেই বটগাছ?

বি। কোন্ বটগাছ?

দি। যেখানে তোমরা সে দিন দেখেছিলে?

বি। কি দেখেছিলাম?

দি। রাত্রিকালে নাম করিতে নাই।

বিমলা বুঝিতে পারিয়া সুযোগ পাইলেন।

গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ইঃ!"

ব্রাহ্মণ অধিকতর ভীত হইয়া কহিলেন, "কি গা?"

বিমলা অস্ফুট স্বরে শৈলেশ্বরনিকটস্থ বটবৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "সে ঐ বটতলা।"

দিগ্‌গজ আর নড়িলেন না; গতিশক্তিরহিত, অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন।

বিমলা বলিলেন, "আইস।"

ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "আমি আর যাইতে পারিব না।"

বিমলা কহিলেন, "আমারও ভয় করিতেছে।"

ব্রাহ্মণ এই শুনিয়া পা ফিরাইয়া পলায়নোদ্যত হইলেন।

বিমলা বৃক্ষপানে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, বৃক্ষমূলে একটা ধবলাকার কি পদার্থ রহিয়াছে। তিনি জানিতেন যে, বৃক্ষমূলে শৈলেশ্বরের ষাঁড় শুইয়া থাকে; কিন্তু গজপতিকে কহিলেন, "গজপতি! ইষ্টদেবের নাম জপ; বৃক্ষমূলে কি দেখিতেছ?"

"ও গো—বাবা গো—" বলিয়াই দিগ্‌গজ একেবারে চম্পট। দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ—তিলার্দ্ধ মধ্যে অর্দ্ধ ক্রোশ পার হইয়া গেলেন।

বিমলা গজপতির স্বভাব জানিতেন; অতএব বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি একেবারে দুর্গ-দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইবেন।

বিমলা তখন নিশ্চিন্ত হইয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

বিমলা সকল দিক্ ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, কেবল এক দিক্ ভাবিয়া আইসেন নাই; রাজপুত্র মন্দিরে আসিয়াছেন কি? মনে এইরূপ সন্দেহ জন্মিলে বিমলার বিষম ক্লেশ হইল। মনে করিয়া দেখিলেন যে, রাজপুত্র আসার নিশ্চিত কথা কিছুই বলেন নাই; কেবল বলিয়াছিলেন যে, "এইখানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে, এখানে না দেখা পাও, তবে সাক্ষাৎ হইল না।" তবে ত না আসারও সম্ভাবনা।

যদি না আসিয়া থাকেন, তবে এত ক্লেশ বৃথা হইল। বিমলা বিষণ্ণ হইয়া আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "এ কথা আগে কেন ভাবি নাই? ব্রাহ্মণকেই বা কেন তাড়াইলাম? একাকিনী এ রাত্রে কি প্রকারে ফিরিয়া যাইব! শৈলেশ্বর! তোমার ইচ্ছা।"

বটবৃক্ষতল দিয়া শৈলেশ্বর-মন্দিরে উঠিতে হয়। বিমলা বৃক্ষতল দিয়া যাইতে দেখিলেন যে, তথায় ষণ্ড নাই; বৃক্ষমূলে যে ধবল পদার্থ দেখিয়াছিলেন, তাহা আর তথায় নাই। বিমলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন; ষণ্ড কোথাও উঠিয়া গেলে প্রান্তরমধ্যে দেখা যাইত।

বিমলা বৃক্ষমূলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলেন; বোধ হইল, যেন বৃক্ষের পশ্চাদ্দিকস্থ কোন মনুষ্যের ধবল পরিচ্ছদের অংশমাত্র দেখিতে পাইলেন, সাতিশয় চঞ্চলপদে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন; সবলে কবাট করতাড়িত করিলেন।

কবাট বন্ধ। ভিতর হইতে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল, "কে?"

শূন্য মন্দিরমধ্য হইতে গম্ভীর স্বরে প্রতিধ্বনি হইল, "কে?"

বিমলা প্রাণপণে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "পথ-শ্রান্ত স্ত্রীলোক।"

কবাট মুক্ত হইল।

দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে কৃপাণকোষ-হস্তে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান। বিমলা দেখিয়া চিনিলেন, কুমার জগৎসিংহ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ

বিমলা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বসিয়া একটু স্থির হইলেন। পরে নতভাবে শৈলেশ্বরকে প্রণাম করিয়া যুবরাজকে প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন, কে কি বলিয়া আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবেন? উভয়েরই সঙ্কট। কি বলিয়া প্রথমে কথা কহিবেন?

বিমলা এ বিষয়ের সন্ধিবিগ্রহে পণ্ডিতা, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! আজ শৈলেশ্বরের অনুগ্রহে আপনার দর্শন পাইলাম, একাকিনী এ রাত্রে প্রান্তরমধ্যে আসিতে ভীতা হইয়াছিলাম, এক্ষণে মন্দিরমধ্যে আপনার দর্শনে সাহস পাইলাম।"

যুবরাজ কহিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল ত?"

বিমলার অভিপ্রায়, প্রথমে জানেন,—রাজকুমার যথার্থ তিলোত্তমাতে অনুরক্ত কি না, পশ্চাৎ অন্য কথা কহিবেন। এই ভাবিয়া বলিলেন, "যাহাতে মঙ্গল হয়, সেই প্রার্থনাতেই শৈলেশ্বরের পূজা করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বুঝিলাম, আপনার পূজাতেই শৈলেশ্বর পরিতৃপ্ত আছেন, আমার পূজা গ্রহণ করিবেন না, অনুমতি হয় ত প্রতিগমন করি।"

যুব। যাও। একাকিনী তোমার যাওয়া উচিত হয় না, আমি তোমাকে রাখিয়া আসি।

বিমলা দেখিলেন যে, রাজপুত্র যাবজ্জীবন কেবল অস্ত্রশিক্ষা করেন নাই। বিমলা উত্তর করিলেন, "একাকিনী যাওয়া অনুচিত কেন?"

যুব। পথে নানা ভীতি আছে।

বি। তবে আমি মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাইব।

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

বি। কেন? তাঁহার কাছে নালিশ আছে। তিনি যে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহা কর্তৃক আমাদিগের পথের ভয় দূর হয় না। তিনি শত্রুনিপাতে অক্ষম।

রাজপুত্র সহাস্যে উত্তর করিলেন, "সেনাপতি উত্তর করিবেন যে, শত্রুনিপাত দেবের অসাধ্য, মনুষ্য কোন্ ছার! উদাহরণ, স্বয়ং মহাদেব তপোবনে মন্মথ শত্রুকে ভস্মরাশি

করিয়াছিলেন ; অদ্য পক্ষমাত্র হইল, সেই মন্মথ তাঁহার এই মন্দিরমধ্যেই বড় দৌরাত্ম্য করিয়াছে।"

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "এত দৌরাত্ম্য কাহার প্রতি হইয়াছে ?"

যুবরাজ কহিলেন, "সেনাপতির প্রতিই হইয়াছে।"

বিমলা কহিলেন, "মহারাজ এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিবেন কেন ?"

যুব। আমার সাক্ষী আছে।

বি। মহাশয়, এমন সাক্ষী কে ?

যুব। সুচরিত্রে—

রাজপুত্রের বাক্য শেষ না হইতে হইতে বিমলা কহিলেন, "দাসী অতি কুচরিত্রা। আমাকে বিমলা বলিয়া ডাকিবেন।"

রাজপুত্র বলিলেন, "বিমলাই তাহার সাক্ষী।"

বি। বিমলা এমত সাক্ষ্য দিবে না।

যুব। সম্ভব বটে ; যে ব্যক্তি পক্ষমধ্যে আত্মপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃতা হয়, সে কি সত্য সাক্ষ্য দিয়া থাকে ?

বি। মহাশয়! কি প্রতিশ্রুত ছিলাম, স্মরণ করিয়া দিন।

যুব। তোমার সখীর পরিচয়।

বিমলা সহসা ব্যঙ্গপ্রিয়তা ত্যাগ করিলেন ; গম্ভীরভাবে কহিলেন, "যুবরাজ! পরিচয় দিতে সঙ্কোচ হয়। পরিচয় পাইয়া আপনি যদি অসুখী হন ?"

রাজপুত্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন ; তাঁহারও ব্যঙ্গাসক্ত ভাব দূর হইল ; চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বিমলে! যথার্থ পরিচয়ে কি আমার অসুখের কোন কারণ আছে ?"

বিমলা কহিলেন, "আছে।"

রাজপুত্র পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন ; ক্ষণ পরে কহিলেন, "যাহাই হউক, তুমি আমার মানস সফল কর ; আমি যে অসহ্য উৎকণ্ঠা সহ্য করিতেছি, তাহার অপেক্ষা আর কিছুই অধিক অসুখের হইতে পারে না। তুমি যে শঙ্কা করিতেছ, যদি তাহা সত্য হয়, তবে সেও এ যন্ত্রণার অপেক্ষা ভাল ; অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিবার একটা কথা পাই। বিমলে! আমি কেবল কৌতূহলী হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই ; কৌতূহলী হইবার আমার এক্ষণে অবকাশ নাই, অদ্য মাসার্দ্ধমধ্যে অশ্বপৃষ্ঠ ব্যতীত অন্য শয্যায় বিশ্রাম করি নাই। আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে বলিয়াই আসিয়াছি।"

বিমলা এই কথা শুনিবার জন্যই এত উদ্যম করিতেছিলেন। আরও কিছু শুনিবার জন্য কহিলেন, "যুবরাজ! আপনি রাজনীতিতে বিচক্ষণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ

যুদ্ধকালে কি আপনার দুষ্প্রাপ্য রমণীতে মনোনিবেশ করা উচিত? উভয়ের মঙ্গল হেতু বলিতেছি, আপনি আমার সখীকে বিস্মৃত হইতে যত্ন করুন; যুদ্ধের উৎসাহে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন।"

যুবরাজের অধরে মনস্তাপ-ব্যঞ্জক হাস্য প্রকটিত হইল; তিনি কহিলেন, "কাহাকে বিস্মৃত হইব? তোমার সখীর রূপ একবার দর্শনেই আমার হৃদয়মধ্যে গম্ভীরতর অঙ্কিত হইয়াছে, এ হৃদয় দগ্ধ না হইলে তাহা আর মিলায় না। লোকে আমার হৃদয় পাষাণ বলিয়া থাকে, পাষাণে যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, পাষাণ নষ্ট না হইলে তাহা আর মিলায় না। যুদ্ধের কথা কি বলিতেছ, বিমলে! আমি তোমার সখীকে দেখিয়া অবধি কেবল যুদ্ধেই নিযুক্ত আছি। কি রণক্ষেত্রে—কি শিবিরে, এক পল সে মুখ ভুলিতে পারি নাই; যখন মস্তকচ্ছেদ করিতে পাঠান খড়্গ তুলিয়াছে, তখন মরিলে সে মুখ যে আর দেখিতে পাইব না, একবার ভিন্ন আর দেখা হইল না, সেই কথাই আগে মনে পড়িয়াছে। বিমলে! কোথা গেলে তোমার সখীকে দেখিতে পাইব?"

বিমলা আর শুনিয়া কি করিবেন! বলিলেন, "গড় মান্দারণে আমার সখীর দেখা পাইবেন। তিলোত্তমা সুন্দরী বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

জগৎসিংহের বোধ হইল, যেন তাঁহাকে কালসর্প দংশন করিল। তরবারে ভর করিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমারই কথা সত্য হইল। তিলোত্তমা আমার হইবে না। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলাম; শত্রুরক্তে আমার সুখাভিলাষ বিসর্জ্জন দিব।"

বিমলা রাজপুত্রের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! স্নেহের যদি পুরস্কার থাকিত, তবে আপনি তিলোত্তমা লাভ করিবার যোগ্য। একেবারেই বা কেন নিরাশ হন? আজ বিধি বৈর, কাল বিধি সদয় হইতে পারেন।"

আশা মধুরভাষিণী। অতি দুর্দ্দিনে মনুষ্য-শ্রবণে মৃদু মৃদু কহিয়া থাকে, "মেঘ ঝড় চিরস্থায়ী নহে, কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।" বিমলার মুখে আশা কথা কহিল, "কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।"

জগৎসিংহ আশার কথা শুনিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা কে বলিতে পারে? বিধাতার লিপি কে অগ্রে পাঠ করিতে পারে? এ সংসারে অঘটনীয় কি আছে? এ সংসারে কোন্ অঘটনীয় ঘটনা না ঘটিয়াছে?

রাজপুত্র আশার কথা শুনিলেন।

কহিলেন, "যাহাই হউক, অদ্য আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা অদৃষ্টে থাকে পশ্চাৎ ঘটিবে; বিধাতার লিপি কে

খণ্ডাইবে ? এখন কেবল আমার মন ব্যক্ত করিয়া কহিতে পারি। এই শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ সত্য করিতেছি যে, তিলোত্তমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তুমি আমার সকল কথা তোমার সখীর সাক্ষাতে কহিও ; আর কহিও যে, আমি কেবল একবারমাত্র তাঁহার দর্শনের ভিখারী, দ্বিতীয়বার আর এ ভিক্ষা করিব না, স্বীকার করিতেছি।"

বিমলার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, "আমার সখীর প্রত্যুত্তর মহাশয় কি প্রকারে পাইবেন ?"

যুবরাজ কহিলেন, "তোমাকে বারংবার ক্লেশ দিতে পারি না, কিন্তু যদি তুমি পুনর্ব্বার এই মন্দিরে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর, তবে তোমার নিকট বিক্রীত থাকিব। জগৎসিংহ হইতে কখন না কখন প্রত্যুপকার হইতে পারিবে।"

বিমলা কহিলেন, "যুবরাজ! আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ; কিন্তু একাকিনী রাত্রে এ পথে আসিতে অত্যন্ত ভয় পাই, অঙ্গীকার পালন না করিলেই নয়, এজন্যই আজ আসিয়াছি। এক্ষণে এ প্রদেশ শত্রুব্যস্ত হইয়াছে ; পুনর্ব্বার আসিতে বড় ভয় পাইব।"

রাজপুত্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তুমি যদি হানি বিবেচনা না কর, তবে আমি তোমার সহিত গড় মান্দারণে যাই। আমি তথায় উপযুক্ত স্থানে অপেক্ষা করিব, তুমি আমাকে সংবাদ আনিয়া দিও।"

বিমলা হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "তবে চলুন।"

উভয়ে মন্দির হইতে নির্গত হইতে যান, এমন সময়ে মন্দিরের বাহিরে সাবধান-ন্যস্ত মনুষ্য-পদ-বিক্ষেপের শব্দ হইল। রাজপুত্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া, বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কেহ সমভিব্যাহারী আছে ?"

বিমলা কহিলেন, "না।"

"তবে কার পদধ্বনি হইল ? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কেহ অন্তরাল হইতে আমাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছে।"

এই বলিয়া রাজপুত্র বাহিরে আসিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বীরপঞ্চমী

উভয়ে শৈলেশ্বর প্রণাম করিয়া, সশঙ্কচিত্তে গড় মান্দারণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিঞ্চিৎ নীরবে গেলেন। কিছু দূর গিয়া রাজকুমার প্রথমে কথা কহিলেন, "বিমলে, আমার এক বিষয়ে কৌতূহল আছে। তুমি শুনিয়া কি বলিবে বলিতে পারি না।"

বিমলা কহিলেন, "কি?"

জ। আমার মনে প্রতীতি জন্মিয়াছে, তুমি কদাপি পরিচারিকা নও।

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এ সন্দেহ আপনার মনে কেন জন্মিল?"

জ। বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা যে অম্বরপতির পুত্রবধূ হইতে পারেন না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সে অতি গুহ্য বৃত্তান্ত; তুমি পরিচারিকা হইলে সে গুহ্য কাহিনী কি প্রকারে জানিবে?

বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিঞ্চিৎ কাতর স্বরে কহিলেন, "আপনি যথার্থ অনুভব করিয়াছেন; আমি পরিচারিকা নহি। অদৃষ্টক্রমে পরিচারিকার ন্যায় আছি। অদৃষ্টকেই বা কেন দোষি? আমার অদৃষ্ট মন্দ নহে!"

রাজকুমার বুঝিলেন যে, এই কথায় বিমলার মনোমধ্যে পরিতাপ উদয় হইয়াছে; অতএব তৎসম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না। বিমলা স্বতঃ কহিলেন, "যুবরাজ, আপনার নিকট পরিচয় দিব; কিন্তু এক্ষণে নয়। ও কি শব্দ? পশ্চাৎ কেহ আসিতেছে?"

এই সময়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনুষ্যের পদধ্বনি স্পষ্ট শ্রুত হইল। এমন বোধ হইল, যেন দুই জন মনুষ্য কাণে কাণে কথা কহিতেছে। তখন মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অতিক্রম হইয়াছিল। রাজপুত্র কহিলেন, "আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে, আমি দেখিয়া আসি।"

এই বলিয়া রাজপুত্র কিছু পথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন এবং পথের পার্শ্বেও অনুসন্ধান করিলেন; কোথাও মনুষ্য দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যাগমন করিয়া বিমলাকে কহিলেন, "আমার সন্দেহ হইতেছে, কেহ আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে। সাবধানে কথা কহা ভাল।"

এখন উভয়ে অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে কহিতে চলিলেন। ক্রমে গড় মান্দারণ গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুর্গসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এক্ষণে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবে কি প্রকারে? এত রাত্রে অবশ্য ফটক বন্ধ হইয়া থাকিবে।"

বিমলা কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আমি তাহার উপায় স্থির করিয়াই বাটী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম।"

রাজপুত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "লুকান পথ আছে?"

বিমলাও হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "যেখানে চোর, সেইখানেই সিঁধ।"

ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার রাজপুত্র কহিলেন, "বিমলা, এক্ষণে আর আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি দুর্গপার্শ্বস্থ এই আম্রকানন মধ্যে তোমার অপেক্ষা করিব, তুমি আমার হইয়া অকপটে তোমার সখীকে মিনতি করিও; পক্ষ পরে হয়, মাস পরে হয়, আর একবার আমি তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব।"

বিমলা কহিলেন, "এ আম্রকাননও নির্জ্জন স্থান নহে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

জ। কত দূর যাইব?

বি। দুর্গমধ্যে চলুন।

রাজকুমার কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন, "বিমলা, এ উচিত হয় না। দুর্গ-স্বামীর অনুমতি ব্যতীত আমি দুর্গমধ্যে যাইব না।"

বিমলা কহিলেন, "চিন্তা কি?"

রাজকুমার গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "রাজপুত্রেরা কোন স্থানে যাইতে চিন্তা করে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, অম্বরপতির পুত্রের কি উচিত যে, দুর্গ-স্বামীর অজ্ঞাতে চোরের ন্যায় দুর্গপ্রবেশ করে?"

বিমলা কহিলেন, "আমি আপনাকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছি।"

রাজকুমার কহিলেন, "মনে করিও না যে, আমি তোমাকে পরিচারিকা জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু বল দেখি, দুর্গমধ্যে আমাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইবার তোমার কি অধিকার?"

বিমলাও ক্ষণেক কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার কি অধিকার, তাহা না শুনিলে আপনি যাইবেন না?"

উত্তর—"কদাপি যাইব না।"

বিমলা তখন রাজপুত্রের কর্ণে লোল হইয়া একটি কথা বলিলেন।

রাজপুত্র কহিলেন, "চলুন।"

বিমলা কহিলেন, "যুবরাজ, আমি দাসী, দাসীকে 'চল' বলিবেন।"

যুবরাজ বলিলেন, "তাই হউক।"

যে রাজপথ অতিবাহিত করিয়া বিমলা যুবরাজকে লইয়া যাইতেছিলেন, সে পথে দুর্গদ্বারে যাইতে হয়। দুর্গের পার্শ্বে আম্রকানন; সিংহদ্বার হইতে কানন অদৃশ্য। ঐ পথ হইতে যথা আমোদর অন্তঃপুরপশ্চাৎ প্রবাহিত আছে, সে দিকে যাইতে হইলে এই আম্রকাননমধ্য দিয়া যাইতে হয়। বিমলা এক্ষণে রাজবর্ত্ম ত্যাগ করিয়া রাজপুত্রসঙ্গে এই আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন।

আম্রকানন প্রবেশাবধি, উভয়ে পুনর্ব্বার সেইরূপ শুষ্কপর্ণভঙ্গ সহিত মনুষ্য-পদ-ধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন।

বিমলা কহিলেন, "আবার!"

রাজপুত্র কহিলেন, "তুমি পুনরপি ক্ষণেক দাঁড়াও, আমি দেখিয়া আসি।"

রাজপুত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে গেলেন; কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলেন না। আম্রকাননতলে নানা প্রকার আরণ্য লতাদির সমৃদ্ধিতে এমন বন হইয়াছিল এবং বৃক্ষাদির ছায়াতে রাত্রে কাননমধ্যে এমন অন্ধকার হইয়াছিল যে, রাজপুত্র যেখানে যান, তাহার অগ্রে অধিক দূর দেখিতে পান না। রাজপুত্র এমনও বিবেচনা করিলেন যে, পশুর পদচারণে শুষ্কপত্রভঙ্গশব্দ শুনিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক, সন্দেহ নিঃশেষ করা উচিত বিবেচনা করিয়া, রাজকুমার অসিহস্তে আম্রবৃক্ষের উপর উঠিলেন। বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, দেখিতে পাইলেন যে, এক বৃহৎ আম্রবৃক্ষের তিমিরাবৃত শাখাসমষ্টিমধ্যে দুই জন মনুষ্য বসিয়া আছে; তাহাদিগের উষ্ণীষে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়াছে, কেবল তাহাই দেখা যাইতেছিল; অবয়ব ছায়ায় লুক্কায়িত ছিল। রাজপুত্র উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, উষ্ণীষমস্তকে মনুষ্য বটে, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি উত্তমরূপে বৃক্ষটি লক্ষিত করিয়া রাখিলেন যে, পুনরায় আসিলে না ভ্রম হয়। পরে ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে বিমলার নিকট আসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহা বিমলার নিকট বর্ণন করিয়া কহিলেন, "এ সময়ে যদি দুইটা বর্শা থাকিত!"

বিমলা কহিলেন, "বর্শা লইয়া কি করিবেন?"

জ। তাহা হইলে ইহারা কে, জানিতে পারিতাম; লক্ষণ ভাল বোধ হইতেছে না। উষ্ণীষ দেখিয়া বোধ হইতেছে, দুরাত্মা পাঠানেরা কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আমাদের সঙ্গ লইয়াছে।

তৎক্ষণাৎ বিমলার পথপার্শ্বস্থ মৃত অশ্ব, উষ্ণীষ আর অশ্বসৈন্যের পদচিহ্ন স্মরণ হইল। তিনি কহিলেন, "আপনি তবে এখানে অপেক্ষা করুন; আমি পলকমধ্যে দুর্গ হইতে বর্শা আনিতেছি।"

এই বলিয়া বিমলা ঝটিতি দুর্গমূলে গেলেন। যে কক্ষে বসিয়া সেই রাত্রি প্রদোষে বেশবিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহার নীচের কক্ষের একটি গবাক্ষ আম্রকাননের দিকে ছিল। বিমলা অঞ্চল হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া ঐ কলে ফিরাইলেন; পশ্চাৎ জানালার গরাদে ধরিয়া দেয়ালের দিকে টান দিলেন; শিল্পকৌশলের গুণে জানালার কবাট, চৌকাঠ, গরাদে সকল সমেত দেয়ালের মধ্যে এক রন্ধ্রে প্রবেশ করিল, বিমলার কক্ষমধ্যে প্রবেশ জন্য পথ মুক্ত হইল। বিমলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেয়ালের মধ্য হইতে জানালার চৌকাঠ ধরিয়া টানিলেন; জানালা বাহির হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে স্থিত হইল; কবাটের ভিতর দিকে পূর্ব্ববৎ গা-চাবির কল ছিল, বিমলা অঞ্চলের চাবি লইয়া ঐ কলে লাগাইলেন। জানালা নিজ স্থানে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল, বাহির হইতে উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

বিমলা অতি দ্রুতপদে দুর্গের শেলেখানায় গেলেন। শেলেখানায় প্রহরীকে কহিলেন, "আমি তোমার নিকট যাহা চাহি, তুমি কাহারও সাক্ষাৎ বলিও না। আমাকে দুইটা বর্শা দাও—আবার আনিয়া দিব।"

প্রহরী চমৎকৃত হইল। কহিল, "মা, তুমি বর্শা লইয়া কি করিবে?"

প্রত্যুৎপন্নমতি বিমলা কহিলেন, "আজ আমার বীরপঞ্চমীর ব্রত, ব্রত করিলে বীর পুত্র হয়; তাহাতে রাত্রে অস্ত্র পূজা করিতে হয়; আমি পুত্র কামনা করি, কাহারও সাক্ষাৎ প্রকাশ করিও না।"

প্রহরীকে যেরূপ বুঝাইল, সেও সেইরূপ বুঝিল। দুর্গস্থ সকল ভৃত্য বিমলার আজ্ঞাকারী ছিল; সুতরাং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া দুইটা শাণিত বর্শা দিল।

বিমলা বর্শা লইয়া পূর্ব্ববেগে গবাক্ষের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ ভিতর হইতে জানালা খুলিলেন, এবং বর্শা সহিত নির্গত হইয়া জগৎসিংহের নিকট গেলেন।

ব্যস্ততা প্রযুক্তই হউক, বা নিকটেই থাকিবেন এবং তৎক্ষণেই প্রত্যাগমন করিবেন, এই বিশ্বাসজনিত নিশ্চিন্তভাব প্রযুক্তই হউক, বিমলা বহির্গমনকালে জালরন্ধ্রপথ পূর্ব্ববৎ অবরুদ্ধ করিয়া যান নাই। ইহাতে প্রমাদ ঘটনার এক কারণ উপস্থিত হইল। জানালার অতি নিকটে এক আম্রবৃক্ষ ছিল, তাহার অন্তরালে এক শস্ত্রধারী পুরুষ দণ্ডায়মান ছিল; সে বিমলার এই ভ্রম দেখিতে পাইল। বিমলা যতক্ষণ না দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন, ততক্ষণ শস্ত্রপাণি পুরুষ বৃক্ষের অন্তরালে রহিল; বিমলা দৃষ্টির অগোচর হইলেই সে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে শব্দশীল চর্ম্মপাদুকা ত্যাগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপে গবাক্ষসন্নিধানে আসিল। প্রথমে গবাক্ষের মুক্তপথে কক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল, কক্ষমধ্যে কেহ নাই দেখিয়া, নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। পরে সেই কক্ষের দ্বার দিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে রাজপুত্র বিমলার নিকট বর্শা পাইয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষারোহণ করিলেন, এবং পূর্ব্বলক্ষিত বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন ; দেখিলেন যে, এক্ষণে একটিমাত্র উষ্ণীষ দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তথায় নাই ; রাজপুত্র একটি বর্শা বাম করে রাখিয়া, দ্বিতীয় বর্শা দক্ষিণ করে গ্রহণপূর্ব্বক, বৃক্ষস্থ উষ্ণীষ লক্ষ্য করিলেন। পরে বিশাল বাহুবল সহযোগে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথমে বৃক্ষপল্লবের প্রবল মর্ম্মর শব্দ, তৎপরেই ভূতলে গুরু পদার্থের পতনশব্দ হইল ; উষ্ণীষ আর বৃক্ষে নাই। রাজপুত্র বুঝিলেন যে, তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে উষ্ণীষধারী বৃক্ষশাখাচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়াছে।

জগৎসিংহ দ্রুতগতি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, যথা আহত ব্যক্তি পতিত হইয়াছে, তথা গেলেন ; দেখিলেন যে, এক জন সৈনিক-বেশধারী সশস্ত্র মুসলমান মৃতবৎ পতিত হইয়া রহিয়াছে। বর্শা তাহার চক্ষুর পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়াছে।

রাজপুত্র মৃতবৎ দেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, একেবারে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বর্শা চক্ষুর পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়া তাহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির কবচমধ্যে একখানা পত্র ছিল ; তাহার অল্প ভাগ বাহির হইয়াছিল। জগৎসিংহ ঐ পত্র লইয়া জ্যোৎস্নায় আনিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

"কতলু খাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তিগণ এই লিপি দৃষ্টি মাত্র লিপিবাহকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

কতলু খাঁ।"

বিমলা কেবল শব্দ শুনিতেছিলেন মাত্র, সবিশেষ কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাজকুমার তাঁহার নিকটে আসিয়া সবিশেষ বিবৃত করিলেন। বিমলা শুনিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমি এত জানিলে কখন আপনাকে বর্শা আনিয়া দিতাম না। আমি মহাপাতকিনী, আজ যে কর্ম্ম করিলাম, বহুকালেও ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

যুবরাজ কহিলেন, "শত্রুবধে ক্ষোভ কি ? শত্রুবধ ধর্ম্মে আছে।"

বিমলা কহিলেন, "যোদ্ধায় এমত বিবেচনা করুক। আমরা স্ত্রীজাতি।"

ক্ষণপরে বিমলা কহিলেন, "রাজকুমার, আর বিলম্বে অনিষ্ট আছে। দুর্গে চলুন, আমি দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

উভয়ে দ্রুতগতি দুর্গমূলে আসিয়া প্রথমে বিমলা, পশ্চাৎ রাজপুত্র প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে রাজপুত্রের হৃৎকম্প ও পদকম্প হইল। শত সহস্র সেনার সমীপে যাঁহার মস্তকের একটি কেশও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই, তাঁহার এ সুখের আলয়ে প্রবেশ করিতে হৃৎকম্প কেন ?

বিমলা পূর্ব্ববৎ গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন; পরে রাজপুত্রকে নিজ শয়নাগারে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমি আসিতেছি, আপনাকে ক্ষণেক এই পালঙ্কের উপর বসিতে হইবেক। যদি অন্য চিন্তা না থাকে, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, ভগবানের আসন বটপত্র মাত্র।"

বিমলা প্রস্থান করিয়া ক্ষণপরেই নিকটস্থ কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, "যুবরাজ! এই দিকে আসিয়া একটা নিবেদন শুনুন।"

যুবরাজের হৃদয় আবার কাঁপে, তিনি পালঙ্ক হইতে উঠিয়া কক্ষান্তরমধ্যে বিমলার নিকট গেলেন।

বিমলা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের ন্যায় তথা হইতে সরিয়া গেলেন; যুবরাজ দেখিলেন, সুবাসিত কক্ষ; রজতপ্রদীপ জ্বলিতেছে; কক্ষপ্রান্তে অবগুণ্ঠনবতী রমণী,—সে তিলোত্তমা!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

চতুরে চতুরে

বিমলা আসিয়া নিজ কক্ষে পালঙ্কের উপর বসিলেন। বিমলার মুখ অতি হর্ষ-প্রফুল্ল; তিনি গতিকে মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছেন। কক্ষমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে; সম্মুখে মুকুর; বেশভূষা যেরূপ প্রদোষকালে ছিল, সেইরূপই রহিয়াছে; বিমলা দর্পণাভ্যন্তরে মুহূর্ত্তজন্য নিজ প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। প্রদোষকালে যেরূপ কুটিল-কেশবিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপ রহিয়াছে; বিশাল লোচনমূলে সেইরূপ কজ্জলপ্রভা; অধরে সেইরূপ তাম্বূলরাগ; সেইরূপ কর্ণাভরণ পীবরাংসসংসক্ত হইয়া দুলিতেছে। বিমলা উপাধানে পৃষ্ঠ রাখিয়া অর্দ্ধ শয়ন, অর্দ্ধ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; বিমলা মুকুরে নিজ-লাবণ্য দেখিয়া হাস্য করিলেন। বিমলা এই ভাবিয়া হাসিলেন যে, দিগ্গজ পণ্ডিত নিতান্ত নিষ্কারণে গৃহত্যাগী হইতে চাহেন নাই।

বিমলা জগৎসিংহের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, এমত সময়ে আম্রকানন-মধ্যে গম্ভীর তূর্য্যনিনাদ হইল। বিমলা চমকিয়া উঠিলেন এবং ভীতা হইলেন; সিংহদ্বার ব্যতীত আম্রকাননে কখনই তূর্য্যধ্বনি হইয়া থাকে না, এত রাত্রেই বা তূর্য্যধ্বনি কেন হয়? বিশেষ সেই রাত্রে মন্দিরে গমনকালে ও প্রত্যাগমনকালে যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমুদয় স্মরণ হইল। বিমলার তৎক্ষণাৎ বিবেচনা হইল, এ তূর্য্যধ্বনি কোন অমঙ্গল ঘটনার পূর্ব্বলক্ষণ। অতএব সশঙ্কচিত্তে তিনি বাতায়ন-সন্নিধানে গিয়া আম্রকানন প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কাননমধ্যে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বিমলা

ব্যস্তচিত্তে নিজ কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন ; যে শ্রেণীতে তাঁহার কক্ষ, তৎপরেই প্রাঙ্গণ ; প্রাঙ্গণ পরেই আর এক কক্ষশ্রেণী ; সেই শ্রেণীতে প্রাসাদোপরি উঠিবার সোপান আছে। বিমলা কক্ষত্যাগপূর্ব্বক সেই সোপানবলী আরোহণ করিয়া ছাদের উপর উঠিলেন ; ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; তথাপি কাননের গভীর ছায়ান্ধকার জন্য কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা দ্বিগুণ উদ্বিগ্নচিত্তে ছাদের আলিসার নিকটে গেলেন ; তদুপরি বক্ষঃ স্থাপনপূর্ব্বক মুখ নত করিয়া দুর্গমূল পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিলেন ; কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্যামোজ্জ্বল শাখা পল্লব সকল স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত ; কখন কখন সুমন্দ পবনান্দোলনে পিঙ্গলবর্ণ দেখাইতেছিল ; কাননতলে ঘোরান্ধকার, কোথাও কোথাও শাখাপত্রাদি বিচ্ছেদে চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে ; আমোদেরের স্থিরাম্বু-মধ্যে নীলাম্বর, চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিম্বিত ; দূরে, অপরপারস্থিত অট্টালিকাসকলের গগনস্পর্শী মূর্ত্তি, কোথাও বা তৎপ্রাসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা বিষণ্ণ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে তাঁহার অকস্মাৎ বোধ হইল, যেন কেহ পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিল। বিমলা চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, এক জন সশস্ত্র অজ্ঞাত পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিমলা চিত্রার্পিত পুত্তলীবৎ নিস্পন্দ হইলেন।

শস্ত্রধারী কহিল, "চীৎকার করিও না। সুন্দরীর মুখে চীৎকার ভাল শুনায় না।"

যে ব্যক্তি অকস্মাৎ এইরূপ বিমলাকে বিহ্বল করিল, তাহার পরিচ্ছদ পাঠানজাতীয় সৈনিক পুরুষদিগের ন্যায়। পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও মহার্ঘ গুণ দেখিয়া অনায়াসে প্রতীতি হইতে পারিত, এ ব্যক্তি কোন মহৎপদাভিষিক্ত। অদ্যাপি তাহার বয়স ত্রিংশতের অধিক হয় নাই ; কান্তি সাতিশয় শ্রীমান্, তাঁহার প্রশস্ত ললাটোপরি যে উষ্ণীষ সংস্থাপিত ছিল, তাহাতে এক খণ্ড মহার্ঘ হীরক শোভিত ছিল। বিমলার যদি তৎক্ষণে মনের স্থিরতা থাকিত, তবে বুঝিতে পারিতেন যে, স্বয়ং জগৎসিংহের সহিত তুলনায় এ ব্যক্তি নিতান্ত ন্যূন হইবেন না ; জগৎসিংহের সদৃশ দীর্ঘায়ত বা বিশালোরস্ক নহেন, কিন্তু তৎসদৃশ বীরত্বব্যঞ্জক সুন্দরকান্তি ; তদধিক সুকুমার দেহ। তাঁহার বহুমূল্য কটিবন্ধে প্রবালজড়িত কোষমধ্যে দামাস্ক ছুরিকা ছিল ; হস্তে নিষ্কোষিত তরবার। অন্য প্রহরণ ছিল না।

সৈনিক পুরুষ কহিলেন, "চীৎকার করিও না। চীৎকার করিলে তোমার বিপদ ঘটিবে।"

প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিশালিনী বিমলা ক্ষণকাল মাত্র বিহ্বলা ছিলেন ; শস্ত্রধারীর দ্বিরুক্তিতে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। বিমলার পশ্চাতেই ছাদের শেষ, সম্মুখে সশস্ত্র

যোদ্ধা ; ছাদ হইতে বিমলাকে নীচে ফেলিয়া দেওয়াও কঠিন নহে। বুঝিয়া সুবুদ্ধি বিমলা কহিলেন, "কে তুমি ?"

সৈনিক কহিলেন, "আমার পরিচয়ে তোমার কি হইবে ?"

বিমলা কহিলেন, "তুমি কি জন্য এ দুর্গমধ্যে আসিয়াছ ? চোরেরা শূলে যায়, তুমি কি শোন নাই ?"

সৈনিক। সুন্দরি! আমি চোর নই।

বি। তুমি কি প্রকারে দুর্গমধ্যে আসিলে ?

সৈ। তোমারই অনুকম্পায়। তুমি যখন জানালা খুলিয়া রাখিয়াছিলে, তখন প্রবেশ করিয়াছিলাম ; তোমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ ছাদে আসিয়াছি।

বিমলা কপালে করাঘাত করিলেন। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

সৈনিক কহিল, "তোমার নিকট এক্ষণে পরিচয় দিলেই বা হানি কি ? আমি পাঠান।"

বি। এ ত পরিচয় হইল না ; জানিলাম যে, জাতিতে পাঠান,—কে তুমি ?

সৈ। ঈশ্বরেচ্ছায় এ দীনের নাম ওস্‌মান খাঁ।

বি। ওস্‌মান খাঁ কে, আমি চিনি না !

সৈ। ওস্‌মান খাঁ, কতলু খাঁর সেনাপতি।

বিমলার শরীর কম্পান্বিত হইতে লাগিল। ইচ্ছা—কোনরূপে পলায়ন করিয়া বীরেন্দ্রসিংহকে সংবাদ করেন ; কিন্তু তাহার কিছুমাত্র উপায় ছিল না। সম্মুখে সেনাপতি গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। অনন্যগতি হইয়া বিমলা এই বিবেচনা করিলেন যে, এক্ষণে সেনাপতিকে যতক্ষণ কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত রাখিতে পারেন, ততক্ষণ অবকাশ। পশ্চাৎ দুর্গপ্রাসাদস্থ কোন প্রহরী সে দিকে আসিলেও আসিতে পারে, অতএব পুনরপি কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, "আপনি কেন এ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ?"

ওস্‌মান খাঁ উত্তর করিলেন, "আমরা বীরেন্দ্রসিংহকে অনুনয় করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি কহিয়াছেন যে, তোমরা পার, সসৈন্য দুর্গে আসিও।"

বিমলা কহিলেন, "বুঝিলাম, দুর্গাধিপতি আপনাদিগের সহিত মৈত্র না করিয়া, মোগলের পক্ষ হইয়াছে বলিয়া আপনি দুর্গ অধিকার করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আপনি একক দেখিতেছি ?"

ওস্। আপাততঃ আমি একক।

বিমলা কহিলেন, "সেই জন্যই বোধ করি, শঙ্কা প্রযুক্ত আমাকে যাইতে দিতেছেন না।"

ভীরুতা অপবাদে পাঠান সেনাপতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহার গতি মুক্ত করিয়া সাহস প্রকাশ করিলেও করিতে পারেন, এই দুরাশাতেই বিমলা এই কথা বলিলেন।

ওস্মান খাঁ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার নিকট কেবল তোমার কটাক্ষকে শঙ্কা করিতে হয়, আমার সে শঙ্কাও বড় নাই। তোমার নিকট ভিক্ষা আছে।"

বিমলা কৌতূহলিনী হইয়া ওস্মান খাঁর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। ওস্মান খাঁ কহিলেন, "তোমার ওড়নার অঞ্চলে যে জানালার চাবি আছে, তাহা আমাকে দান করিয়া বাধিত কর। তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া অবমাননা করিতে সঙ্কোচ করি।"

গবাক্ষের চাবি যে, সেনাপতির অভীষ্টসিদ্ধি পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝিতে বিমলার ন্যায় চতুরার অধিককাল অপেক্ষা করে না। বুঝিতে পারিয়া বিমলা দেখিলেন, ইহার উপায় নাই। যে বলে লইতে পারে, তাহার যাচ্ঞা করা ব্যঙ্গ করা মাত্র। চাবি না দিলে সেনাপতি এখনই বলে লইবেক। অপর কেহ তৎক্ষণাৎ চাবি ফেলিয়া দিত সন্দেহ নাই; কিন্তু চতুরা বিমলা কহিলেন, "মহাশয়! আমি ইচ্ছাক্রমে চাবি না দিলে আপনি কি প্রকারে লইবেন?"

এই বলিতে বলিতে বিমলা অঙ্গ হইতে ওড়না খুলিয়া হস্তে লইলেন। ওস্মানের চক্ষু ওড়নার দিকে; তিনি উত্তর করিলেন, "ইচ্ছাক্রমে না দিলে তোমার অঙ্গ-স্পর্শ-সুখ লাভ করিব।"

"করুন," বলিয়া বিমলা হস্তস্থিত বস্ত্র আম্রকাননে নিক্ষেপ করিলেন। ওস্মানের চক্ষু ওড়নার প্রতি ছিল; যেই বিমলা নিক্ষেপ করিয়াছেন, ওস্মান অমনি সঙ্গে সঙ্গে হস্ত প্রসারণ করিয়া উড্ডীয়মান বস্ত্র ধরিলেন।

ওস্মান খাঁ ওড়না হস্তগত করিয়া এক হস্তে বিমলার হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিলেন, দন্ত দ্বারা ওড়না ধরিয়া দ্বিতীয় হস্তে চাবি খুলিয়া নিজ কটিবন্ধে রাখিলেন। পরে যাহা করিলেন, তাহাতে বিমলার মুখ শুকাইল। ওস্মান বিমলাকে এক শত সেলাম করিয়া যোড়হাতে বলিলেন, "মাফ করিবেন"। এই বলিয়া ওড়না লইয়া তদ্দ্বারা বিমলার দুই হস্ত আলিসার সহিত দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। বিমলা কহিলেন, "এ কি?"

ওস্মান কহিলেন, "প্রেমের ফাঁস।"

বি। এ দুষ্কর্ম্মের ফল আপনি অচিরাৎ পাইবেন!

ওস্মান বিমলাকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বিমলা চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু ফলোদয় হইল না। কেহ শুনিতে পাইল না।

ওস্মান পূর্ব্বপথে অবতরণ করিয়া পুনর্ব্বার বিমলার কক্ষের নীচের কক্ষে গেলেন। তথায় বিমলার ন্যায় জানালার চাবি ফিরাইয়া জানালা দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া

দিলেন। পথ মুক্ত হইলে ওস্‌মান মৃদু মৃদু শিশ্‌ দিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণমাত্রেই বৃক্ষান্তরাল হইতে এক জন পাদুকাশূন্য যোদ্ধা গবাক্ষ নিকটে আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সে ব্যক্তি প্রবেশ করিলে অপর এক ব্যক্তি আসিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক পাঠান সেনা নিঃশব্দে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। শেষে যে ব্যক্তি গবাক্ষ নিকটে আসিল, ওস্‌মান তাহাকে কহিলেন, "আর না, তোমরা বাহিরে থাক; আমার পূর্ব্বকথিত সঙ্কেতধ্বনি শুনিলে তোমরা বাহির হইতে দুর্গ আক্রমণ করিও; এই কথা তুমি তাজ খাঁকে বলিও।"

সে ব্যক্তি ফিরিয়া গেল। ওস্‌মান লব্ধপ্রবেশ সেনা লইয়া পুনরপি নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে প্রাসাদারোহণ করিলেন; যে ছাদে বিমলা বন্ধন-দশায় বসিয়া আছেন, সেই ছাদ দিয়া গমনকালে কহিলেন, "এই স্ত্রীলোকটি বড় বুদ্ধিমতী; ইহাকে কদাপি বিশ্বাস নাই; রহিম শেখ! তুমি ইহার নিকট প্রহরী থাক; যদি পলায়নের চেষ্টা বা কাহারও সহিত কথা কহিতে উদ্যোগ করে, কি উচ্চ কথা কয়, তবে স্ত্রীবধে ঘৃণা করিও না।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া রহিম তথায় প্রহরী রহিল। পাঠান সেনা ছাদে ছাদে দুর্গের অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমিকে প্রেমিকে

বিমলা যখন দেখিলেন যে, চতুর ওস্‌মান অন্যত্র গেলেন, তখন তিনি ভরসা পাইলেন যে, কৌশলে মুক্তি পাইতে পারিবেন। শীঘ্র তাহার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রহরী কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিলে বিমলা তাহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। প্রহরী হউক, আর যমদূতই হউক, সুন্দরী রমণীর সহিত কে ইচ্ছাপূর্ব্বক কথোপকথন না করে? বিমলা প্রথমে এ ও সে নানাপ্রকার সামান্য বিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রহরীর নাম ধাম গৃহকর্ম্ম সুখদুঃখবিষয়ক নানা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রহরী নিজ সম্বন্ধে বিমলার এত দূর পর্য্যন্ত ঔৎসুক্য দেখিয়া বড়ই প্রীত হইল। বিমলাও সুযোগ দেখিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ তূণ হইতে শাণিত অস্ত্র-সকল বাহির করিতে লাগিলেন। একে বিমলার অমৃতময় রসালাপ, তাহাতে আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল চক্ষুর অব্যর্থ কটাক্ষসন্ধান, প্রহরী একেবারে গলিয়া গেল। যখন বিমলা প্রহরীর ভঙ্গীভাবে দেখিলেন যে, তাহার অধঃপাতে যাইবার সময় হইয়া

আসিয়াছে, তখন মৃদু মৃদু স্বরে কহিলেন, "আমার কেমন ভয় করিতেছে, সেখজী, তুমি আমার কাছে বস না।"

প্রহরী চরিতার্থ হইয়া বিমলার পার্শ্বে বসিল। ক্ষণকাল অন্য কথোপকথনের পর বিমলা দেখিলেন যে, ঔষধ ধরিয়াছে। প্রহরী নিকটে বসিয়া অবধি ঘন ঘন তাঁহার পানে দৃষ্টিপাত করিতেছে। তখন বলিলেন, "সেখজী, তুমি বড় ঘামিতেছ; একবার আমার বন্ধন খুলিয়া দাও যদি, তবে আমি তোমাকে বাতাস করি, পরে আবার বাঁধিয়া দিও।"

সেখজীর কপালে ঘর্ম্মবিন্দুও ছিল না, কিন্তু বিমলা অবশ্য ঘর্ম্ম না দেখিলে কেন বলিবে? আর এ হাতের বাতাস কার ভাগ্যে ঘটে? এই ভাবিয়া প্রহরী তখনই বন্ধন খুলিয়া দিল।

বিমলা কিয়ৎক্ষণ ওড়না দ্বারা প্রহরীকে বাতাস দিয়া স্বচ্ছন্দে ওড়না নিজ অঙ্গে পরিধান করিলেন। পুনর্ব্বন্ধনের নামও করিতে প্রহরীর মুখ ফুটিল না। তাহার বিশেষ কারণও ছিল; ওড়নার বন্ধনরজ্জুত্ব দশা ঘুচিয়া যখন তাহা বিমলার অঙ্গে শোভিত হইল, তখন তাহার লাবণ্য আরও প্রদীপ্ত হইল; যে লাবণ্য মুকুরে দেখিয়া বিমলা আপনা আপনি হাসিয়াছিলেন, সেই লাবণ্য দেখিয়া প্রহরী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিমলা কহিলেন, "সেখজী, তোমার স্ত্রী তোমাকে কি ভালবাসে না?"

সেখজী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন?"

বিমলা কহিলেন, "ভালবাসিলে এ বসন্তকালে (তখন ঘোর গ্রীষ্ম, বর্ষা আগত) কোন্ প্রাণে তোমা হেন স্বামীকে ছাড়িয়া আছে?"

সেখজী এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিমলার তূণ হইতে অনর্গল অস্ত্র বাহির হইতে লাগিল। "সেখজী! বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু তুমি যদি আমার স্বামী হইতে, তবে আমি কখন তোমাকে যুদ্ধে আসিতে দিতাম না।"

প্রহরী আবার নিশ্বাস ছাড়িল। বিমলা কহিতে লাগিলেন, "আহা! তুমি যদি আমার স্বামী হ'তে!"

বিমলাও এই বলিয়া একটি ছোট রকম নিশ্বাস ছাড়িলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজ তীক্ষ্ণ-কুটিল-কটাক্ষ বিসর্জ্জন করিলেন; প্রহরীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ক্রমে ক্রমে সরিয়া সরিয়া বিমলার আরও নিকটে আসিয়া বসিল, বিমলাও আর একটু তাহার দিকে সরিয়া বসিলেন।

বিমলা প্রহরীর করে কোমল কর-পল্লব স্থাপন করিলেন। প্রহরী হতবুদ্ধি হইয়া উঠিল।

বিমলা কহিতে লাগিলেন, "বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু তুমি যদি রণজয় করিয়া যাও, তবে আমাকে কি তোমার মনে থাকিবে ?"

প্র। তোমাকে মনে থাকিবে না ?

বি। মনের কথা তোমাকে বলিব ?

প্র। বল না—বল।

বি। না, বলিব না, তুমি কি বলিবে ?

প্র। না না—বল, আমাকে ভৃত্য বলিয়া জানিও।

বি। আমার মনে বড় ইচ্ছা হইতেছে, এ পাপ স্বামীর মুখে কালি দিয়া তোমার সঙ্গে চলিয়া যাই।

আবার সেই কটাক্ষ। প্রহরী আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল।

প্র। যাবে ?

দিগ্‌গজের মত পণ্ডিত অনেক আছে!

বিমলা কহিলেন, "লইয়া যাও ত যাই!"

প্র। তোমাকে লইয়া যাইব না ? তোমার দাস হইয়া থাকিব।

"তোমার এ ভালবাসার পুরস্কার কি দিব ? ইহাই গ্রহণ কর।"

এই বলিয়া বিমলা কণ্ঠস্থ স্বর্ণহার প্রহরীর কণ্ঠে পরাইলেন, প্রহরী সশরীরে স্বর্গে গেল। বিমলা কহিতে লাগিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে বলে, একের মালা অন্যের গলায় দিলে বিবাহ হয়।"

হাসিতে প্রহরীর কালো দাড়ির অন্ধকারমধ্য হইতে দাঁত বাহির হইয়া পড়িল; বলিল, "তবে ত তোমার সাতে আমার সাদি হইল।"

"হইল বই আর কি ?" বিমলা ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধে চিন্তামগ্নের ন্যায় রহিলেন। প্রহরী কহিল, "কি ভাবিতেছ ?"

বি। ভাবিতেছি, আমার কপালে বুঝি সুখ নাই, তোমরা দুর্গজয় করিয়া যাইতে পারিবে না।

প্রহরী সদর্পে কহিল, "তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, এতক্ষণ জয় হইল।"

বিমলা কহিলেন, "উঁহু, ইহার এক গোপন কথা আছে।"

প্রহরী কহিল, "কি ?"

বি। তোমাকে সে কথা বলিয়া দিই, যদি তুমি কোনরূপে দুর্গজয় করাইতে পার।

প্রহরী হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিল; বিমলা কথা বলিতে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন। প্রহরী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ব্যাপার কি ?"

বিমলা কহিলেন, "তোমরা জান না, এই দুর্গপার্শ্বে জগৎসিংহ দশ সহস্র সেনা লইয়া বসিয়া আছে। তোমরা আজ গোপনে আসিবে জানিয়া, সে আগে আসিয়া বসিয়া আছে; এখন কিছু করিবে না, তোমরা দুর্গজয় করিয়া যখন নিশ্চিন্ত থাকিবে, তখন আসিয়া ঘেরাও করিবে।"

প্রহরী ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিল; পরে বলিল, "সে কি?"

বি। এই কথা, দুর্গস্থ সকলেই জানে; আমরাও শুনিয়াছি।

প্রহরী আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, "জান্! আজ তুমি আমাকে বড়লোক করিলে; আমি এখনই গিয়া সেনাপতিকে বলিয়া আসি, এমন জরুরি খবর দিলে শিরোপা পাইব, তুমি এইখানে বসো, আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

প্রহরীর মনে বিমলার প্রতি তিলার্দ্ধ সন্দেহ ছিল না।

বিমলা বলিলেন, "তুমি আসিবে ত?"

প্র। আসিব বই কি, এই আসিলাম।

বি। আমাকে ভুলিবে না?

প্র। না—না।

বি। দেখ, মাথা খাও।

"চিন্তা কি?" বলিয়া প্রহরী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গেল।

যেই প্রহরী অদৃশ্য হইল, অমনি বিমলাও উঠিয়া পলাইলেন। ওস্মানের কথা যথার্থ, "বিমলার কটাক্ষকেই ভয়।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে

বিমুক্তি লাভ করিয়া বিমলার প্রথম কার্য্য বীরেন্দ্রসিংহকে সংবাদদান। উর্দ্ধশ্বাসে বীরেন্দ্রের শয়নকক্ষাভিমুখে ধাবমানা হইলেন।

অর্দ্ধপথ যাইতে না যাইতেই "আল্লা—ল্লা—হো" পাঠান সেনার চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

"এ কি পাঠান সেনার জয়ধ্বনি!" বলিয়া বিমলা ব্যাকুলিত হইলেন। ক্রমে অতিশয় কোলাহল শ্রবণ করিতে পাইলেন;—বিমলা বুঝিলেন, দুর্গবাসীরা জাগরিত হইয়াছে।

ব্যস্ত হইয়া বীরেন্দ্রসিংহের শয়নকক্ষে গমন করিয়া দেখেন যে, কক্ষমধ্যেও অত্যন্ত কোলাহল; পাঠান সেনা দ্বার ভগ্ন করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; বিমলা উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ, হস্তে নিষ্কোষিত অসি, অঙ্গে রুধিরধারা। তিনি উন্মত্তের ন্যায় অসি ঘূর্ণিত করিতেছেন। তাঁহার যুদ্ধোদ্যম বিফল হইল; এক জন মহাবল পাঠানের দীর্ঘ তরবারির আঘাতে বীরেন্দ্রের অসি হস্তচ্যুত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল; বীরেন্দ্রসিংহ বন্দী হইলেন।

বিমলা দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এখনও তিলোত্তমাকে রক্ষা করিবার সময় আছে। বিমলা তাহার কাছে দৌড়িয়া গেলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, তিলোত্তমার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য; সর্ব্বত্র পাঠান সেনা ব্যাপিয়াছে। পাঠানদিগের যে দুর্গজয় হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

বিমলা দেখিলেন, তিলোত্তমার ঘরে যাইতে পাঠান সেনার হস্তে পড়িতে হয়। তিনি তখন ফিরিলেন। কাতর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া জগৎসিংহ আর তিলোত্তমাকে এই বিপত্তিকালে সংবাদ দিবেন। বিমলা একটা কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে কয়েক জন সৈনিক অন্য ঘর লুঠ করিয়া, সেই ঘর লুঠিতে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। বিমলা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া ব্যস্তে কক্ষস্থ একটা সিন্দুকের পার্শ্বে লুকাইলেন। সৈনিকেরা আসিয়া ঐ কক্ষস্থ দ্রব্যজাত লুঠ করিতে লাগিলেন। বিমলা দেখিলেন, নিস্তার নাই, লুঠেরা সকল যখন ঐ সিন্দুক খুলিতে আসিবে, তখন তাঁহাকে অবশ্য ধৃত করিবে। বিমলা সাহসে নির্ভর করিয়া কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিলেন, এবং সিন্দুকপার্শ্ব হইতে সাবধানে সেনাগণ কি করিতেছে দেখিতে লাগিলেন। বিমলার অতুল সাহস; বিপৎকালে সাহস বৃদ্ধি হইল। যখন দেখিলেন যে, সেনাগণ নিজ নিজ দস্যুবৃত্তিতে ব্যাপৃত হইয়াছে, তখন নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সিন্দুকপার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিলেন। সেনাগণ লুঠে ব্যস্ত, তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। বিমলা প্রায় কক্ষদ্বার পশ্চাৎ করেন, এমন সময়ে এক জন সৈনিক আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। বিমলা ফিরিয়া দেখিলেন, রহিম সেখ! সে বলিয়া উঠিল, "তবে পলাতকা? আর কোথায় পলাবে?"

দ্বিতীয় বার রহিমের করকবলিত হওয়াতে বিমলার মুখ শুকাইয়া গেল; কিন্তু সে ক্ষণকালমাত্র; তেজস্বিনী বুদ্ধির প্রভাবে তখনই মুখ আবার হর্ষোৎফুল্ল হইল। বিমলা মনে মনে কহিলেন, "ইহারই দ্বারা স্বকর্ম্ম উদ্ধার করিব।" তাহার কথার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "চুপ কর, আস্তে, বাহিরে আইস।"

এই বলিয়া বিমলা রহিম সেখের হস্ত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিলেন; রহিমও ইচ্ছাপূর্ব্বক আসিল। বিমলা তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন, “ছি ছি ছি! তোমার এমন কর্ম্ম! আমাকে রাখিয়া তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমি তোমাকে না তল্লাস করিয়াছি এমন স্থান নাই।” বিমলা আবার সেই কটাক্ষ সেখজীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

সেখজীর গোসা দূর হইল; বলিল, “আমি সেনাপতিকে জগৎসিংহের সংবাদ দিবার জন্য তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছিলাম, সেনাপতির নাগাল না পাইয়া তোমার তল্লাসে ফিরিয়া আসিলাম, তোমাকে ছাদে না দেখিয়া নানা স্থানে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছি।”

বিমলা কহিলেন, “আমি তোমার বিলম্ব দেখিয়া মনে করিলাম, তুমি আমাকে ভুলিয়া গেলে, এজন্য তোমার তল্লাসে আসিয়াছিলাম। এখন আর বিলম্বে কাজ কি? তোমাদের দুর্গ অধিকার হইয়াছে; এই সময়ে পলাইবার উদ্যোগ দেখা ভাল।”

রহিম কহিল, “আজ না, কাল প্রাতে, আমি না বলিয়া কি প্রকারে যাইব? কাল প্রাতে সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া যাইব।”

বিমলা কহিলেন, “তবে চল, এই বেলা আমার অলঙ্কারাদি যাহা আছে, হস্তগত করিয়া রাখি; নচেৎ আর কোন সিপাহি লুঠ করিয়া লইবে।”

সৈনিক কহিল, “চল।” রহিমকে সমভিব্যাহারে লইবার তাৎপর্য্য এই যে, সে বিমলাকে অন্য সৈনিকের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। বিমলার সতর্কতা অচিরাৎ প্রমাণীকৃত হইল। তাহারা কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই আর এক দল অপহরণাসক্ত সেনার সম্মুখে পড়িল। বিমলাকে দেখিবামাত্র তাহারা কোলাহল করিয়া উঠিল, “ও রে, বড় শিকার মিলেছে রে!”

রহিম বলিল, “আপন আপন কর্ম্ম কর ভাই সব, এ দিকে নজর করিও না।”

সেনাগণ ভাব বুঝিয়া ক্ষান্ত হইল। এক জন কহিল, “রহিম! তোমার ভাগ্য ভাল। এখন নবাব মুখের গ্রাস না কাড়িয়া লয়।”

রহিম ও বিমলা চলিয়া গেল। বিমলা রহিমকে নিজ শয়নকক্ষের নীচের কক্ষে লইয়া গিয়া কহিলেন, “এই আমার নীচের ঘর; এই ঘরের যে যে সামগ্রী লইতে ইচ্ছা হয়, সংগ্রহ কর; ইহার উপরে আমার শুইবার ঘর, আমি তথা হইতে অলঙ্কারাদি লইয়া শীঘ্র আসিতেছি।” এই বলিয়া তাহাকে এক গোছা চাবি ফেলিয়া দিলেন।

রহিম কক্ষে দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিন্দুক পেটারা খুলিতে লাগিল। বিমলার প্রতি আর তিলার্দ্ধ অবিশ্বাস রহিল না। বিমলা কক্ষ হইতে বাহির হইয়াই ঘরের বহির্দ্দিকে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া কুলুপ দিলেন। রহিম কক্ষমধ্যে বন্দী হইয়া রহিল।

বিমলা তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে উপরের ঘরে গেলেন। বিমলা ও তিলোত্তমার প্রকোষ্ঠ দুর্গের প্রান্তভাগে; সেখানে এ পর্য্যন্ত অত্যাচারকারী সেনা আইসে নাই; তিলোত্তমা ও জগৎসিংহ কোলাহলও শুনিতে পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। বিমলা অকস্মাৎ তিলোত্তমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ না করিয়া কৌতূহল প্রযুক্ত দ্বারমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র রন্ধ্র হইতে গোপনে তিলোত্তমার ও রাজকুমারের ভাব দেখিতে লাগিলেন। যাহার যে স্বভাব! এ সময়েও বিমলার কৌতূহল। যাহা দেখিলেন, তাহাতে কিছু বিস্মিত হইলেন।

তিলোত্তমা পালঙ্কে বসিয়া আছেন, জগৎসিংহ নিকটে দাঁড়াইয়া নীরবে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিলোত্তমা রোদন করিতেছেন; জগৎসিংহও চক্ষু মুছিতেছেন।

বিমলা ভাবিলেন, "এ বুঝি বিদায়ের রোদন।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

খড়্গে খড়্গে

বিমলাকে দেখিয়া জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের কোলাহল?"

বিমলা কহিলেন, "পাঠানের জয়ধ্বনি। শীঘ্র উপায় করুন; শত্রু আর তিলার্দ্ধ মাত্রে এ ঘরের মধ্যে আসিবে।"

জগৎসিংহ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ কি করিতেছেন?"

বিমলা কহিলেন, "তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন।"

তিলোত্তমার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার নির্গত হইল; তিনি পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

জগৎসিংহ বিশুষ্কমুখ হইয়া বিমলাকে কহিলেন, "দেখ দেখ, তিলোত্তমাকে দেখ।"

বিমলা তৎক্ষণাৎ গোলাবপাশ হইতে গোলাব লইয়া তিলোত্তমার মুখে কণ্ঠে কপোলে সিঞ্চন করিলেন, এবং কাতর চিত্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

শত্রু-কোলাহল আরও নিকট হইল; বিমলা প্রায় রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "ঐ আসিতেছে!—রাজপুত্র! কি হইবে?"

জগৎসিংহের চক্ষুঃ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কহিলেন, "একা কি করিতে পারি? তবে তোমার সখীর রক্ষার্থ প্রাণত্যাগ করিব।"

শত্রুর ভীমনাদ আরও নিকটবর্ত্তী হইল। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনাও শুনা যাইতে লাগিল। বিমলা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তিলোত্তমা! এ সময়ে কেন তুমি অচেতন হইলে? তোমাকে কি প্রকারে রক্ষা করিব?"

তিলোত্তমা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। বিমলা কহিলেন, "তিলোত্তমার জ্ঞান হইতেছে! রাজকুমার! রাজকুমার! এখনও তিলোত্তমাকে বাঁচাও।"

রাজকুমার কহিলেন, "এ ঘরের মধ্যে থাকিলে কার সাধ্য রক্ষা করে! এখনও যদি ঘর হইতে বাহির হইতে পারিতে, তবে আমি তোমাদিগকে দুর্গের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিলেও পারিতাম; কিন্তু তিলোত্তমার ত গতিশক্তি নাই। বিমলে! ঐ পাঠান সিঁড়িতে উঠিতেছে। আমি অগ্রে প্রাণ দিবই, কিন্তু পরিতাপ যে, প্রাণ দিয়াও তোমাদের বাঁচাইতে পারিলাম না।"

বিমলা পলকমধ্যে তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া কহিলেন, "তবে চলুন; আমি তিলোত্তমাকে লইয়া যাইতেছি।"

বিমলা আর জগৎসিহ তিন লম্ফে কক্ষদ্বারে আসিলেন। চারি জন পাঠান সৈনিকও সেই সময়ে বেগে ধাবমান হইয়া কক্ষদ্বারে আসিয়া পড়িল। জগৎসিংহ কহিলেন, "বিমলা, আর হইল না, আমার পশ্চাৎ আইস।"

পাঠানেরা শিকার সম্মুখে পাইয়া "আল্লা—ল্লা—হো" চীৎকার করিয়া, পিশাচের ন্যায় লাফাইতে লাগিল। কটিস্থিত অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শেষ হইতে না হইতেই জগৎসিংহের অসি এক জন পাঠানের হৃদয়ে আমূল সমারোপিত হইল। ভীম চীৎকার করিতে করিতে পাঠান প্রাণত্যাগ করিল। পাঠানের বক্ষঃ হইতে অসি তুলিবার পূর্ব্বেই আর এক জন পাঠানের বর্শাফলক জগৎসিংহের গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল; বর্শা পড়িতে না পড়িতেই বিদ্যুদ্বৎ হস্তচালনা দ্বারা কুমার সেই বর্শা বাম করে ধৃত করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বর্শারই প্রতিঘাতে বর্শানিক্ষেপীকে ভূমিশায়ী করিলেন। বাকি দুই জন পাঠান নিমেষমধ্যে এককালে জগৎসিংহের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি প্রহার করিল; জগৎসিংহ পলক ফেলিতে অবকাশ না লইয়া দক্ষিণ হস্তস্থ অসির আঘাতে এক জনের অসি সহিত প্রকোষ্ঠচ্ছেদ করিয়া ভূতলে ফেলিলেন; দ্বিতীয়ের প্রহার নিবারণ করিতে পারিলেন না; অসি মস্তকে লাগিল না বটে, কিন্তু স্কন্ধদেশে দারুণ আঘাত পাইলেন। কুমার আঘাত পাইয়া যন্ত্রণায় ব্যাধশরস্পৃষ্ট ব্যাঘ্রের ন্যায় দ্বিগুণ প্রচণ্ড হইলেন; পাঠান অসি তুলিয়া পুনরাঘাতের উদ্যম করিতে না করিতেই কুমার, দুই হস্তে দৃঢ়তর মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া ভীষণ অসি ধারণ পূর্ব্বক লাফ দিয়া আঘাতকারী পাঠানের মস্তকে মারিলেন, উষ্ণীষ সহিত পাঠানের মস্তক দুই খণ্ড হইয়া পড়িল। কিন্তু এই অবসরে যে সৈনিকের

হস্তচ্ছেদ হইয়াছিল, সে বাম হস্তে কটি হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা নির্গত করিয়া রাজপুত্র-শরীর লক্ষ্য করিল; যেমন রাজপুত্রের উল্লম্ফোত্থিত শরীর ভূতলে অবতরণ করিতেছিল, অমনি সেই ছুরিকা রাজপুত্রের বিশাল বাহুমধ্যে গভীর বিঁধিয়া গেল। রাজপুত্র সে আঘাত সূচীবেধ মাত্র জ্ঞান করিয়া পাঠানের কটিদেশে পর্ব্বতপাতবৎ পদাঘাত করিলেন, যবন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। রাজপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময়ে ভীমনাদে "আল্লা—ল্লা—হো" শব্দ করিয়া অগণিত পাঠান-সেনাস্রোত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র দেখিলেন, যুদ্ধ করা কেবল মরণের কারণ।

রাজপুত্রের অঙ্গ রুধিরে প্লাবিত হইতেছে; রুধিরোৎসর্গে ক্রমে দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

তিলোত্তমা এখনও বিচেতন হইয়া বিমলার ক্রোড়ে রহিয়াছেন।

বিমলা তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছেন; তাঁহারও বস্ত্র রাজপুত্রের রক্তে আর্দ্র হইয়াছে।

কক্ষ পাঠান সেনায় পরিপূর্ণ হইল।

রাজপুত্র এবার অসির উপর ভর করিয়া নিশ্বাস ছাড়িলেন। এক জন পাঠান কহিল, "রে নফর! অস্ত্র ত্যাগ কর্; তোরে প্রাণে মারিব না।" নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে যেন কেহ ঘৃতাহুতি দিল। অগ্নিশিখাবৎ লম্ফ দিয়া, কুমার দাম্ভিক পাঠানের মস্তকচ্ছেদ করিয়া নিজ চরণতলে পাড়িলেন। অসি ঘুরাইয়া ডাকিয়া কহিলেন, "যবন! রাজপুতেরা কি প্রকারে প্রাণত্যাগ করে, দেখ্।"

অনন্তর বিদ্যুদ্বৎ কুমারের অসি চমকিতে লাগিল। রাজপুত্র দেখিলেন যে, একাকী আর যুদ্ধ হইতে পারে না; কেবল যত পারেন শত্রুনিপাত করিয়া প্রাণত্যাগ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। এই অভিপ্রায়ে শত্রুতরঙ্গের মধ্যস্থলে পড়িয়া, বজ্রমুষ্টিতে দুই হস্তে অসি-ধারণপূর্ব্বক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। আর আত্মরক্ষার দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না; কেবল অজস্র আঘাত করিতে লাগিলেন। এক, দুই, তিন,—প্রতি আঘাতেই হয় কোন পাঠান ধরাশায়ী, নচেৎ কাহারও অঙ্গচ্ছেদ হইতে লাগিল। রাজপুত্রের অঙ্গে চতুর্দ্দিক্ হইতে বৃষ্টিধারাবৎ অস্ত্রাঘাত হইতে লাগিল। আর হস্ত চলে না, ক্রমে ভূরি ভূরি আঘাতে শরীর হইতে রক্তপ্রবাহ নির্গত হইয়া বাহু ক্ষীণ হইয়া আসিল; মস্তক ঘুরিতে লাগিল; চক্ষে ধূমাকার দেখিতে লাগিলেন; কর্ণে অস্পষ্ট কোলাহল মাত্র প্রবেশ করিতে লাগিল।

"রাজপুত্রকে কেহ প্রাণে বধ করিও না, জীবিতাবস্থায় ব্যাঘ্রকে পিঞ্জরবদ্ধ করিতে হইবে।"

এই কথার পর আর কোন কথা রাজপুত্র শুনিতে পাইলেন না; ওস্‌মান খাঁ এই কথা বলিয়াছিলেন।

রাজপুত্রের বাহুযুগল শিথিল হইয়া পড়িল; বলহীন মুষ্টি হইতে অসি ঝঞ্চনা-সহকারে ভূতলে পড়িয়া গেল; রাজপুত্রও বিচেতন হইয়া স্বকরনিহত এক পাঠানের মৃতদেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিংশতি পাঠান রাজপুত্রের উষ্ণীষের রত্ন অপহরণ করিতে ধাবমান হইল। ওস্‌মান বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কেহ রাজপুত্রকে স্পর্শ করিও না।"

সকলে বিরত হইল। ওস্‌মান খাঁ ও অপর এক জন সৈনিক তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পালঙ্কের উপর উঠাইয়া শয়ন করাইলেন। জগৎসিংহ চারি দণ্ড পূর্ব্বে তিলার্দ্ধ জন্য আশা করিয়াছিলেন যে, তিলোত্তমাকে বিবাহ করিয়া এক দিন সেই পালঙ্কে তিলোত্তমার সহিত বিরাজ করিবেন,—সে পালঙ্ক তাঁহার মৃত্যু-শয্যা-প্রায় হইল।

জগৎসিংহকে শয়ন করাইয়া ওস্‌মান খাঁ সৈনিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোকেরা কই?"

ওস্‌মান, বিমলা ও তিলোত্তমাকে দেখিতে পাইলেন না। যখন দ্বিতীয় বার সেনা-প্রবাহ কক্ষমধ্যে প্রধাবিত হয়, তখন বিমলা ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; উপায়ান্তর বিরহে পালঙ্ক-তলে তিলোত্তমাকে লইয়া লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, কেহ তাহা দেখে নাই। ওস্‌মান তাঁহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকেরা কোথায়, তোমরা তাবৎ দুর্গমধ্যে অন্বেষণ কর! বাঁদী ভয়ানক বুদ্ধিমতী; সে যদি পলায়, তবে আমার মন নিশ্চিন্ত থাকিবেক না। কিন্তু সাবধান! বীরেন্দ্রের কন্যার প্রতি যেন কোন অত্যাচার না হয়।"

সেনাগণ কতক কতক দুর্গের অন্যান্য ভাগ অন্বেষণ করিতে গেল। দুই এক জন কক্ষমধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এক জন অন্য এক দিক্ দেখিয়া আলো লইয়া পালঙ্কতলমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল। যাহা সন্ধান করিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইয়া কহিল, "এইখানেই আছে।"

ওস্‌মানের মুখ হর্ষ-প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, "তোমরা বাহিরে আইস, কোন চিন্তা নাই।"

বিমলা অগ্রে বাহির হইয়া তিলোত্তমাকে বাহিরে আনিয়া বসাইলেন। তখন তিলোত্তমার চৈতন্য হইতেছে—বসিতে পারিলেন। ধীরে ধীরে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কোথায় আসিয়াছি?"

বিমলা কাণে কাণে কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই, অবগুণ্ঠন দিয়া বসো।"

যে ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিল, সে ওস্মানকে কহিল, "জুনাব্! গোলাম খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে।"

ওস্মান কহিল, "তুমি পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছ? তোমার নাম কি?"

সে কহিল, "গোলামের নাম করিম্‌বক্স, কিন্তু করিম্‌বক্স বলিলে কেহ চেনে না। আমি পূর্ব্বে মোগল-সৈন্য ছিলাম, এজন্য সকলে রহস্যে আমাকে মোগল-সেনাপতি বলিয়া ডাকে।"

বিমলা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। অভিরাম স্বামীর জ্যোতির্গণনা তাঁহার স্মরণ হইল।

ওস্মান কহিলেন, "আচ্ছা, স্মরণ থাকিবে।"

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আয়েষা

জগৎসিংহ যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তিনি সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। যে ঘরে তিনি শয়ন করিয়া আছেন, তথায় যে আর কখন আসিয়াছিলেন, এমত বোধ হইল না; কক্ষটি অতি প্রশস্ত, অতি সুশোভিত; প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতল, পাদস্পর্শসুখজনক গালিচায় আবৃত; তদুপরি গোলাবপাশ প্রভৃতি স্বর্ণ রৌপ্য গজদন্তাদি নানা মহার্ঘবস্তু-নির্ম্মিত সামগ্রী রহিয়াছে; কক্ষদ্বারে বা গবাক্ষে নীল পর্দ্দা আছে; এজন্য দিবসের আলোক অতি স্নিগ্ধ হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেছে; কক্ষ নানাবিধ স্নিগ্ধ সৌগন্ধে আমোদিত হইয়াছে।

কক্ষমধ্যে নীরব, যেন কেহই নাই। এক জন কিঙ্করী সুবাসিত বারিসিক্ত ব্যজনহস্তে রাজপুত্রকে নিঃশব্দে বাতাস দিতেছে, অপরা এক জন কিঙ্করী কিছু দূরে বাক্‌শক্তিবিহীনা চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা আছে। যে দ্বিরদ-দন্ত-খচিত পালঙ্কে রাজপুত্র শয়ন করিয়া আছেন, তাহার উপরে রাজপুত্রের পার্শ্বে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক; তাঁহার অঙ্গের ক্ষতসকলে সাবধানহস্তে কি ঔষধ লেপন করিতেছে। হর্ম্ম্যতলে গালিচার উপরে উত্তম পরিচ্ছদবিশিষ্ট এক জন পাঠান বসিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছে ও একখানি পারসী পুস্তক দৃষ্টি করিতেছে। কেহই কোন কথা কহিতেছে না বা শব্দ করিতেছে না।

রাজপুত্র চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিলার্দ্ধ সরিতে পারিলেন না; সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা।

পর্য্যঙ্কে যে স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, সে রাজপুত্রের উদ্যম দেখিয়া অতি মৃদু, বীণাবৎ মধুর স্বরে কহিল, "স্থির থাকুন, চঞ্চল হইবেন না।"

রাজপুত্র ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমি কোথায়?"

সেই মধুর স্বরে উত্তর হইল, "কথা কহিবেন না, আপনি উত্তম স্থানে আছেন। চিন্তা করিবেন না, কথা কহিবেন না।"

রাজপুত্র পুনশ্চ অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলা কত?"

মধুরভাষিণী পুনরপি অস্ফুট বচনে কহিল, "অপরাহ্ণ। আপনি স্থির হউন, কথা কহিলে আরোগ্য পাইতে পারিবেন না। আপনি চুপ না করিলে আমরা উঠিয়া যাইব।"

রাজপুত্র কষ্টে কহিলেন, "আর একটি কথা ; তুমি কে ?"

রমণী কহিল, "আয়েষা।"

রাজপুত্র নিস্তব্ধ হইয়া আয়েষার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর কোথাও কি ইহাকে দেখিয়াছেন ? না ; আর কখন দেখেন নাই ; সে বিষয় নিশ্চিত প্রতীতি হইল।

আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক। আয়েষা দেখিতে পরমা সুন্দরী, কিন্তু সে রীতির সৌন্দর্য্য দুই চারি শব্দে সেরূপ প্রকটিত করা দুঃসাধ্য। তিলোত্তমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য্য সে রীতির নহে ; স্থিরযৌবনা বিমলারও এ কাল পর্য্যন্ত রূপের ছটা লোক-মনোমোহিনী ছিল ; আয়েষার রূপরাশি তদনুরূপও নহে। কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায় ; নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায় ; নির্ব্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকসিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য্য নব-রবিকর-ফুল্ল জলনলিনীর ন্যায় ; সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত ; না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক ; কোমল, অথচ প্রোজ্জ্বল ; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না। পাঠক মহাশয়, "রূপের আলো" কখন দেখিয়াছেন ? না দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকিবেন। অনেক সুন্দরী রূপে "দশ দিক্ আলো" করে। শুনা যায়, অনেকের পুত্রবধূ "ঘর আলো" করিয়া থাকেন। ব্রজধামে আর নিশুম্ভের যুদ্ধে কালো রূপেও আলো হইয়াছিল। বস্তুতঃ পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন, "রূপের আলো" কাহাকে বলে ? বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত ; একটু একটু মিট্‌মিটে, তেল চাই, নহিলে জ্বলে না ; গৃহকার্য্যে চলে ; নিয়ে ঘর কর, ভাত রান্ধ, বিছানা পাড়, সব চলিবে ; কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দু-জ্যোতির ন্যায় ; সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল ; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না ; তত প্রখর নয়, এবং দূরনিঃসৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্ব্বাহ্লিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ; প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।

যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা ; এজন্য তাঁহার অবয়ব পাঠক মহাশয়ের ধ্যান-প্রাপ্য করিতে চাহি। যদি চিত্রকর হইতাম, যদি এইখানে তূলি ধরিতে পারিতাম, যদি সে বর্ণ ফলাইতে পারিতাম ; না চম্পক, না রক্ত, না শ্বেতপদ্মকোরক, অথচ তিনই মিশ্রিত, এমত বর্ণ ফলাইতে পারিতাম ; যদি সে কপাল

তেমনই নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম, নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ, মন্মথের রঙ্গভূমিস্বরূপ করিয়া লিখিতে পারিতাম ; তাহার উপরে তেমনই সুবঙ্কিম কেশের সীমা-রেখা দিতে পারিতাম ; সে রেখা তেমনই পরিষ্কার, তেমনই কপালের গোলাকৃতির অনুগামিনী করিয়া আকর্ণ টানিতে পারিতাম ; কর্ণের উপরে সে রেখা তেমনই করিয়া ঘুরাইয়া দিতে পারিতাম ; যদি তেমনই কালো রেশমের মত কেশগুলি লিখিতে পারিতাম, কেশমধ্যে তেমনই করিয়া কপাল হইতে সঁীতি কাটিয়া দিতে পারিতাম—তেমনই পরিষ্কার, তেমনই সূক্ষ্ম ; যদি তেমনই করিয়া কেশ রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিতাম ; যদি তেমনই করিয়া লোল কবরী বাঁধিয়া দিতে পারিতাম ; যদি সে অতি নিবিড় ভ্রূযুগ আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম ; প্রথমে যথায় দুটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগাশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই, তথা হইতে যেখানে যেমন বর্দ্ধিতায়তন হইয়া মধ্যস্থলে না আসিতে আসিতেই যেরূপ স্থূলরেখ হইয়াছিল, পরে আবার যেমন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মাকারে কেশবিন্যাসরেখার নিকটে গিয়া সূচ্যগ্রবৎ সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যদি দেখাইতে পারিতাম ; যদি সেই বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ, চঞ্চল, কোমল, চক্ষুঃপল্লব লিখিতে পারিতাম ; যদি সে নয়নযুগলের বিস্তৃত আয়তন লিখিতে পারিতাম ; তাহার উপরিপল্লব ও অধঃপল্লবের সুন্দর বঙ্ক ভঙ্গী, সে চক্ষুর নীলালক্তকপ্রভা, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ স্থূল তারা লিখিতে পারিতাম ; যদি সে গর্ব্ববিস্ফারিত রন্ধ্রসমেত সুনাসা, সে রসময় ওষ্ঠাধর, সে কবরীস্পৃষ্ট প্রস্তরশ্বেত গ্রীবা, সে কর্ণাভরণ-স্পর্শপ্রার্থী পীবরাংস, সে স্থূল কোমল রত্নালঙ্কারখচিত বাহু, যে অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয় হীনভাস হইয়াছে, সে অঙ্গুলি, সে পদ্মারক্ত, কোমল করপল্লব, সে মুক্তাহার-প্রভানিন্দী পীবরোন্নত বক্ষঃ, সে ঈষদ্দীর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী, যদি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তূলি স্পর্শ করিতাম না। আয়েষার সৌন্দর্য্যসার, সে সমুদ্রের কৌস্তুভরত্ন, তাহার ধীর কটাক্ষ! সন্ধ্যাসমীরণকম্পিত নীলোৎপলতুল্য ধীর মধুর কটাক্ষ! কি প্রকারে লিখিব ?

রাজপুত্র আয়েষার প্রতি অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তিলোত্তমাকে মনে পড়িল। স্মৃতিমাত্র হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, শিরাসমূহমধ্যে রক্তস্রোতঃ প্রবল বেগে প্রধাবিত হইল, গভীর ক্ষত হইতে পুনর্ব্বার রক্ত-প্রবাহ ছুটিল ; রাজপুত্র পুনর্ব্বার বিচেতন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

খট্টারূঢ়া সুন্দরী তৎক্ষণাৎ ত্রস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। যে ব্যক্তি গালিচায় বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল, সে মধ্যে মধ্যে পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে আয়েষাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল ; এমন কি, যুবতী পালঙ্ক হইতে উঠিলে তাহার যে কর্ণাভরণ দুলিতে লাগিল, পাঠান তাহাই অনেকক্ষণ অপরিতৃপ্তলোচনে দেখিতে লাগিল। আয়েষা গাত্রোত্থান

করিয়া ধীরে ধীরে পাঠানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার কাণে কাণে কহিলেন, "ওস্মান, শীঘ্র হকিমের নিকট লোক পাঠাও।"

দুর্গজেতা ওস্মান খাঁই গালিচায় বসিয়া ছিলেন। আয়েষার কথা শুনিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

আয়েষা, একটা রূপার সেপায়ার উপরে যে পাত্র ছিল, তাহা হইতে একটু জলবৎ দ্রব্য লইয়া পুনর্মূর্চ্ছাগত রাজপুত্রের কপালে মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

ওস্মান খাঁ অচিরাৎ হকিম লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। হকিম অনেক যত্নে রক্তস্রাব নিবারণ করিলেন, এবং নানাবিধ ঔষধ আয়েষার নিকট দিয়া মৃদু মৃদু স্বরে সেবনের ব্যবস্থা উপদেশ করিলেন।

আয়েষা কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অবস্থা দেখিতেছেন ?"

হকিম কহিলেন, "জ্বর অতি ভয়ঙ্কর।"

হকিম বিদায় লইয়া প্রতিগমন করেন, তখন ওস্মান তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দ্বারদেশে তাঁহাকে মৃদুস্বরে কহিলেন, "রক্ষা পাইবে ?"

হকিম কহিলেন, "আকার নহে ; পুনর্ব্বার যাতনা হইলে আমাকে ডাকিবেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুসুমের মধ্যে পাষাণ

সেই দিবস অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আয়েষা ও ওস্মান জগৎসিংহের নিকট বসিয়া রহিলেন। জগৎসিংহের কখন চেতনা হইতেছে, কখন মূর্চ্ছা হইতেছে ; হকিম অনেক বার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। আয়েষা অবিশ্রান্তা হইয়া কুমারের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন এক জন পরিচারিকা আসিয়া আয়েষাকে কহিল যে, বেগম তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন।

"যাইতেছি" বলিয়া আয়েষা গাত্রোত্থান করিলেন। ওস্মানও গাত্রোত্থান করিলেন। আয়েষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও উঠিলে ?"

ওস্মান কহিলেন, "রাত্রি হইয়াছে, চল তোমাকে রাখিয়া আসি।"

আয়েষা দাসদাসীদিগকে সতর্ক থাকিতে আদেশ করিয়া মাতৃগৃহ অভিমুখে চলিলেন। পথে ওস্মান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আজ বেগমের নিকটে থাকিবে ?"

আয়েষা কহিলেন, "না, আমি আবার রাজপুত্রের নিকট প্রত্যাগমন করিব।"

ওস্‌মান কহিলেন, "আয়েষা! তোমার গুণের সীমা দিতে পারি না; তুমি এই পরম শত্রুকে যে যত্ন করিয়া শুশ্রূষা করিতেছ, ভগিনী ভ্রাতার জন্য এমন করে না। তুমি উহার প্রাণদান করিতেছ।"

আয়েষা ভুবনমোহন মুখে একটু হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ওস্‌মান! আমি ত স্বভাবতঃ রমণী; পীড়িতের সেবা আমার পরম ধর্ম্ম; না করিলে দোষ, করিলে প্রশংসা নাই; কিন্তু তোমার কি? যে তোমার পরম বৈরী, রণক্ষেত্রে তোমার দর্পহারী প্রতিযোগী, স্বহস্তে যাহার এ দশা ঘটাইয়াছ, তুমি যে অনুদিন নিজে ব্যস্ত থাকিয়া তাহার সেবা করাইতেছ, তাহার আরোগ্যসাধন করাইতেছ, ইহাতে তুমিই যথার্থ প্রশংসাভাজন।"

ওস্‌মান কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের ন্যায় হইয়া কহিলেন, "তুমি, আয়েষা, আপনার সুন্দর স্বভাবের মত সকলকে দেখ। আমার অভিপ্রায় তত ভাল নহে। তুমি দেখিতেছ না, জগৎসিংহ প্রাণ পাইলে আমাদিগের কত লাভ? রাজপুত্রের এক্ষণে মৃত্যু হইলে আমাদিগের কি হইবে? রণক্ষেত্রে মানসিংহ জগৎসিংহের ন্যূন নহে, এক জন যোদ্ধার পরিবর্ত্তে আর এক জন যোদ্ধা আসিবে। কিন্তু যদি জগৎসিংহ জীবিত থাকিয়া আমাদিগের হস্তে কারারুদ্ধ থাকে, তবে মানসিংহকে হাতে পাইলাম; সে প্রিয় পুত্রের মুক্তির জন্য অবশ্য আমাদিগের মঙ্গলজনক সন্ধি করিবে; আকবরও এতাদৃশ দক্ষ সেনাপতিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য অবশ্য সন্ধির পক্ষে মনোযোগী হইতে পারিবে; আর যদি জগৎসিংহকে আমাদিগের সদ্ব্যবহার দ্বারা বাধ্য করিতে পারি, তবে সেও আমাদিগের মনোমত সন্ধিবন্ধন পক্ষে অনুরোধ কি যত্ন করিতে পারে; তাহার যত্ন নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। নিতান্ত কিছু ফল না দর্শে, তবে জগৎসিংহের স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ মানসিংহের নিকট বিস্তর ধনও পাইতে পারিব। সম্মুখ সংগ্রামে এক দিন জয়ী হওয়ার অপেক্ষাও জগৎসিংহের জীবনে আমাদিগের উপকার।"

ওস্‌মান এই সকল আলোচনা করিয়া রাজপুত্রের পুনর্জীবনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু আর কিছুও ছিল। কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে যে, পাছে লোকে দয়ালু-চিত্ত বলে, এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য প্রকাশ করেন; এবং দয়াশীলতা নারী-স্বভাব-সিদ্ধ বলিয়া উপহাস করিতে করিতে পরোপকার করেন। লোকে জিজ্ঞাসিলে বলেন, ইহাতে আমার বড় প্রয়োজন আছে। আয়েষা বিলক্ষণ জানিতেন, ওস্‌মান তাহারই এক জন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওস্‌মান! সকলেই যেন তোমার মত স্বার্থপরতায় দূরদর্শী হয়। তাহা হইলে আর ধর্ম্মে কাজ নাই।"

ওস্‌মান কিঞ্চিৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুতর স্বরে কহিলেন, "আমি যে পরম স্বার্থপর, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।"

আয়েষা নিজ সবিদ্যুৎ মেঘতুল্য চক্ষুঃ ওস্‌মানের বদনের প্রতি স্থির করিলেন।

ওস্‌মান কহিলেন, "আমি আশা-লতা ধরিয়া আছি, আর কত কাল তাহার তলে জলসিঞ্চন করিব ?"

আয়েষার মুখশ্রী গম্ভীর হইল। ওস্‌মান এ ভাবান্তরেও নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। আয়েষা কহিলেন, "ওস্‌মান! ভাই বহিন বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে, তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।"

ওস্‌মানের হর্ষোৎফুল্ল মুখ মলিন হইয়া গেল। কহিলেন, "ঐ কথা চিরকাল! সৃষ্টিকর্ত্তা! এ কুসুমের দেহমধ্যে তুমি কি পাষাণের হৃদয় গড়িয়া রাখিয়াছ ?"

ওস্‌মান আয়েষাকে মাতৃগৃহ পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিয়া বিষণ্ণ মনে নিজ আবাসমন্দির মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

আর জগৎসিংহ ?

বিষম জ্বর-বিকারে অচেতন শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তুমি না তিলোত্তমা ?

পরদিন প্রদোষকালে জগৎসিংহের অবস্থান-কক্ষে আয়েষা, ওস্‌মান, আর চিকিৎসক পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে বসিয়া আছেন ; আয়েষা পালঙ্কে বসিয়া স্বহস্তে ব্যজনাদি করিতেছেন ; চিকিৎসক ঘন ঘন জগৎসিংহের নাড়ী দেখিতেছেন ; জগৎসিংহ অচেতন ; চিকিৎসক কহিয়াছেন, সেই রাত্রে জ্বরত্যাগের সময়ে জগৎসিংহের লয় হইবার সম্ভাবনা, যদি সে সময় শুধরাইয়া যান, তবে আর চিন্তা থাকিবে না, নিশ্চিত রক্ষা পাইবেন। জ্বর-বিশ্রামের সময় আগত, এই জন্য সকলেই বিশেষ ব্যগ্র ; চিকিৎসক মুহুর্মুহুঃ নাড়ী দেখিতেছেন, "নাড়ী ক্ষীণ," "আরও ক্ষীণ,"—"কিঞ্চিৎ সবল," ইত্যাদি মুহুর্মুহুঃ অস্ফুটশব্দে বলিতেছেন। সহসা চিকিৎসকের মুখ কালিমাপ্রাপ্ত হইল। বলিলেন, "সময় আগত।"

আয়েষা ও ওস্‌মান নিস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। হকিম নাড়ী ধরিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চিকিৎসক কহিলেন, "গতিক মন্দ।" আয়েষার মুখ আরও ম্লান হইল। হঠাৎ জগৎসিংহের মুখে বিকট ভঙ্গী উপস্থিত হইল ; মুখ শ্বেতবর্ণ হইয়া আসিল ; হস্তে দৃঢ়মুষ্টি বাঁধিল ; চক্ষে অলৌকিক স্পন্দ হইতে লাগিল ; আয়েষা বুঝিলেন, কৃতান্তের গ্রাস পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই। চিকিৎসক হস্তস্থিত পাত্রে ঔষধ লইয়া বসিয়া ছিলেন ;

এরূপ লক্ষণ দেখিবামাত্রই অঙ্গুলি দ্বারা রোগীর মুখব্যাদান করাইয়া ঐ ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ ওষ্ঠোপান্ত হইতে নির্গত হইয়া পড়িল; কিঞ্চিৎ উদরে গেল। উদরে প্রবেশমাত্রই রোগীর দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; ক্রমে মুখের বিকট ভঙ্গী দূরে গিয়া কান্তি স্থির হইল, বর্ণের অস্বাভাবিক শ্বেতভাব বিনষ্ট হইয়া ক্রমে রক্তসঞ্চার হইতে লাগিল; হস্তের মুষ্টি শিথিল হইল; চক্ষু স্থির হইয়া পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইল। হকিম অত্যন্ত মনোভিনিবেশপূর্ব্বক নাড়ী দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন, "আর চিন্তা নাই; রক্ষা পাইয়াছেন।"

ওস্‌মান জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্বরত্যাগ হইয়াছে?"

ভিষক্ কহিলেন, "হইয়াছে।"

আয়েষা ও ওস্‌মান উভয়েরই মুখ প্রফুল্ল হইল। ভিষক্ কহিলেন, "এখন আর কোন চিন্তা নাই, আমার বসিয়া থাকার প্রয়োজন করে না; এই ঔষধ দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ঘড়ী ঘড়ী খাওয়াইবেন।" এই বলিয়া ভিষক্ প্রস্থান করিলেন। ওস্‌মান আর দুই চারি দণ্ড বসিয়া নিজ আবাসগৃহে গেলেন। আয়েষা পূর্ব্ববৎ পালঙ্কে বসিয়া ঔষধাদি সেবন করাইতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজকুমার নয়ন উন্মীলন করিলেন। প্রথমেই আয়েষার সুখপ্রফুল্ল মুখ দেখিতে পাইলেন। চক্ষুর কটাক্ষভাব দেখিয়া আয়েষার বোধ হইল, যেন তাঁহার বুদ্ধির ভ্রম জন্মিতেছে, যেন তিনি কিছু স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যত্ন বিফল হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে আয়েষার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আমি কোথায়?" দুই দিবসের পর রাজপুত্র এই প্রথম কথা কহিলেন।

আয়েষা কহিলেন, "কতলু খাঁর দুর্গে।"

রাজপুত্র আবার পূর্ব্ববৎ স্মরণ করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "আমি কেন এখানে?"

আয়েষা প্রথমে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন, "আপনি পীড়িত।"

রাজপুত্র ভাবিতে ভাবিতে মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন, "না না, আমি বন্দী হইয়াছি।"

এই কথা বলিতে রাজপুত্রের মুখের ভাবান্তর হইল।

আয়েষা উত্তর করিলেন না; দেখিলেন, রাজপুত্রের স্মৃতিক্ষমতা পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে।

ক্ষণপরে রাজপুত্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"আমি আয়েষা।"

"আয়েষা কে?"

"কতলু খাঁর কন্যা।"

রাজপুত্র আবার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন ; এককালে অধিকক্ষণ কথা কহিতে শক্তি নাই। কিয়ৎক্ষণ নীরবে বিশ্রাম লাভ করিয়া কহিলেন, "আমি কয় দিন এখানে আছি ?"

"চারি দিন।"

"গড় মান্দারণ অদ্যাপি তোমাদিগের অধিকারে আছে ?"

"আছে।"

জগৎসিংহ আবার কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কি হইয়াছে ?"

"বীরেন্দ্রসিংহ কারাগারে আবদ্ধ আছেন, অদ্য তাঁহার বিচার হইবে।"

জগৎসিংহের মলিন মুখ আরও মলিন হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আর পৌরবর্গ কি অবস্থায় আছে ?"

আয়েষা উদ্বিগ্না হইলেন। কহিলেন, "সকল কথা আমি অবগত নহি।"

রাজপুত্র আপনা আপনি কি বলিলেন। একটি নাম তাঁহার কণ্ঠনির্গত হইল, আয়েষা তাহা শুনিতে পাইলেন, "তিলোত্তমা।"

আয়েষা ধীরে ধীরে উঠিয়া পাত্র হইতে ভিষগ্‌দত্ত সুস্বাদু ঔষধ আনিতে গেলেন ; রাজপুত্র তাঁহার দোদুল্যমান কর্ণাভরণসংযুক্ত অলৌকিক দেহমহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আয়েষা ঔষধ আনিলেন ; রাজপুত্র তাহা পান করিয়া কহিলেন, "আমি পীড়ার মোহে স্বপ্ন দেখিতাম, স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, সে তুমি, না তিলোত্তমা ?"

আয়েষা কহিলেন, "আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অবগুণ্ঠনবতী

দুর্গজয়ের দুই দিবস পরে, বেলা প্রহরেকের সময়ে কতলু খাঁ নিজ দুর্গমধ্যে দরবারে বসিয়াছেন। দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পারিষদগণ দণ্ডায়মান আছে। সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডে বহু সহস্র লোক নিঃশব্দে রহিয়াছে। অদ্য বীরেন্দ্রসিংহের দণ্ড হইবে।

কয়েক জন শস্ত্রপাণি প্রহরী বীরেন্দ্রসিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবারে আনীত করিল। বীরেন্দ্রসিংহের মূর্ত্তি রক্তবর্ণ, কিন্তু তাহাতে ভীতিচিহ্ন কিছুমাত্র নাই। প্রদীপ্ত চক্ষুঃ হইতে অগ্নিকণা বিস্ফুরিত হইতেছিল ; নাসিকারন্ধ্র বর্দ্ধিতায়তন হইয়া কম্পিত

হইতেছিল। দন্তে অধর দংশন করিতেছিলেন। কতলু খাঁর সম্মুখে আনীত হইলে, কতলু খাঁ বীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ! তোমার অপরাধের দণ্ড করিব। তুমি কি জন্য আমার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলে ?"

বীরেন্দ্রসিংহ নিজ লোহিত-মূর্ত্তি-প্রকটিত ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে কোন্ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা অগ্রে আমাকে বল।"

এক জন পারিষদ কহিল, "বিনীত ভাবে কথা কহ।"

কতলু খাঁ বলিলেন, "কি জন্য আমার আদেশমত, আমাকে অর্থ আর সেনা পাঠাইতে অসম্মত হইয়াছিলে ?"

বীরেন্দ্রসিংহ অকুতোভয়ে কহিলেন, "তুমি রাজবিদ্রোহী দস্যু ; তোমাকে কেন অর্থ দিব ? তোমায় কি জন্য সেনা দিব ?"

দ্রষ্টৃবর্গ দেখিলেন, বীরেন্দ্র আপন মুণ্ড আপনি ছেদনে উদ্যত হইয়াছেন।

কতলু খাঁর ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি সহসা ক্রোধ সংবরণ করিবার ক্ষমতা অভ্যাসসিদ্ধ করিয়াছিলেন ; এজন্য কতক স্থিরভাবে কহিলেন, "তুমি আমার অধিকারে বসতি করিয়া, কেন মোগলের সহিত মিলন করিয়াছিলে ?"

বীরেন্দ্র কহিলেন, "তোমার অধিকার কোথা ?"

কতলু খাঁ আরও কুপিত হইয়া কহিলেন, "শোন্ দুরাত্মা! নিজ কর্ম্মোচিত ফল পাইবি। এখনও তোর জীবনের আশা ছিল, কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, নিজ দর্পে আপন বধের উদ্যোগ করিতেছিস্।"

বীরেন্দ্রসিংহ সগর্ব্বে হাস্য করিলেন ; কহিলেন, "কতলু খাঁ—আমি তোমার কাছে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, তখন দয়ার প্রত্যাশা করিয়া আসি নাই। তোমার তুল্য শত্রুর দয়ায় যার জীবন রক্ষা,—তাহার জীবনে প্রয়োজন ? তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম ; কিন্তু তুমি আমার পবিত্র কুলে কালি দিয়াছ ; তুমি আমার প্রাণের অধিক ধনকে—"

বীরেন্দ্রসিংহ আর বলিতে পারিলেন না ; স্বর বদ্ধ হইয়া গেল, চক্ষুঃ বাষ্পাকুল হইল, নির্ভীক গর্ব্বিত বীরেন্দ্রসিংহ অধোবদন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কতলু খাঁ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ; এত দূর নিষ্ঠুর যে, পরপীড়ায় তাঁহার উল্লাস জন্মিত। দাম্ভিক বৈরীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ! তুমি কি আমার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবে না ? বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার সময় নিকট।"

যে দুঃসহ সন্তাপাগ্নিতে বীরেন্দ্রের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, রোদন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ শমতা হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা স্থির ভাবে উত্তর করিলেন, "আর কিছুই চাহি না, কেবল এই ভিক্ষা যে, আমার বধ-কার্য্য শীঘ্র সমাপ্ত কর।"

ক। তাহাই হইবে, আর কিছু?

উত্তর। "এ জন্মে আর কিছু না।"

ক। মৃত্যুকালে তোমার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না?

এই প্রশ্ন শুনিয়া দ্রষ্টৃবর্গ পরিতাপে নিঃশব্দ হইল। বীরেন্দ্রের চক্ষে আবার উজ্জ্বলাগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

"যদি আমার কন্যা তোমার গৃহে জীবিতা থাকে, তবে সাক্ষাৎ করিব না। যদি মরিয়া থাকে, লইয়া আইস, কোলে করিয়া মরিব।"

দ্রষ্টৃবর্গ একেবারে নীরব, অগণিত লোক এতাদৃশ গভীর নিস্তব্ধ যে, সূচীপাত হইলে শব্দ শুনা যাইত। নবাবের ইঙ্গিত পাইয়া, রক্ষিবর্গ বীরেন্দ্রসিংহকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। তথায় উপনীত হইবার কিছু পূর্ব্বে এক জন মুসলমান বীরেন্দ্রের কাণে কাণে কি কহিল; বীরেন্দ্র তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মুসলমান তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। বীরেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে ঐ পত্র খুলিয়া দেখিলেন যে, বিমলার হস্তের লেখা। বীরেন্দ্র ঘোর বিরক্তির সহিত লিপি মর্দ্দিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। লিপি-বাহক লিপি তুলিয়া লইয়া গেল। নিকটস্থ কোন দর্শক বীরেন্দ্রের এই কর্ম্ম দেখিয়া অপরকে অনুচ্চৈঃস্বরে কহিল, "বুঝি কন্যার পত্র?"

কথা বীরেন্দ্রের কাণে গেল। সেই দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কে বলে আমার কন্যা? আমার কন্যা নাই।"

পত্রবাহক পত্র লইয়া গেল। রক্ষিবর্গকে কহিয়া গেল, "আমি যতক্ষণ প্রত্যাগমন না করি, ততক্ষণ বিলম্ব করিও।"

রক্ষিগণ কহিল, "যে আজ্ঞা প্রভো!"

স্বয়ং ওস্‌মান পত্রবাহক; এই জন্য রক্ষিবর্গ প্রভু-সম্বোধন করিল।

ওস্‌মান লিপিহস্তে অন্তঃপুর-প্রাচীর-মধ্যে গেলেন; তথায় এক বকুলবৃক্ষের অন্তরালে এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা আছে। ওস্‌মান তাহার সন্নিধানে গিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিবৃত করিলেন। অবগুণ্ঠনবতী কহিলেন, "আপনাকে বহু ক্লেশ দিতেছি, কিন্তু আপনা হইতেই আমাদের এ দশা ঘটিয়াছে। আপনাকে আমার এ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।"

ওস্‌মান নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অবগুণ্ঠনবতী মনঃপীড়া-বিকম্পিত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "না করেন—না করুন, আমরা এক্ষণে অনাথা ; কিন্তু জগদীশ্বর আছেন।"

ওস্‌মান কহিলেন, "মা! তুমি জান না যে, কি কঠিন কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ। কতলু খাঁ জানিতে পারিলে আমার প্রাণান্ত করিবে।"

স্ত্রী কহিল, "কতলু খাঁ? আমাকে কেন প্রবঞ্চনা কর? কতলু খাঁর সাধ্য নাই যে, তোমার কেশ স্পর্শ করে।"

ও। কতলু খাঁকে চেন না।—কিন্তু চল, আমি তোমাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইব।

ওস্‌মানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবগুণ্ঠনবতী বধ্যভূমিতে গিয়া নিস্তব্ধে দণ্ডায়মানা হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে না দেখিয়া এক জন ভিখারীর বেশধারী ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে দেখিলেন, ভিখারী অভিরাম স্বামী।

বীরেন্দ্র অভিরাম স্বামীকে কহিলেন, "গুরুদেব! তবে বিদায় হইলাম। আমি আর আপনাকে কি বলিয়া যাইব? ইহলোকে আমার কিছু প্রার্থনীয় নাই; কাহার জন্য প্রার্থনা করিব?"

অভিরাম স্বামী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা পশ্চাদ্বর্ত্তিনী অবগুণ্ঠনবতীকে দেখাইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন; অমনি রমণী অবগুণ্ঠন দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরেন্দ্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ পদতলে অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র গদগদ স্বরে ডাকিলেন, "বিমলা!"

"স্বামী! প্রভু! প্রাণেশ্বর!" বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে বিমলা কহিতে লাগিলেন, "আজ আমি জগৎসমীপে বলিব, কে নিবারণ করিবে? স্বামী! কণ্ঠরত্ন! কোথা যাও! আমাদের কোথা রাখিয়া যাও!"

বীরেন্দ্রসিংহের চক্ষে দরদর অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। হস্ত ধরিয়া বিমলাকে বলিলেন, "বিমলা! প্রিয়তমে! এ সময়ে কেন আমায় রোদন করাও! শত্রুরা দেখিলে আমায় মরণে ভীত মনে করিবে।"

বিমলা নিস্তব্ধ হইলেন। বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "বিমলে! আমি যাই, তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস।"

বিমলা কহিলেন, "যাইব।"

আর কেহ না শুনিতে পায় এমত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "যাইব, কিন্তু আগে এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিব।"

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপবৎ বীরেন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল— কহিলেন, "পারিবে ?"

বিমলা দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন, "এই হস্তে! এই হস্তের স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম; আর কাজ কি!" বলিয়া কঙ্কণাদি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "শাণিত লৌহ ভিন্ন এ হস্তে অলঙ্কার আর ধরিব না।"

বীরেন্দ্র হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "তুমি পারিবে, জগদীশ্বর তোমার মনস্কামনা সফল করুন।"

জল্লাদ ডাকিয়া কহিল, "আর বিলম্ব করিতে পারি না।"

বীরেন্দ্র বিমলাকে কহিলেন, "আর কি ? তুমি এখন যাও।"

বিমলা কহিলেন, "না, আমার সম্মুখেই আমার বৈধব্য ঘটুক। তোমার রুধিরে মনের সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিব।" বিমলার স্বর ভয়ঙ্কর স্থির।

"তাহাই হউক," বলিয়া বীরেন্দ্রসিংহ জল্লাদকে ইঙ্গিত করিলেন। বিমলা দেখিতে পাইলেন, উর্দ্ধোত্থিত কুঠার সূর্য্যতেজে প্রদীপ্ত হইল; তাঁহার নয়ন-পল্লব মুহূর্ত্ত জন্য আপনি মুদ্রিত হইল; পুনরুন্মীলন করিয়া দেখেন, বীরেন্দ্রসিংহের ছিন্ন শির রুধির-সিক্ত ধূলিতে অবলুণ্ঠন করিতেছে।

বিমলা প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মানা রহিলেন, মস্তকের একটি কেশ বাতাসে ছুলিতেছে না। এক বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে না। চক্ষুর পলক নাই, একদৃষ্টে ছিন্ন শির প্রতি চাহিয়া আছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিধবা

তিলোত্তমা কোথায় ? পিতৃহীনা, অনাথিনী বালিকা কোথায় ? বিমলাই বা কোথায় ? কোথা হইতে বিমলা স্বামীর বধ্যভূমিতে আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন ? তাহার পরই আবার কোথায় গেলেন ?

কেন বীরেন্দ্রসিংহ মৃত্যুকালে প্রিয়তমা কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না ? কেনই বা নামমাত্রে হুতাশনবৎ প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন ? কেন বলিয়াছেন, "আমার কন্যা নাই ?"

কেন বিমলার পত্র বিনা পাঠে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ?

কেন ? কতলু খাঁর প্রতি বীরেন্দ্রের তিরস্কার স্মরণ করিয়া দেখ, কি ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে।

"পবিত্র কুলে কালি পড়িয়াছে" এই কথা বলিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিয়াছিল।

তিলোত্তমা আর বিমলা কোথায়, জিজ্ঞাসা কর? কতলু খাঁর উপপত্নীদিগের আবাসগৃহে সন্ধান কর, দেখা পাইবে।

সংসারের এই গতি! অদৃষ্টচক্রের এমনি নিদারুণ আবর্ত্তন! রূপ, যৌবন, সরলতা, অমলতা, সকলই নেমির পেষণে দলিত হইয়া যায়!

কতলু খাঁর এই নিয়ম ছিল যে, কোন দুর্গ বা গ্রাম জয় হইলে, তন্মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট সুন্দরী যদি বন্দী হইত, তবে সে তাঁহার আত্মসেবার জন্য প্রেরিত হইত। গড় মান্দারণ জয়ের পরদিবস, কতলু খাঁ তথায় উপনীত হইয়া বন্দীদিগের প্রতি যথা-বিহিত বিধান ও ভবিষ্যতে দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ পক্ষে সৈন্য নিয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে নিযুক্ত হইলেন। বন্দীদিগের মধ্যে বিমলা ও তিলোত্তমাকে দেখিবামাত্র নিজ বিলাসগৃহ সাজাইবার জন্য তাহাদিগকে পাঠাইলেন। তৎপরে অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এমন শ্রুত ছিলেন যে, রাজপুত সেনা জগৎসিংহের বন্ধন শুনিয়া নিকটে কোথাও আক্রমণের উদ্যোগে আছে; অতএব তাহাদিগের পরাঙ্মুখ করিবার জন্য উচিত ব্যবস্থা বিধানাদিতে ব্যাপৃত ছিলেন, এজন্য এ পর্য্যন্ত কতলু খাঁ নূতন দাসীদিগের সঙ্গসুখলাভ করিতে অবকাশ পান নাই।

বিমলা ও তিলোত্তমা পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে রক্ষিত হইয়াছিলেন। যথায় পিতৃহীনা নবীনার ধূলি-ধূসরা দেহলতা ধরাতলে পড়িয়া আছে, পাঠক! তথায় নেত্রপাত করিয়া কাজ নাই। কাজ কি? তিলোত্তমা প্রতি কে আর এখন নেত্রপাত করিতেছে? মধূদয়ে নববল্লরী যখন মন্দ-বায়ু-হিল্লোলে বিধূত হইতে থাকে, কে না তখন সুবাসাশয়ে সাদরে তাহার কাছে দণ্ডায়মান হয়? আর যখন নৈদাঘ ঝটিকাতে অবলম্বিত বৃক্ষ সহিত সে ভূতলশায়িনী হয়, তখন উন্মূলিত পদার্থরাশি মধ্যে বৃক্ষ ছাড়িয়া কে লতা দৃষ্টি করে? কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটিয়া লইয়া যায়, লতাকে পদতলে দলিত করে মাত্র।

চল, তিলোত্তমাকে রাখিয়া অন্যত্র যাই। যথায় চঞ্চলা, চতুরা, রসপ্রিয়া, রসিকা বিমলার পরিবর্ত্তে গম্ভীরা, অনুতাপিতা, মলিনা বিধবা চক্ষে অঞ্চল দিয়া বসিয়া আছে, তথায় যাই।

এই কি বিমলা? তাহার সে কেশবিন্যাস নাই। মাথায় ধূলিরাশি; সে কারু-কার্য্য-খচিত ওড়না নাই; সে রত্ন-খচিত কাঁচলি নাই; বসন বড় মলিন। পরিধানে জীর্ণ, ক্ষুদ্র বসন। সে অলঙ্কার-ভার কোথায়? সে অংসসংস্পর্শলোভী কর্ণাভরণ কোথায়? চক্ষু ফুলিয়াছে কেন? সে কটাক্ষ কই? কপালে ক্ষত কেন? রুধির যে বাহিত হইতেছে!

বিমলা ওস্‌মানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ওস্‌মান পাঠানকুলতিলক। যুদ্ধ তাঁহার স্বার্থসাধন ও নিজ ব্যবসায় এবং ধর্ম্ম; সুতরাং যুদ্ধজয়ার্থ ওস্‌মান কোন কার্য্যেই সঙ্কোচ করিতেন না। কিন্তু যুদ্ধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পরাজিত পক্ষের প্রতি কদাচিৎ নিষ্প্রয়োজনে তিলার্দ্ধ অত্যাচার করিতে দিতেন না। যদি কতলু খাঁ স্বয়ং বিমলা, তিলোত্তমার অদৃষ্টে এ দারুণ বিধান না করিতেন, তবে ওস্‌মানের কৃপায় তাঁহারা কদাচ বন্দী থাকিতেন না। তাঁহারই অনুকম্পায় স্বামীর মৃত্যুকালে বিমলা তৎসাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। পরে যখন ওস্‌মান জানিতে পারিলেন যে, বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের স্ত্রী, তখন তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত আরও আর্দ্রীভূত হইল। ওস্‌মান কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র,* এজন্য অন্তঃপুরেও কোথাও তাঁহার গমনে বারণ ছিল না, ইহা পূর্ব্বেই দৃষ্ট হইয়াছে। যে বিহারগৃহে কতলু খাঁর উপপত্নীসমূহ থাকিত, সে স্থলে কতলু খাঁর পুত্রেরাও যাইতে পারিতেন না, ওস্‌মানও নহে। কিন্তু ওস্‌মান কতলু খাঁর দক্ষিণ হস্ত, ওস্‌মানের বাহুবলেই তিনি আমোদরতীর পর্যন্ত উৎকল অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং পৌরজন প্রায় কতলু খাঁর যাদৃশ, ওস্‌মানের তাদৃশ বাধ্য ছিল। এজন্যই অদ্য প্রাতে বিমলার প্রার্থনানুসারে, চরমকালে তাঁহার স্বামিসন্দর্শন ঘটিয়াছিল।

বৈধব্য-ঘটনার দুই দিবস পরে বিমলার যে কিছু অলঙ্কারাদি অবশিষ্ট ছিল, তৎসমুদায় লইয়া তিনি কতলু খাঁর নিয়োজিত দাসীকে দিলেন। দাসী কহিল, "আমায় কি আজ্ঞা করিতেছেন?"

বিমলা কহিলেন, "তুমি যেরূপ কা'ল ওস্‌মানের নিকট গিয়াছিলে, সেইরূপ আর একবার যাও; কহিও যে, আমি তাঁহার নিকট আর একবার সাক্ষাতের প্রার্থিতা; বলিও এই শেষ, আর তৃতীয় বার ভিক্ষা করিব না।"

দাসী সেইরূপ করিল। ওস্‌মান বলিয়া পাঠাইলেন, "সে মহাল মধ্যে আমার যাতায়াতে উভয়েরই সঙ্কট; তাঁহাকে আমার আবাসমন্দিরে আসিতে কহিও।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যাই কি প্রকারে?" দাসী কহিল, "তিনি কহিয়াছেন যে, তিনি তাহার উপায় করিয়া দিবেন।"

সন্ধ্যার পর আয়েষার এক জন দাসী আসিয়া অন্তঃপুররক্ষী খোজাদিগের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিয়া বিমলাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ওস্‌মানের নিকট লইয়া গেল।

ওস্‌মান কহিলেন, "আর তোমার কোন অংশে উপকার করিতে পারি?" বিমলা কহিলেন, "অতি সামান্য কথামাত্র; রাজপুতকুমার জগৎসিংহ কি জীবিত আছেন?"

ও। জীবিত আছেন।

* ইতিহাসে লেখে পুত্র।

বি। স্বাধীন আছেন কি বন্দী হইয়াছেন ?

ও। বন্দী বটে, কিন্তু আপাততঃ কারাগারে নহে। তাঁহার অঙ্গের অস্ত্রক্ষতের হেতু পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছেন। কতলু খাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অন্তঃপুরেই রাখিয়াছি। সেখানে বিশেষ যত্ন হইবে বলিয়া রাখিয়াছি।

বিমলা শুনিয়া বলিলেন, "এ অভাগিনীদিগের সম্পর্কমাত্রেই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। সে সকল দেবতাকৃত। এক্ষণে যদি রাজপুত্র পুনর্জ্জীবিত হয়েন, তবে তাঁহার আরোগ্যপ্রাপ্তির পর, এই পত্রখানি তাঁহাকে দিবেন ; আপাততঃ আপনার নিকট রাখিবেন। এইমাত্র আমার ভিক্ষা।"

ওস্‌মান লিপি প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "ইহা আমার অনুচিত কার্য্য ; রাজপুত্র যে অবস্থাতেই থাকুন, তিনি বন্দী বলিয়া গণ্য। বন্দীদিগের নিকট কোন লিপি আমরা নিজে পাঠ না করিয়া যাইতে দেওয়া অবৈধ, এবং আমার প্রভুর আদেশবিরুদ্ধ।"

বিমলা কহিলেন, "এ লিপির মধ্যে আপনাদিগের অনিষ্টকারক কোন কথাই নাই, সুতরাং অবৈধ কার্য্য হইবে না। আর প্রভুর আদেশ ? আপনি আপন প্রভু।"

ওস্‌মান কহিলেন, "অন্যান্য বিষয়ে আমি পিতৃব্যের আদেশবিরুদ্ধ আচরণ কখন করিতে পারি, কিন্তু এ সকল বিষয়ে নহে। আপনি যখন কহিতেছেন যে, এই লিপি-মধ্যে বিরুদ্ধ কথা নাই, তখন সেইরূপই আমার প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু এ বিষয়ে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি না। আমা হইতে এ কার্য্য হইবে না।"

বিমলা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আপনি পাঠ করিয়াই দিবেন।"

ওস্‌মান লিপি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিমলার পত্র

"যুবরাজ! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, এক দিন আপনার পরিচয় দিব। এখন তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ভরসা করিয়াছিলাম, আমার তিলোত্তমা অম্বরের সিংহাসনারূঢ়া হইলে পরিচয় দিব। সে সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়াছে। বোধ করি যে, কিছু দিন মধ্যে শুনিতে পাইবেন, এ পৃথিবীতে তিলোত্তমা কেহ নাই, বিমলা কেহ নাই। আমাদিগের পরমায়ু শেষ হইয়াছে।

এই জন্যই এখন আপনাকে এ পত্র লিখিতেছি। আমি মহাপাপীয়সী বহুবিধ অবৈধ কার্য্য করিয়াছি, আমি মরিলে লোকে নিন্দা করিবে, কত মত কদর্য্য কথা বলিবে, কে তখন আমার ঘৃণিত নাম হইতে কলঙ্কের কালি মুছাইয়া তুলিবে? এমন সুহৃদ্ কে আছে?

এক সুহৃদ্ আছেন, তিনি অচিরাৎ লোকালয় ত্যাগ করিয়া তপস্যায় প্রস্থান করিবেন। অভিরাম স্বামী হইতে দাসীর কার্য্যোদ্ধার হইবে না। রাজকুমার! এক দিনের তরেও আমি ভরসা করিয়াছিলাম, আমি আপনার আত্মীয়জনমধ্যে গণ্যা হইব। এক দিনের তরে আপনি আমার আত্মীয়জনের কর্ম্ম করুন। কাহাকেই বা এ কথা বলিতেছি? অভাগিনীদিগের মন্দ ভাগ্য অগ্নিশিখাবৎ, যে বন্ধু নিকটে ছিলেন, তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছে। যাহাই হউক, দাসীর এই ভিক্ষা স্মরণ রাখিবেন। যখন লোকে বলিবে বিমলা কুলটা ছিল, দাসী বেশে গণিকা ছিল, তখন কহিবেন, বিমলা নীচ-জাতি-সম্ভবা, বিমলা মন্দভাগিনী, বিমলা দুঃশাসিত রসনা-দোষে শত অপরাধে অপরাধিনী; কিন্তু বিমলা গণিকা নহে। যিনি এখন স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তিনি বিমলার অদৃষ্ট-প্রসাদে যথাশাস্ত্র তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিমলা এক দিনের তরে নিজ প্রভুর নিকটে বিশ্বাস-ঘাতিনী নহে।

এত দিন এ কথা প্রকাশ ছিল না, আজ কে বিশ্বাস করিবে? কেনই বা পত্নী হইয়া দাসীবৎ ছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন—

গড় মান্দারণের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের বাস। শশিশেখর কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্র; যৌবনকালে যথারীতি বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যয়নে স্বভাবদোষ দূর হয় না। জগদীশ্বর শশিশেখরকে সর্ব্বপ্রকার গুণ দান করিয়াও এক দোষ প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন, সে যৌবনকালের প্রবল দোষ।

গড় মান্দারণে জয়ধরসিংহের কোন অনুচরের বংশে একটি পতিবিরহিণী রমণী ছিল। তাহার সৌন্দর্য্য অলৌকিক। তাহার স্বামী রাজসেনামধ্যে সিপাহি ছিল, এজন্য বহুদিন দেশত্যাগী। সেই সুন্দরী শশিশেখরের নয়নপথের পথিক হইল। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ঔরসে পতিবিরহিতার গর্ভসঞ্চার হইল।

অগ্নি আর পাপ অধিক দিন গোপনে থাকে না। শশিশেখরের দুষ্কৃতি তাঁহার পিতৃকর্ণে উঠিল। পুত্র-কৃত পরকুল-কলঙ্ক অপনীত করিবার জন্য শশিশেখরের পিতা সংবাদ লিখিয়া গর্ব্ভবতীর স্বামীকে ত্বরিত গৃহে আনাইলেন। অপরাধী পুত্রকে বহুবিধ ভর্ৎসনা করিলেন। কলঙ্কিত হইয়া শশিশেখর দেশত্যাগী হইলেন।

শশিশেখর পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন, তথায় কোন সর্ব্ববিৎ দণ্ডীর বিদ্যার খ্যাতি শ্রুত হইয়া, তাঁহার নিকট অধ্যয়নারম্ভ করিলেন। বুদ্ধি অতি

তীক্ষ্ণ ; দর্শনাদিতে অত্যন্ত সুপটু হইলেন, জ্যোতিষে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায় হইয়া উঠিলেন। অধ্যাপক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

শশিশেখর এক জন শূদ্রীর গৃহের নিকটে বাস করিতেন। শূদ্রীর এক নবযুবতী কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণে ভক্তিপ্রযুক্ত যুবতী আহারীয় আয়োজন প্রভৃতি শশিশেখরের গৃহকার্য্য সম্পাদন করিয়া দিত। মাতৃপিতৃদুষ্কৃতিভারে আবরণ নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। অধিক কি কহিব, শূদ্রীকন্যার গর্ভে শশিশেখরের ঔরসে এ অভাগিনীর জন্ম হইল।

শ্রবণমাত্র অধ্যাপক ছাত্রকে কহিলেন, 'শিষ্য! আমার নিকট দুষ্কর্ম্মান্বিতের অধ্যয়ন হইতে পারে না। তুমি আর কাশীধামে মুখ দেখাইও না।'

শশিশেখর লজ্জিত হইয়া কাশীধাম হইতে প্রস্থান করিলেন।

মাতাকে মাতামহ দুশ্চারিণী বলিয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

দুঃখিনী মাতা আমাকে লইয়া এক কুটীরে রহিলেন। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবন-ধারণ করিতেন ; কেহ দুঃখিনীর প্রতি ফিরিয়া চাহিত না। পিতারও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পরে, শীতকালে এক জন আঢ্য পাঠান বঙ্গদেশ হইতে দিল্লী নগরে গমনকালে কাশীধাম দিয়া যান। অধিক রাত্রিতে নগরে উপস্থিত হইয়া রাত্রিতে থাকিবার স্থান পান না ; তাঁহার সঙ্গে বিবি ও একটি নবকুমার। তাঁহারা মাতার কুটীরসন্নিধানে আসিয়া কুটীরমধ্যে নিশাযাপনের প্রার্থনা জানাইয়া কহিলেন, 'এ রাত্রে হিন্দুপল্লীমধ্যে কেহ আমাকে স্থান দিল না। এখন আমরা এ বালকটিকে লইয়া আর কোথা যাইব ? ইহার হিম সহ্য হইবে না। আমার সহিত অধিক লোক জন নাই, কুটীরমধ্যে অনায়াসে স্থান হইবে। আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিব।' বস্তুতঃ পাঠান বিশেষ প্রয়োজনে ত্বরিতগমনে দিল্লী যাইতেছিলেন ; তাঁহার সহিত একমাত্র ভৃত্য ছিল। মাতা দরিদ্রও বটে ; সদয়চিত্তও বটে ; ধনলোভেই হউক বা বালকের প্রতি দয়া করিয়াই হউক, পাঠানকে কুটীরমধ্যে স্থান দিলেন। পাঠান স-স্ত্রী-সন্তান নিশাযাপনার্থ কুটীরের এক ভাগে প্রদীপ জ্বালিয়া শয়ন করিল—দ্বিতীয় ভাগে আমরা শয়ন করিলাম।

ঐ সময়ে কাশীধামে অত্যন্ত বালকচোরের ভয় প্রবল হইয়াছিল। আমি তখন ছয় বৎসরের বালিকামাত্র, আমি সকল স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। মাতার নিকটে যেরূপ যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।

নিশীথে প্রদীপ জ্বলিতেছিল ; এক জন চোর পর্ণকুটীরমধ্যে সিঁদ দিয়া পাঠানের বালকটি অপহরণ করিয়া যাইতেছিল ; আমার তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল ; আমি চোরের কার্য্য দেখিতে পাইয়াছিলাম। চোর বালক লইয়া যায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। আমার চীৎকারে সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল।

পাঠানের স্ত্রী দেখিলেন, বালক শয্যায় নাই। একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। চোর তখন বালক লইয়া শয্যাতলে লুক্কায়িত হইয়াছিল। পাঠান তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া আনিয়া বালক কাড়িয়া লইলেন। চোর বিস্তর অনুনয় বিনয় করাতে অসি দ্বারা কর্ণচ্ছেদ মাত্র করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।"

এই পর্য্যন্ত লিপি পাঠ করিয়া ওস্‌মান অন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে বিমলাকে কহিলেন, "তোমার কখন কি অন্য কোন নাম ছিল না?"

বিমলা কহিলেন, "ছিল। সে যাবনিক নাম বলিয়া পিতা নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।"

"কি সে নাম? মাহরু?"

বিমলা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমিই সেই অপহৃত বালক।"

বিমলা বিস্মিত হইলেন। ওস্‌মান পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিলেন।

"পরদিন প্রাতে পাঠান বিদায় কালে মাতাকে কহিলেন, 'তোমার কন্যা আমার যে উপকার করিয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রত্যুপকার করি, এমত সাধ্য নাই; কিন্তু তোমার যে কিছুতে অভিলাষ থাকে, আমাকে কহ; আমি দিল্লী যাইতেছি, তথা হইতে আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু পাঠাইয়া দিব। অর্থ চাহ, তাহাও পাঠাইয়া দিব।'

মাতা কহিলেন, 'আমার ধনে প্রয়োজন নাই। আমি নিজ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান করি, তবে যদি বাদশাহের নিকট আপনার প্রতিপত্তি থাকে,—'

এই সমস্ত কথা হইতে না হইতে পাঠান কহিলেন, 'যথেষ্ট আছে। আমি রাজদরবারে তোমার উপকার করিতে পারি।'

মাতা কহিলেন, 'তবে এই বালিকার পিতার অনুসন্ধান করাইয়া আমাকে সংবাদ দিবেন।'

পাঠান প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। মাতার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দিলেন; মাতা তাহা গ্রহণ করিলেন না। পাঠান নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজপুরুষদিগকে পিতার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অনুসন্ধান পাওয়া গেল না।

ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রাজপুরুষেরা পিতার সন্ধান পাইয়া পূর্ব্বপ্রচারিত রাজাজ্ঞানুসারে মাতাকে সংবাদলিপি পাঠাইলেন। পিতা দিল্লীতে ছিলেন। শশিশেখর ভট্টাচার্য্য নাম ত্যাগ করিয়া অভিরাম স্বামী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। যখন এই সংবাদ আসিল, তখন মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রপূতি ব্যতীত যাহার পাণিগ্রহণ হইয়াছে, তাহার যদি স্বর্গারোহণে অধিকার থাকে, তবে মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

পিতৃসংবাদ পাইলে আর কাশীধামে আমার মন তিষ্ঠিল না। সংসার মধ্যে কেবল আমার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি যদি দিল্লীতে, তবে আমি আর কাহার জন্য কাশীতে থাকি, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি একাকিনী পিতৃদর্শনে যাত্রা করিলাম। পিতা আমার গমনে প্রথমে রুষ্ট হইলেন, কিন্তু আমি বহুতর রোদন করায় আমাকে তাঁহার সেবার্থ নিকটে থাকিতে অনুমতি করিলেন। মাহরু নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিমলা নাম রাখিলেন। আমি পিত্রালয়ে থাকিয়া পিতার সেবায় বিধিমতে মনোভিনিবেশ করিলাম; তাঁহার যাহাতে তুষ্টি জন্মে, তাহাতে যত্ন করিতে লাগিলাম। স্বার্থসিদ্ধি কিম্বা পিতার স্নেহের আকাঙ্ক্ষায় এইরূপ করিতাম, তাহা নহে; বস্তুতঃ পিতৃসেবায় আমার আন্তরিক আনন্দ জন্মিত; পিতা ব্যতীত আমার আর কেহ ছিল না। মনে করিতাম, পিতৃসেবা অপেক্ষা আর সুখ সংসারে নাই। পিতাও আমার ভক্তি দেখিয়াই হউক বা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ গুণবশতঃই হউক, আমাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। স্নেহ সমুদ্রমুখী নদীর ন্যায়; যত প্রবাহিত হয়, তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যখন আমার সুখবাসর প্রভাত হইল, তখন জানিতে পারিয়াছিলাম যে, পিতা আমাকে কত ভালবাসিতেন।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিমলার পত্র সমাপ্ত

“আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গড় মান্দারণের কোন দরিদ্রা রমণী আমার পিতার ঔরসে গর্ভবতী হয়েন। আমার মাতার যেরূপ অদৃষ্টলিপির ফল, ইঁহারও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। ইঁহার গর্ভেও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, এবং কন্যার মাতা অচিরাৎ বিধবা হইলে, তিনি আমার মাতার ন্যায়, নিজ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া কন্যা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বিধাতার এমত নিয়ম নহে যে, যেমন আকর, তদুপযুক্ত সামগ্রীরই উৎপত্তি হইবে। পর্ব্বতের পাষাণেও কোমল কুসুমলতা জন্মে; অন্ধকার খনিমধ্যেও উজ্জ্বল রত্ন জন্মে। দরিদ্রের ঘরেও অদ্ভুত সুন্দরী কন্যা জন্মিল। বিধবার কন্যা গড় মান্দারণ গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া পরিগণিতা হইতে লাগিলেন। কালে সকলেরই লয়; কালে বিধবার কলঙ্কেরও লয় হইল। বিধবার সুন্দরী কন্যা যে জারজা, এ কথা অনেকে বিস্মৃত হইল। অনেকে জানিত না। দুর্গমধ্যে প্রায় এ কথা কেহই জানিত না। আর অধিক কি বলিব? সেই সুন্দরী তিলোত্তমার গর্ভধারিণী হইলেন।

তিলোত্তমা যখন মাতৃগর্ব্ভে, তখন এই বিবাহ কারণেই আমার জীবনমধ্যে প্রধান ঘটনা ঘটিল। সেই সময়ে এক দিন পিতা তাঁহার জামাতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া আশ্রমে আসিলেন। আমার নিকট মন্ত্রশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, স্বর্গীয় প্রভুর নিকট প্রকৃত পরিচয় পাইলাম।

যে অবধি তাঁহাকে দেখিলাম, সেই অবধি আপন চিত্ত পরের হইল। কিন্তু কি বলিয়াই বা সে সব কথা আপনাকে বলি? বীরেন্দ্রসিংহ বিবাহ ভিন্ন আমাকে লাভ করিতে পারিবেন না বুঝিলেন। পিতাও সকল বৃত্তান্ত অনুভবে জানিতে পারিলেন; এক দিন উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইলাম।

পিতা কহিলেন, 'আমি বিমলাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও থাকিতে পারিব না। কিন্তু বিমলা যদি তোমার ধর্ম্মপত্নী হয়, তবে আমি তোমার নিকটে থাকিব। আর যদি তোমার সে অভিপ্রায় না থাকে—'

পিতার কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই স্বর্গীয় দেব কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'ঠাকুর! শূদ্রী-কন্যাকে কি প্রকারে বিবাহ করিব?'

পিতা শ্লেষ করিয়া কহিলেন, 'জারজা কন্যাকে বিবাহ করিলে কি প্রকারে?'

প্রাণেশ্বর কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, 'যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন জানিতাম না যে, সে জারজা। জানিয়া শুনিয়া শূদ্রীকে কি প্রকারে বিবাহ করিব? আর আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা জারজা হইলেও শূদ্রী নহে।'

পিতা কহিলেন, 'তুমি বিবাহে অস্বীকৃত হইলে, উত্তম। তোমার যাতায়াতে বিমলার অনিষ্ট ঘটিতেছে, তোমার আর এ আশ্রমে আসিবার প্রয়োজন করে না। তোমার গৃহেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবেক!'

সে অবধিই তিনি কিয়দ্দিবস যাতায়াত ত্যাগ করিলেন। আমি চাতকীর ন্যায় প্রতিদিবস তাঁহার আগমন প্রত্যাশা করিতাম; কিন্তু কিছু কাল আশা নিষ্ফল হইতে লাগিল। বোধ করি, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এজন্য পুনর্ব্বার তাঁহার দর্শন পাইয়া আর তত লজ্জাশীলা রহিলাম না। পিতা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। এক দিন আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'আমি অনাশ্রম-ব্রত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি; চিরদিন আমার কন্যার সহ বাস ঘটিবেক না। আমি স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিতে যাইব, তুমি তখন কোথায় থাকিবে?'

আমি পিতার বিরহাশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। কহিলাম, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। না হয়, যেরূপ কাশীধামে একাকিনী ছিলাম, এখানেও সেইরূপ থাকিব।'

পিতা কহিলেন, 'না বিমলে! আমি তদপেক্ষা উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছি। আমার অনবস্থানকালে তোমার সুরক্ষক বিধান করিব। তুমি মহারাজ মানসিংহের নবোঢ়া মহিষীর সাহচর্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।'

আমি কাঁদিয়া কহিলাম, 'তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না।' পিতা কহিলেন, 'না, আমি এক্ষণে কোথাও যাইব না। তুমি এখন মানসিংহের গৃহে যাও। আমি এখানেই রহিলাম; প্রত্যহই তোমাকে দেখিয়া আসিব। তুমি তথায় কিরূপ থাক, তাহা বুঝিয়া কর্ত্তব্য বিধান করিব।'

যুবরাজ! আমি তোমাদিগের গৃহে পুরাঙ্গনা হইলাম। কৌশলে পিতা আমাকে নিজ জামাতার চক্ষুঃপথ হইতে দূর করিলেন।

যুবরাজ! আমি তোমার পিতৃভবনে অনেক দিন পৌরস্ত্রী হইয়া ছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে চেন না। তুমি তখন দশমবর্ষীয় বালক মাত্র, অম্বরের রাজবাটীতে মাতৃ-সন্নিধানে থাকিতে, আমি তোমার (নবোঢ়া) বিমাতার সাহচর্য্যে দিল্লীতে নিযুক্ত থাকিতাম। কুসুমের মালার তুল্য মহারাজ মানসিংহের কণ্ঠে অগণিতসংখ্যা রমণীরাজি গ্রথিত থাকিত; তুমি কি তোমার বিমাতা সকলকেই চিনিতে? যোধপুরসম্ভূতা উর্ম্মিলা দেবীকে তোমার স্মরণ হইবে? উর্ম্মিলার গুণ তোমার নিকট কত পরিচয় দিব? তিনি আমাকে সহচারিণী দাসী বলিয়া জানিতেন না; আমাকে প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় জানিতেন। তিনি আমারে সযত্নে নানা বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরূঢ় করিয়া দিলেন। তাঁহারই অনুকম্পায় শিল্পকার্য্যাদি শিখিলাম। তাঁহারই মনোরঞ্জনার্থে নৃত্যগীত শিখিলাম। তিনি আমাকে স্বয়ং লেখা পড়া শিখাইলেন। এই যে কদক্ষরসম্বদ্ধ পত্রী তোমার নিকট পাঠাইতে সক্ষম হইতেছি, ইহা কেবল তোমার বিমাতা উর্ম্মিলা দেবীর অনুকম্পায়।

সখী উর্ম্মিলার কৃপায় আরও গুরুতর লাভ হইল। তিনি নিজ প্রীতিচক্ষে আমাকে যেমন দেখিতেন, মহারাজের নিকট সেইরূপ পরিচয় দিতেন। আমার সঙ্গীতাদিতে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল; তদ্দর্শন শ্রবণেও মহারাজের প্রীতি জন্মিত। যে কারণেই হউক, মহারাজ মানসিংহ আমাকে নিজ পরিবারস্থার ন্যায় ভাবিতেন। তিনি আমার পিতাকে ভক্তি করিতেন; পিতা সর্ব্বদা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।

উর্ম্মিলা দেবীর নিকট আমি সর্ব্বাংশে সুখী ছিলাম। কেবল এক মাত্র পরিতাপ যে, যাঁহার জন্য ধর্ম্ম ভিন্ন সর্ব্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত ছিলাম, তাঁহার দর্শন পাইতাম না। তিনিই কি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন? তাহা নহে। যুবরাজ! আশ্‌মানি নাম্নী পরিচারিকাকে কি আপনার স্মরণ হয়? হইতেও পারে। আশ্‌মানির সহিত আমার বিশেষ সম্প্রীতি ঘটিল; আমি তাহাকে প্রভুর সংবাদ আনিতে পাঠাইলাম। সে তাঁহার

অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে আমার সংবাদ দিয়া আসিল। প্রত্যুত্তরে তিনি আমাকে কত কথা কহিয়া পাঠাইলেন, তাহা কি বলিব ? আমি আশ্‌মানির হস্তে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম, তিনিও তাহার প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঘটিতে লাগিল। এই প্রকার অদর্শনেও পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

এই প্রণালীতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। যখন তিন বৎসরের বিচ্ছেদেও পরস্পর বিস্মৃত হইলাম না, তখন উভয়েই বুঝিলাম যে, এ প্রণয় শৈবালপুষ্পের ন্যায় কেবল উপরে ভাসমান নহে, পদ্মের ন্যায় ভিতরে বদ্ধমূল। কি কারণে বলিতে পারি না, এই সময়ে তাঁহারও ধৈর্য্যাবশেষ হইল। এক দিন তিনি বিপরীত ঘটাইলেন। নিশাকালে একাকিনী শয়নকক্ষে শয়ন করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্তিমিত দীপালোকে দেখিলাম, শিওরে এক জন মনুষ্য।

মধুর শব্দে আমার কর্ণরন্ধ্রে এই বাক্য প্রবেশ করিল যে, 'প্রাণেশ্বরী! ভয় পাইও না। আমি তোমারই একান্ত দাস।'

আমি কি উত্তর দিব ? তিন বৎসরের পর সাক্ষাৎ। সকল কথা ভুলিয়া গেলাম—তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। শীঘ্র মরিব, তাই আর আমার লজ্জা নাই—সকল কথা বলিতে পারিতেছি।

যখন আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কেমন করিয়া এ পুরীর মধ্যে আসিলে ?'

তিনি কহিলেন, 'আশ্‌মানিকে জিজ্ঞাসা কর; তাহার সমভিব্যাহারে বারিবাহক দাস সাজিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম; সেই পর্য্যন্ত লুক্কায়িত আছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখন ?'

তিনি কহিলেন, 'আর কি ? তুমি যাহা কর।'

আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, কি করি ? কোন্ দিক্ রাখি ? চিত্ত যে দিকে লয়, সেই দিকে মতি হইতে লাগিল। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ আমার শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। সম্মুখে দেখি, মহারাজ মানসিংহ!

বিস্তারে আবশ্যক কি ? বীরেন্দ্রসিংহ কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। মহারাজ এরূপ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। আমার হৃদয়মধ্যে কিরূপ হইতে লাগিল, তাহা বোধ করি বুঝিতে পারিবেন। আমি কান্দিয়া উর্ম্মিলা দেবীর পদতলে পড়িলাম, আত্মদোষ সকল ব্যক্ত করিলাম; সকল দোষ আপনার স্কন্ধে স্বীকার করিয়া লইলাম। পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারও চরণে লুণ্ঠিত হইলাম। মহারাজ তাঁহাকে ভক্তি করেন; তাঁহাকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করেন; অবশ্য তাঁহার অনুরোধ রক্ষা

করিবেন। কহিলাম, 'আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে স্মরণ করুন।' বোধ করি, পিতা মহারাজের সহিত একত্র যুক্তি করিয়াছিলেন। তিনি আমার রোদনে কর্ণপাতও করিলেন না। রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'পাপীয়সি! তুই একেবারে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছিস্!'

উর্ম্মিলা দেবী আমার প্রাণরক্ষার্থ মহারাজের নিকট বহুবিধ কহিলেন, মহারাজ কহিলেন, 'আমি তবে চোরকে মুক্ত করি, সে যদি বিমলাকে বিবাহ করে।'

আমি তখন মহারাজের অভিসন্ধি বুঝিয়া নিঃশব্দ হইলাম। প্রাণেশ্বর মহারাজের বাক্যে বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'আমি যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিব, সেও ভাল; প্রাণদণ্ড দিব, সেও ভাল; তথাপি শূদ্রী-কন্যাকে কখন বিবাহ করিব না। আপনি হিন্দু হইয়া কি প্রকারে এমন অনুরোধ করিতেছেন?'

মহারাজ কহিলেন, 'যখন আমার ভগিনীকে শাহজাদা সেলিমের সহিত বিবাহ দিতে পারিয়াছি, তখন তোমাকে ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব, বিচিত্র কি?'

তথাপি তিনি সম্মত হইলেন না। বরং কহিলেন, 'মহারাজ, যাহা হইবার, তাহা হইল। আমাকে মুক্তি দিউন, আমি বিমলার আর কখনও নাম করিব না।'

মহারাজ কহিলেন, 'তাহা হইলে তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল কই? তুমি বিমলাকে ত্যাগ করিবে, অন্য জনে তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করিয়া স্পর্শ করিবে না।'

তথাপি আশু তাঁহার বিবাহে মতি হইল না। পরিশেষে যখন আর কারাগার-যন্ত্রণা সহ্য হইল না, তখন অগত্যা অর্দ্ধসম্মত হইয়া কহিলেন, 'বিমলা যদি আমার গৃহে পরিচারিকা হইয়া থাকিতে পারে, বিবাহের কথা আমার জীবিতকালে কখন উত্থাপন না করে, আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া কখন পরিচয় না দেয়, তবে শূদ্রীকে বিবাহ করি, নচেৎ নহে।'

আমি বিপুল পুলকসহকারে তাহাই স্বীকার করিলাম। আমি ধন গৌরব পরিচয়াদির জন্য কাতর ছিলাম না। পিতা এবং মহারাজ উভয়েই সম্মত হইলেন। আমি দাসীবেশে রাজভবন হইতে নিজ ভর্ত্তৃভবনে আসিলাম।

অনিচ্ছায়, পরবল-পীড়ায় তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় বিবাহ করিলে কে স্ত্রীকে আদর করিতে পারে? বিবাহের পরে প্রভু আমাকে বিষ দেখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের প্রণয় তৎকালে একেবারে দূর হইল। মহারাজ মানসিংহকৃত অপমান সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া আমাকে তিরস্কার করিতেন, সে তিরস্কারও আমার আদর বোধ হইত। এইরূপে কিছুকাল গেল; কিন্তু সে সকল পরিচয়েই বা প্রয়োজন কি? আমার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, অন্য কথা আবশ্যক নহে। কালে আমি পুনর্ব্বার স্বামিপ্রণয়-

ভাগিনী হইয়াছিলাম, কিন্তু অম্বরপতির প্রতি তাঁহার পূর্ব্ববৎ বিষদৃষ্টি রহিল। কপালের লিখন! নচেৎ এ সব ঘটিবে কেন?

আমার পরিচয় দেওয়া শেষ হইল। কেবল আত্মপ্রতিশ্রুতি উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য নহে। অনেকে মনে করে, আমি কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া গড় মান্দারণের অধিপতির নিকট ছিলাম। আমার লোকান্তর হইলে, নাম হইতে সে কালি আপনি মুছাইবেন, এই ভরসাতেই আপনাকে এত লিখিলাম।

এই পত্রে কেবল আত্মবিবরণই লিখিলাম। যাহার সংবাদ জন্য আপনি চঞ্চলচিত্ত, তাহার নামোল্লেখও করিলাম না। মনে করুন, সে নাম এ পৃথিবীতে লোপ হইয়াছে। তিলোত্তমা বলিয়া যে কেহ কখন ছিল, তাহা বিস্মৃত হউন।—"

ওস্মান লিপিপাঠ সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "মা! আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব।"

বিমলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আর আমার পৃথিবীতে উপকার কি আছে? তুমি আমার কি উপকার করিবে? তবে এক উপকার—"

ওস্মান কহিলেন, "আমি তাহাই সাধন করিব।"

বিমলার চক্ষু প্রোজ্জ্বল হইল, কহিলেন, "ওস্মান! কি কহিতেছ? এ দগ্ধ হৃদয়কে আর কেন প্রবঞ্চনা কর?"

ওস্মান হস্ত হইতে একটি অঙ্গুরীয় মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর, দুই এক দিন মধ্যে কিছু সাধন হইবে না। কতলু খাঁর জন্মদিন আগতপ্রায়, সে দিবস বড় উৎসব হইয়া থাকে। প্রহরিগণ আমোদে মত্ত থাকে। সেই দিবস আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি সেই দিবস নিশীথে অন্তঃপুরদ্বারে আসিও; যদি তথায় কেহ তোমাকে এইরূপ দ্বিতীয় অঙ্গুরীয় দৃষ্ট করায়, তবে তুমি তাহার সঙ্গে বাহিরে আসিও; ভরসা করি, নিষ্কণ্টকে আসিতে পারিবে। তবে জগদীশ্বরের ইচ্ছা।"

বিমলা কহিলেন, "জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, আমি অধিক কি বলিব।"

বিমলা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না।

বিমলা ওস্মানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইবেন, এমন সময় ওস্মান কহিলেন, "এক কথা সাবধান করিয়া দিই। একাকিনী আসিবেন। আপনার সঙ্গে কেহ সঙ্গিনী থাকিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, বরং প্রমাদ ঘটিবে।"

বিমলা বুঝিতে পারিলেন যে, ওস্মান তিলোত্তমাকে সঙ্গে আনিতে নিষেধ করিতেছেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ভাল, দুই জন না যাইতে পারি, তিলোত্তমা একাই আসিবে।"

বিমলা বিদায় হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আরোগ্য

দিন যায়। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর, দিন যাবে, রবে না। যে অবস্থায় ইচ্ছা, সে অবস্থায় থাক, দিন যাবে, রবে না। পথিক! বড় দারুণ ঝটিকা বৃষ্টিতে পতিত হইয়াছ? উচ্চ রবে শিরোপরি ঘনগর্জ্জন হইতেছে? বৃষ্টিতে প্লাবিত হইতেছ? অনাবৃত শরীরে করকাভিঘাত হইতেছে? আশ্রয় পাইতেছ না? ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, এ দিন যাবে—রবে না! ক্ষণেক অপেক্ষা কর; দুর্দ্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে; ভানূদয় হইবে; কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

কাহার না দিন যায়? কাহার দুঃখ স্থায়ী করিবার জন্য দিন বসিয়া থাকে? তবে কেন রোদন কর?

কার দিন গেল না? তিলোত্তমা ধূলায় পড়িয়া আছে, তবু দিন যাইতেছে।

বিমলার হৃৎপদ্মে প্রতিহিংসা-কালফণী বসতি করিয়া সর্ব্বশরীর বিষে জর্জ্জর করিতেছে, এক মুহূর্ত্ত তাহার দংশন অসহ্য; এক দিনে কত মুহূর্ত্ত! তথাপি দিন কি গেল না?

কতলু খাঁ মস্‌নদে; শত্রুজয়ী; সুখে দিন যাইতেছে। দিন যাইতেছে, রহে না।

জগৎসিংহ রুগ্নশয্যায়; রোগীর দিন কত দীর্ঘ, কে না জানে? তথাপি দিন গেল!

দিন গেল। দিনে দিনে জগৎসিংহের আরোগ্য জন্মিতে লাগিল। একেবারে যমদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রাজপুত্র দিনে দিনে নিরাপদ্ হইতে লাগিলেন। প্রথমে শরীরের গ্লানি দূর; পরে আহার; পরে বল; শেষে চিন্তা।

প্রথম চিন্তা—তিলোত্তমা কোথায়? রাজপুত্র যত আরোগ্য পাইতে লাগিলেন, তত সংবর্দ্ধিত ব্যাকুলতার সহিত সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কেহ তুষ্টিজনক উত্তর দিল না। আয়েষা জানেন না; ওস্‌মান বলেন না; দাস দাসী জানে না, কি ইঙ্গিত মতে বলে না। রাজপুত্র কণ্টকশয্যাশায়ীর ন্যায় চঞ্চল হইলেন।

দ্বিতীয় চিন্তা—নিজ ভবিষ্যৎ। "কি হইবে" অকস্মাৎ এ প্রশ্নের কে উত্তর দিতে পারে? রাজপুত্র দেখিলেন, তিনি বন্দী। করুণহৃদয় ওস্‌মান ও আয়েষার অনুকম্পায় তিনি কারাগারের বিনিময়ে সুসজ্জিত, সুবাসিত শয়নকক্ষে বসতি করিতেছেন; দাস দাসী তাঁহার সেবা করিতেছে; যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা ইচ্ছা-ব্যক্তির পূর্ব্বেই পাইতেছেন; আয়েষা সহোদরাধিক স্নেহের সহিত তাঁহার যত্ন করিতেছেন; তথাপি দ্বারে প্রহরী; স্বর্ণ-

পিঞ্জরবাসী সুরস পানীয়ে পরিতৃপ্ত বিহঙ্গমের ন্যায় রুদ্ধ আছেন। কবে মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন? মুক্তিপ্রাপ্তির কি সম্ভাবনা? তাঁহার সেনা সকল কোথায়? সেনাপতিশূন্য হইয়া তাহাদের কি দশা হইল?

তৃতীয় চিন্তা—আয়েষা। এ চমৎকারকারিণী, পরহিত মূর্ত্তিমতী, কেমন করিয়া এই মৃণ্ময় পৃথিবীতে অবতরণ করিল?

জগৎসিংহ দেখিলেন, আয়েষার বিরাম নাই, শ্রান্তি বোধ নাই, অবহেলা নাই। রাত্রিদিন রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন। যত দিন না রাজপুত্র নীরোগ হইলেন, তত দিন তিনি প্রত্যহ প্রভাতে দেখিতেন, প্রভাতসূর্য্যরূপিণী কুসুম-দাম হস্তে করিয়া লাবণ্যময় পদ-বিক্ষেপে নিঃশব্দে আগমন করিতেছেন। প্রতিদিন দেখিতেন, যতক্ষণ স্নানাদি কার্য্যের সময় অতীত না হইয়া যায়, ততক্ষণ আয়েষা সে কক্ষ ত্যাগ করিতেন না। প্রতিদিন দেখিতেন, ক্ষণকাল পরেই প্রত্যাগমন করিয়া কেবল নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃ গাত্রোত্থান করিতেন; যতক্ষণ না তাঁহার জননী বেগম তাঁহার নিকট কিঙ্করী পাঠাইতেন, ততক্ষণ তাঁহার সেবায় ক্ষান্ত হইতেন না।

কে রুগ্ন-শয্যায় না শয়ন করিয়াছেন? যদি কাহারও রুগ্নশয্যার শিওরে বসিয়া মনোমোহিনী রমণী ব্যজন করিয়া থাকে, তবে সেই জানে রোগেও সুখ।

পাঠক! তুমি জগৎসিংহের অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত করিতে চাহ? তবে মনে মনে সেই শয্যায় শয়ন কর, শরীরে ব্যাধিযন্ত্রণা অনুভূত কর; স্মরণ কর যে, শত্রুমধ্যে বন্দী হইয়া আছ; তার পর সেই সুবাসিত, সুসজ্জিত, সুস্নিগ্ধ শয়নকক্ষ মনে কর। শয্যায় শয়ন করিয়া তুমি দ্বারপানে চাহিয়া আছ; অকস্মাৎ তোমার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; এই শত্রু-পুরীমধ্যে যে তোমাকে সহোদরের ন্যায় যত্ন করে, সেই আসিতেছে। সে আবার রমণী, যুবতী, পূর্ণবিকসিত পদ্ম! অমনই শয়ন করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছ; দেখ কি মূর্ত্তি! ঈষৎ—ঈষৎ মাত্র দীর্ঘ আয়তন, তদুপযুক্ত গঠন, মহামহিম দেবী-প্রতিমা স্বরূপ! প্রকৃতি নিয়মিত রাজ্ঞী স্বরূপ! দেখ কি ললিত পাদবিক্ষেপ! গজেন্দ্রগমন শুনিয়াছ? সে কি? মরালগমন বল? ঐ পাদবিক্ষেপ দেখ; সুরের লয়, বাদ্যে হয়; ঐ পাদবিক্ষেপের লয়, তোমার হৃদয়মধ্যে হইতেছে। হস্তে ঐ কুসুমদাম দেখ, হস্তপ্রভায় কুসুম মলিন হইয়াছে দেখিয়াছ? কণ্ঠের প্রভায় স্বর্ণহার দীপ্তিহীন হইয়াছে দেখিয়াছ? তোমার চক্ষুর পলক পড়ে না কেন? দেখিয়াছ কি সুন্দর গ্রীবাভঙ্গী? দেখিয়াছ প্রস্তরধবল গ্রীবার উপর কেমন নিবিড় কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ পড়িয়াছে? দেখিয়াছ তৎপার্শ্বে কেমন কর্ণভূষা দুলিতেছে? মস্তকের ঈষৎ—ঈষৎ মাত্র বঙ্কিম ভঙ্গী দেখিয়াছ? ও কেবল ঈষৎ দৈর্ঘ্যহেতু। অত একদৃষ্টিতে চাহিতেছ কেন? আয়েষা কি মনে করিবে?

যত দিন জগৎসিংহের রোগের শুশ্রূষা আবশ্যকতা হইল, তত দিন পর্য্যন্ত আয়েষা প্রত্যহ এইরূপ অনবরত তাহাতে নিযুক্ত রহিলেন। ক্রমে যেমন রাজপুত্রের রোগের উপশম হইতে লাগিল, তেমনই আয়েষারও যাতায়াত কমিতে লাগিল; যখন রাজপুত্রের রোগ নিঃশেষ হইল, তখন আয়েষার জগৎসিংহের নিকট যাতায়াত প্রায় একেবারে শেষ হইল; কদাচিৎ দুই একবার আসিতেন। যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বেলাধিক্যে রৌদ্র সরিয়া যায়, আয়েষা সেইরূপ ক্রমে ক্রমে জগৎসিংহ হইতে আরোগ্য কালে সরিয়া যাইতে লাগিলেন।

এক দিন গৃহমধ্যে অপরাহ্নে জগৎসিংহ গবাক্ষে দাঁড়াইয়া দুর্গের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; কত লোক অবাধে নিজ নিজ ঈপ্সিত বা প্রয়োজনীয় স্থানে যাতায়াত করিতেছে, রাজপুত্র দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অবস্থার সহিত আত্মাবস্থা তুলনা করিতেছিলেন। এক স্থানে কয়েক জন লোক মণ্ডলীকৃত হইয়া কোন ব্যক্তি বা বস্তু বেষ্টন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়াছিল। রাজপুত্রের তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হইল। বুঝিতে পারিলেন যে, লোকগুলি কোন আমোদে নিযুক্ত আছে, মন দিয়া কিছু শুনিতেছে। মধ্যস্থ ব্যক্তি কে, বা বস্তুটি কি, তাহা কুমার দেখিতে পাইতেছিলেন না। কিছু কৌতূহল জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েক জন শ্রোতা চলিয়া গেলে কুমারের কৌতূহল নিবারণ হইল; দেখিতে পাইলেন, মণ্ডলীমধ্যে এক ব্যক্তি একখানা পুতির ন্যায় কয়েক খণ্ড পত্র লইয়া তাহা হইতে কি পড়িয়া শুনাইতেছে। আবৃত্তিকর্ত্তার আকার দেখিয়া রাজকুমারের কিছু কৌতুক জন্মিল। তাঁহাকে মনুষ্য বলিলেও বলা যায়, বজ্রাঘাতে পত্রভ্রষ্ট মধ্যমাকার তালগাছ বলিলেও বলা যায়। প্রায় সেইরূপ দীর্ঘ, প্রস্থেও তদ্রূপ; তবে তালগাছে কখন তাদৃশ গুরু নাসিকাভার ন্যস্ত হয় না। আকারেঙ্গিতে উভয়ই সমান; পুতি পড়িতে পড়িতে পাঠক যে হাত নাড়া, মাথা নাড়া দিতেছিলেন, রাজকুমার তাহা অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ওস্‌মান গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরস্পর অভিবাদনের পর ওস্‌মান কহিলেন, "আপনি গবাক্ষে অন্যমনস্ক হইয়া কি দেখিতেছিলেন?"

জগৎসিংহ কহিলেন, "সরল কাষ্ঠবিশেষ। দেখিলে দেখিতে পাইবেন।"

ওস্‌মান দেখিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, উহাকে কখন দেখেন নাই?"

রাজপুত্র কহিলেন, "না।"

ওস্‌মান কহিলেন, "ও আপনাদিগের ব্রাহ্মণ। কথাবার্ত্তায় বড় সরস; ও ব্যক্তিকে গড় মান্দারণে দেখিয়াছিলাম।"

রাজকুমার অন্তঃকরণে চিন্তিত হইলেন। গড় মান্দারণে ছিল? তবে এ ব্যক্তি কি তিলোত্তমার কোন সংবাদ বলিতে পারিবে না?

এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, উহার নাম কি?"

ওস্‌মান চিন্তা করিয়া কহিলেন, "উহার নামটি কিছু কঠিন, হঠাৎ স্মরণ হয় না, গনপত? না;—গনপত—গজপত—না; গজপত কি?"

"গজপত? গজপত এদেশীয় নাম নহে, অথচ দেখিতেছি, ও ব্যক্তি বাঙ্গালী।"

"বাঙ্গালী বটে, ভট্টাচার্য্য। উহার একটা উপাধি আছে, এলেম্—এলেম্ কি?"

"মহাশয়! বাঙ্গালীর উপাধিতে 'এলেম্' শব্দ ব্যবহার হয় না। এলেম্‌কে বাঙ্গালায় বিদ্যা কহে। বিদ্যাভূষণ বা বিদ্যাবাগীশ হইবে।"

"হাঁ হাঁ, বিদ্যা কি একটা,—রসুন, বাঙ্গালায় হস্তীকে কি বলে বলুন দেখি?"

"হস্তী।"

"আর?"

"করী, দন্তী, বারণ, নাগ, গজ—"

"হাঁ হাঁ, স্মরণ হইয়াছে; উহার নাম 'গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ'।"

"বিদ্যাদিগ্‌গজ! চমৎকার উপাধি! যেমন নাম, তেমনই উপাধি। উহার সহিত আলাপ করিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে।"

ওস্‌মান খাঁ একটু একটু গজপতির কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন; বিবেচনা করিলেন, ইহার সহিত কথোপকথনে ক্ষতি হইতে পারে না। কহিলেন, "ক্ষতি কি?"

উভয়ে নিকটস্থ বাহিরের ঘরে গিয়া ভৃত্যদ্বারা গজপতিকে আহ্বান করিয়া আনিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

দিগ্‌গজ সংবাদ

ভৃত্যসঙ্গে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে রাজকুমার জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ?"

দিগ্‌গজ হস্তভঙ্গী সহিত কহিলেন,

"যাবৎ মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে,
অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং।"

জগৎসিংহ হাস্য সংবরণ করিয়া প্রণাম করিলেন। গজপতি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "খোদা খাঁ বাবুজীকে ভাল রাখুন।"

রাজপুত্র কহিলেন, "মহাশয়, আমি মুসলমান নহি, আমি হিন্দু।"

দিগ্‌গজ মনে করিলেন, "বেটা যবন, আমাকে ফাঁকি দিতেছে; কি একটা মতলব আছে; নহিলে আমাকে ডাকিবে কেন?" ভয়ে বিষণ্ণবদনে কহিলেন, "খাঁ বাবুজী, আমি আপনাকে চিনি; আপনার অন্নে প্রতিপালন, আমায় কিছু বলিবেন না, আপনার শ্রীচরণের দাস আমি।"

জগৎসিংহ দেখিলেন, ইহাও এক বিঘ্ন। কহিলেন, "মহাশয়, আপনি ব্রাহ্মণ; আমি রাজপুত, আপনি এরূপ কহিবেন না; আপনার নাম গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ?"

দিগ্‌গজ ভাবিলেন, "ঐ গো! নাম জানে! কি বিপদে ফেলিবে?" করযোড়ে কহিলেন, "দোহাই সেখজীর। আমি গরীব! আপনার পায়ে পড়ি।"

জগৎসিংহ দেখিলেন, ব্রাহ্মণ যেরূপ ভীত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ উহার নিকট কোন কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। অতএব বিষয়ান্তরে কথা কহিবার জন্য কহিলেন, "আপনার হাতে ও কি পুতি?"

"আজ্ঞা এ মাণিকপীরের পুতি।"

"ব্রাহ্মণের হাতে মাণিকপীরের পুতি!"

"আজ্ঞা,—আজ্ঞা, আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, এখন ত আর ব্রাহ্মণ নই।"

রাজকুমার বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বিরক্তও হইলেন। কহিলেন, "সে কি? আপনি গড় মান্দারণে থাকিতেন না?"

দিগ্‌গজ ভাবিলেন, "এই সর্ব্বনাশ করিল! আমি বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে থাকিতাম, টের পেয়েছে! বীরেন্দ্রসিংহের যে দশা করিয়াছে, আমারও তাই করিবে।" ব্রাহ্মণ ত্রাসে কাঁদিয়া ফেলিল। রাজকুমার কহিলেন, "ও কি ও!"

দিগ্‌গজ হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলেন, "দোহাই খাঁ বাবা! আমায় মের না বাবা! আমি তোমার গোলাম বাবা! তোমার গোলাম বাবা!"

"তুমি কি বাতুল হইয়াছ?"

"না বাবা! আমি তোমারই দাস বাবা! আমি তোমারই বাবা!"

জগৎসিংহ অগত্যা ব্রাহ্মণকে সুস্থির করিবার জন্য কহিলেন, "তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি একটু মাণিকপীরের পুতি পড়, আমি শুনি।"

ব্রাহ্মণ মাণিকপীরের পুতি লইয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিল। যেরূপ যাত্রার বালক অধিকারীর কাণমলা খাইয়া গীত গায়, দিগ্‌গজ পণ্ডিতের সেই দশা হইল।

ক্ষণেক পরে রাজকুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া মাণিক-পীরের পুতি পড়িতেছিলেন কেন ?"

ব্রাহ্মণ সুর থামাইয়া কহিল, "আমি মোছলমান হইয়াছি।"

রাজপুত্র কহিলেন, "সে কি ?" গজপতি কহিলেন, "যখন মোছলমান বাবুরা গড়ে এলেন, তখন আমাকে কহিলেন যে, আয় বামন্ তোর জাতি মারিব। এই বলিয়া তাঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া মুরগির পালো রাঁধিয়া খাওয়াইলেন।"

"পালো কি ?"

দিগ্‌গজ কহিলেন, "আতপ চাউল ঘৃতের পাক।"

রাজপুত্র বুঝিলেন পদার্থটা কি। কহিলেন, "বলিয়া যাও !"

"তার পর আমাকে বলিলেন, 'তুই মোছলমান হইয়াছিস্'; সেই অবধি আমি মোছলমান।"

রাজপুত্র এই অবসরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আর সকলের কি হইয়াছে ?"

"আর আর ব্রাহ্মণ অনেকেই ঐরূপ মোছলমান হইয়াছে।"

রাজপুত্র ওস্‌মানের মুখপানে দৃষ্টি করিলেন। ওস্‌মান রাজপুত্রকৃত নির্ব্বাক্ তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, ইহাতে দোষ কি ? মোছলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম ; বলে হউক, ছলে হউক, সত্যধর্ম্মপ্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে।"

রাজপুত্র উত্তর না করিয়া বিদ্যাদিগ্‌গজকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাশয় !"

"আজ্ঞা এখন সেখ দিগ্‌গজ।"

"আচ্ছা তাই ; সেখজী, গড়ের আর কাহারও সংবাদ আপনি জানেন না ?"

ওস্‌মান রাজপুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। দিগ্‌গজ কহিলেন, "আর অভিরাম স্বামী পলায়ন করিয়াছেন।"

রাজপুত্র বুঝিলেন, নির্ব্বোধকে স্পষ্ট স্পষ্ট জিজ্ঞাসা না করিলে কিছুই শুনিতে পাইবেন না। কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কি হইয়াছে ?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "নবাব কতলু খাঁ তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছেন !"

রাজপুত্রের মুখ রক্তিমবর্ণ হইল। ওস্‌মানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ? এ ব্রাহ্মণ অলীক কথা কহিতেছে ?"

ওস্‌মান গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "নবাব বিচার করিয়া রাজবিদ্রোহী জ্ঞানে প্রাণদণ্ড করিয়াছেন।"

রাজপুত্রের চক্ষুতে অগ্নি প্রোজ্জ্বল হইল।

ওস্‌মানকে জিজ্ঞাসিলেন, "আর একটা নিবেদন করতে পারি কি? কার্য্য কি আপনার অভিমতে হইয়াছে?"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমার পরামর্শের বিরুদ্ধে।"

রাজকুমার বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ওস্‌মান সুসময় পাইয়া দিগ্‌গজকে কহিলেন, "তুমি এখন বিদায় হইতে পার।"

দিগ্‌গজ গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যায়, কুমার তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, "আর এক কথা জিজ্ঞাসা; বিমলা কোথায়?"

ব্রাহ্মণ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, একটু রোদনও করিল। কহিল, "বিমলা এখন নবাবের উপপত্নী।"

রাজকুমার বিদ্যুদ্দৃষ্টিতে ওস্‌মানের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "এও সত্য?"

ওস্‌মান কোন উত্তর না করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "তুমি আর কি করিতেছ? চলিয়া যাও।"

রাজপুত্র ব্রাহ্মণের হস্ত দৃঢ়তর ধারণ করিলেন, যাইবার শক্তি নাই। কহিলেন, "আর এক মুহূর্ত্ত রহ; আর একটা কথা মাত্র।" তাঁহার আরক্ত লোচন হইতে দ্বিগুণতর অগ্নি বিস্ফুরণ হইতেছিল, "আর একটা কথা। তিলোত্তমা?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "তিলোত্তমা নবাবের উপপত্নী হইয়াছে। দাস দাসী লইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আছে।"

রাজকুমার বেগে ব্রাহ্মণের হস্ত নিক্ষেপ করিলেন, ব্রাহ্মণ পড়িতে পড়িতে রহিল।

ওস্‌মান লজ্জিত হইয়া মৃদুভাবে কহিলেন, "আমি সেনাপতি মাত্র।"

রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "আপনি পিশাচের সেনাপতি।"

দশম পরিচ্ছেদ

প্রতিমা বিসর্জ্জন

বলা বাহুল্য যে, জগৎসিংহের সে রাত্রে নিদ্রা আসিল না। শয্যা অগ্নিবিকীর্ণবৎ, হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে। যে তিলোত্তমা মরিলে জগৎসিংহ পৃথিবী শূন্য দেখিতেন, এখন সে তিলোত্তমা প্রাণত্যাগ করিল না কেন, ইহাই পরিতাপের বিষয় হইল।

সে কি? তিলোত্তমা মরিল না কেন? কুসুমকুমার দেহ, মাধুর্য্যময় কোমলালোকে বেষ্টিত যে দেহ, যে দিকে জগৎসিংহ নয়ন ফিরান, সেই দিকে মানসিক দর্শনে দেখিতে পান, সে দেহ শ্মশানমৃত্তিকা হইবে? এই পৃথিবী—অসীম পৃথিবীতে কোথাও সে দেহের চিহ্ন থাকিবে না? যখন এইরূপ চিন্তা করেন, জগৎসিংহের চক্ষুতে দর দর বারিধারা পড়িতে থাকে; অমনই আবার দুরাত্মা কতলু খাঁর বিহারমন্দিরের স্মৃতি হৃদয়মধ্যে বিদ্যুদ্বৎ চমকিত হয়, সেই কুসুমসুকুমার বপু পাপিষ্ঠ পাঠানের অঙ্কন্যস্ত দেখিতে পান, আবার দারুণাগ্নিতে হৃদয় জ্বলিতে থাকে।

তিলোত্তমা তাঁহার হৃদয়-মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি।

সেই তিলোত্তমা পাঠানভবনে!

সেই তিলোত্তমা কতলু খাঁর উপপত্নী!

আর কি সে মূর্ত্তি রাজপুতে আরাধনা করে?

সে প্রতিমা স্বহস্তে স্থানচ্যুত করিতে সঙ্কোচ না করা কি রাজপুতের কুলোচিত?

সে প্রতিমা জগৎসিংহের হৃদয়মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহাকে উন্মূলিত করিতে মূলাধার হৃদয়ও বিদীর্ণ হইবে। কেমন করিয়া চিরকালের জন্য সে মোহিনী মূর্ত্তি বিস্মৃত হইবেন? সে কি হয়? যত দিন মেধা থাকিবে, যত দিন অস্থি-মজ্জা-শোণিত-নির্ম্মিত দেহ থাকিবে, তত দিন সে হৃদয়েশ্বরী হইয়া বিরাজ করিবে!

এই সকল উৎকট চিন্তায় রাজপুত্রের মনের স্থিরতা দূরে থাকুক, বুদ্ধিরও অপভ্রংশ হইতে লাগিল, স্মৃতির বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল; নিশাশেষেও দুই করে মস্তক ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে, কিছুই আলোচনা করিবার আর শক্তি নাই।

এক ভাবে বহুক্ষণ বসিয়া জগৎসিংহের অঙ্গবেদনা করিতে লাগিল; মানসিক যন্ত্রণার প্রগাঢ়তায় শরীরে জ্বরের ন্যায় সন্তাপ জন্মিল, জগৎসিংহ বাতায়নসন্নিধানে গিয়া দাঁড়াইলেন।

শীতল নৈদাঘ বায়ু আসিয়া জগৎসিংহের ললাট স্পর্শ করিল। নিশা অন্ধকার; আকাশ অনিবিড় মেঘাবৃত; নক্ষত্রাবলী দেখা যাইতেছে না, কদাচিৎ সচল মেঘ-খণ্ডের আবরণাভ্যন্তরে কোন ক্ষীণ তারা দেখা যাইতেছে; দূরস্থ বৃক্ষশ্রেণী অন্ধকারে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া তমোময় প্রাচীরবৎ আকাশতলে রহিয়াছে, নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষে খদ্যোতমালা হীরকচূর্ণবৎ জ্বলিতেছে; সম্মুখস্থ এক তড়াগে আকাশ বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব অন্ধকারে অস্পষ্টরূপ স্থিত রহিয়াছে।

মেঘস্পৃষ্ট শীতল নৈশ বায়ুসংলগ্নে জগৎসিংহের কিঞ্চিৎ দৈহিক সন্তাপ দূর হইল। তিনি বাতায়নে হস্তরক্ষাপূর্ব্বক তদুপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইলেন। উন্নিদ্রায় বহুক্ষণাবধি উৎকট মানসিক যন্ত্রণা সহনে অবসন্ন হইয়াছিলেন; এক্ষণে স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শে

কিঞ্চিৎ চিন্তাবিরত হইলেন, একটু অন্যমনস্ক হইলেন। এতক্ষণ যে ছুরিকা সঞ্চালনে হৃদয় বিদ্ধ হইতেছিল, এক্ষণে তাহা দূর হইয়া অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণতাশূন্য নৈরাশ্য মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আশা ত্যাগ করাই অধিক ক্লেশ; একবার মনোমধ্যে নৈরাশ্য স্থিরতর হইলে আর তত ক্লেশকর হয় না। অস্ত্রাঘাতই সমধিক ক্লেশকর; তাহার পর যে ক্ষত হয়, তাহার যন্ত্রণা স্থায়ী বটে, কিন্তু তত উৎকট নহে। জগৎসিংহ নিরাশার মৃদুতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। অন্ধকার নক্ষত্রহীন গগন প্রতি চাহিয়া, এক্ষণে নিজ হৃদয়াকাশও যে তদ্রূপ অন্ধকার নক্ষত্রহীন হইল, সজল চক্ষুতে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভূতপূর্ব্ব সকল মৃদুভাবে স্মরণ-পথে আসিতে লাগিল; বাল্যকাল, কৈশোরপ্রমোদ, সকল মনে পড়িতে লাগিল; জগৎসিংহের চিত্ত তাহাতে মগ্ন হইল; ক্রমে অধিক অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন, ক্রমে অধিক শরীর শীতল হইতে লাগিল; ক্লান্তিবশে চেতনাপহরণ হইতে লাগিল; বাতায়ন অবলম্বন করিয়া জগৎসিংহের তন্দ্রা আসিল। নিদ্রিতাবস্থায় রাজকুমার স্বপ্ন দেখিলেন; গুরুতর যন্ত্রণাজনক স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন; নিদ্রিত বদনে ভ্রূকুটি হইতে লাগিল; মুখে উৎকট ক্লেশব্যঞ্জক ভঙ্গী হইতে লাগিল; অধর কম্পিত, বিচলিত হইতে লাগিল; ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল; করে দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ হইল।

চমকের সহিত নিদ্রাভঙ্গ হইল; অতি ব্যস্তে কুমার কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; কতক্ষণ এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা সুকঠিন; যখন প্রাতঃসূর্য্যকরে হর্ম্ম্য-প্রাকার দীপ্ত হইতেছিল, তখন জগৎসিংহ হর্ম্ম্যতলে বিনা শয্যায়, বিনা উপাধানে লম্বমান হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন।

ওস্মান আসিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। রাজপুত্র নিদ্রোত্থিত হইলে, ওস্মান তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। রাজপুত্র পত্র হস্তে লইয়া নিরুত্তরে ওস্মানের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ওস্মান বুঝিলেন, রাজপুত্র আত্ম-বিহ্বল হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে প্রয়োজনীয় কথোপকথন হইতে পারিবে না, বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! আপনার ভূশয্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে আমার কৌতূহল নাই। এই পত্র-প্রেরিকার নিকট আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, এই পত্র আপনাকে দিব; যে কারণে এত দিন এই পত্র আপনাকে দিই নাই, সে কারণ দূর হইয়াছে। আপনি সকল জ্ঞাত হইয়াছেন। অতএব পত্র আপনার নিকট রাখিয়া চলিলাম, আপনি অবসরমতে পাঠ করিবেন; অপরাহ্ণে আমি পুনর্ব্বার আসিব। প্রত্যুত্তর দিতে চাহেন, তাহাও লইয়া লেখিকার নিকট প্রেরণ করিতে পারিব।"

এই বলিয়া ওস্মান রাজপুত্রের নিকট পত্র রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজপুত্র একাকী বসিয়া সম্পূর্ণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে, বিমলার পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন। যতক্ষণ পত্রখানি জ্বলিতে লাগিল, ততক্ষণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যখন পত্র নিঃশেষ দগ্ধ হইয়া গেল, তখন আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "স্মৃতিচিহ্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিলাম, স্মৃতিও ত সন্তাপে পুড়িতেছে, নিঃশেষ হয় না কেন ?"

জগৎসিংহ রীতিমত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পূজাহ্নিক শেষ করিয়া ভক্তি-ভাবে ইষ্টদেবকে প্রণাম করিলেন ; পরে করযোড়ে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিতে লাগিলেন, "গুরুদেব ! দাসকে ত্যাগ করিবেন না। আমি রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিব ; ক্ষত্রকুলোচিত কার্য্য করিব ; ও পাদপদ্মের প্রসাদ ভিক্ষা করি। বিধর্ম্মীর উপপত্নী এ চিত্ত হইতে দূর করিব ; তাহাতে শরীর পতন হয়, অন্তকালে তোমাকে পাইব। মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহা করিতেছি, মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব। দেখ গুরুদেব ! তুমি অন্তর্যামী, অন্তস্তল পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া দেখ, আর আমি তিলোত্তমার প্রণয়প্রার্থী নহি, আর আমি তাহার দর্শনাভিলাষী নহি ; কেবল কাল ভূতপূর্ব্বস্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, স্মৃতিলোপ কি হইবে না ? গুরুদেব ! ও পদপ্রসাদ ভিক্ষা করি। নচেৎ স্মরণের যন্ত্রণা সহ্য হয় না।"

প্রতিমা বিসর্জ্জন হইল।

তিলোত্তমা তখন ধূলিশয্যায় কি স্বপ্ন দেখিতেছিল ? এ ঘোর অন্ধকারে, যে এক নক্ষত্র প্রতি সে চাহিয়াছিল, সেও তাহাকে আর করবিতরণ করিবে না। এ ঘোর ঝটিকায় যে লতায় প্রাণ বাঁধিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িল ; যে ভেলায় বুক দিয়া সমুদ্র পার হইতেছিল, সে ভেলা ডুবিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গৃহান্তর

অপরাহ্ণে কথামত ওস্‌মান রাজপুত্র সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "যুবরাজ ! প্রত্যুত্তর পাঠাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে কি ?"

যুবরাজ প্রত্যুত্তর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, পত্র হস্তে লইয়া ওস্‌মানকে দিলেন। ওস্‌মান লিপি হস্তে লইয়া কহিলেন, "আপনি অপরাধ লইবেন না ; আমাদের পদ্ধতি

আছে, দুর্গবাসী কেহ কাহাকে পত্র প্রেরণ করিলে, দুর্গ-রক্ষকেরা পত্র পাঠ না করিয়া পাঠান না।"

যুবরাজ কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "এ ত বলা বাহুল্য। আপনি পত্র খুলিয়া পড়ুন; অভিপ্রায় হয়, পাঠাইয়া দিবেন।"

ওস্‌মান পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এই মাত্র লেখা ছিল—

"মন্দভাগিনি! আমি তোমার অনুরোধ বিস্মৃত হইব না। কিন্তু তুমি যদি পতিব্রতা হও, তবে শীঘ্র পতিপথাবলম্বন করিয়া আত্মকলঙ্ক লোপ করিবে।

জগৎসিংহ।"

ওস্‌মান পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! আপনার হৃদয় অতি কঠিন।"

রাজপুত্র নীরস হইয়া কহিলেন, "পাঠান অপেক্ষা নহে।"

ওস্‌মানের মুখ একটু আরক্ত হইল। কিঞ্চিৎ কর্কশ ভঙ্গীতে কহিলেন, "বোধ করি, পাঠান সর্ব্বাংশে আপনার সহিত অভদ্রতা না করিয়া থাকিবে।"

রাজপুত্র কুপিতও হইলেন, লজ্জিতও হইলেন। এবং কহিলেন, "না মহাশয়! আমি নিজের কথা কহিতেছি না। আপনি আমার প্রতি সর্ব্বাংশে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং বন্দী করিয়াও প্রাণদান দিয়াছেন; সেনা-হন্তা শত্রুর সাংঘাতিক পীড়ার শমতা করাইয়াছেন;—যে ব্যক্তি কারাবাসে শৃঙ্খলবদ্ধ থাকিবে, তাহাকে প্রমোদাগারে বাস করাইতেছেন। আর অধিক কি করিবেন? কিন্তু আমি বলি কি,—আপনাদের ভদ্রতা-জালে জড়িত হইতেছি; এ সুখের পরিণাম কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বন্দী হই, আমাকে কারাগারে স্থান দিন, এ দয়ার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন। আর যদি বন্দী না হই, তবে আমাকে এ হেমপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখায় প্রয়োজন কি?"

ওস্‌মান স্থির চিত্তে উত্তর করিলেন, "রাজপুত্র! অশুভের জন্য ব্যস্ত কেন? অমঙ্গলকে ডাকিতে হয় না, আপনিই আইসে।"

রাজপুত্র গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "আপনার এ কুসুমশয্যা ছাড়িয়া কারাগারের শিলাশয্যায় শয়ন করা রাজপুতেরা অমঙ্গল বলিয়া গণে না।"

ওস্‌মান কহিলেন, "শিলাশয্যা যদি অমঙ্গলের চরম হইত, তবে ক্ষতি কি?"

রাজপুত্র ওস্‌মান প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "যদি কতলু খাঁকে সমুচিত দণ্ড দিতে না পারিলাম, তবে মরণেই বা ক্ষতি কি?"

ওস্‌মান কহিলেন, "যুবরাজ! সাবধান! পাঠানের যে কথা সেই কাজ!"

রাজপুত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "সেনাপতি, আপনি যদি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতে আসিয়া থাকেন, তবে যত্ন বিফল জ্ঞান করুন।"

ওস্‌মান কহিলেন, "রাজপুত্র, আমরা পরস্পর সন্নিধানে এরূপ পরিচিত আছি যে, মিথ্যা বাগাড়ম্বর কাহারও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমি আপনার নিকট বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আসিয়াছি।"

জগৎসিংহ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, "অনুমতি করুন।"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমি এক্ষণে যে প্রস্তাব করিব, তাহা কতলু খাঁর আদেশমত কহিতেছি জানিবেন।"

জ। উত্তম।

ও। শ্রবণ করুন। রাজপুত পাঠানের যুদ্ধে উভয় কুল ক্ষয় হইতেছে।

রাজপুত্র কহিলেন, "পাঠানকুল ক্ষয় করাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য।"

ওস্‌মান কহিলেন, "সত্য বটে, কিন্তু উভয় কুল নিপাত ব্যতীত একের উচ্ছেদ কত দূর সম্ভাবনা, তাহাও দেখিতে পাইতেছেন। গড় মান্দারণ-জেতৃগণ নিতান্ত বলহীন নহে দেখিয়াছেন।"

জগৎসিংহ ঈষন্মাত্র সহাস্য হইয়া কহিলেন, "তাঁহারা কৌশলময় বটেন।"

ওস্‌মান কহিতে লাগিলেন, "যাহাই হউক, আত্মগরিমা আমার উদ্দেশ্য নহে। মোগল সম্রাটের সহিত চিরদিন বিবাদ করিয়া পাঠানের উৎকলে তিষ্ঠান্ সুখের হইবে না। কিন্তু মোগল সম্রাট্‌ও পাঠানদিগকে কদাচ নিজকরতলস্থ করিতে পারিবেন না। আমার কথা আত্মশ্লাঘা বিবেচনা করিবেন না। আপনি ত রাজনীতিজ্ঞ বটেন, ভাবিয়া দেখুন, দিল্লী হইতে উৎকল কত দূর। দিল্লীশ্বর যেন মানসিংহের বাহুবলে এবার পাঠান জয় করিলেন; কিন্তু কত দিন তাঁহার জয়-পতাকা এ দেশে উড়িবে? মহারাজ মানসিংহ সসৈন্য পশ্চাৎ হইবেন, আর উৎকলে দিল্লীশ্বরের অধিকার লোপ হইবে। ইতিপূর্ব্বেও ত আক্‌বর শাহা উৎকল জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কত দিন তথাকার করগ্রাহী ছিলেন? এবারও জয় করিলে এবারও তাহা ঘটিবে। না হয় আবার সৈন্য প্রেরণ করিবেন; আবার উৎকল জয় করুন, আবার পাঠান স্বাধীন হইবে। পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে; কখনও অধীনতা স্বীকার করে নাই; এক জন মাত্র জীবিত থাকিতে কখন করিবেও না; ইহা নিশ্চিত কহিলাম। তবে আর রাজপুত পাঠানের শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া কাজ কি?"

জগৎসিংহ কহিলেন, "আপনি কিরূপ করিতে বলেন?"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমি কিছুই বলিতেছি না। আমার প্রভু সন্ধি করিতে বলেন।"

জ। কিরূপ সন্ধি?

ও। উভয় পক্ষেই কিঞ্চিৎ লাঘব স্বীকার করুন। নবাব কতলু খাঁ বাহুবলে বঙ্গদেশের যে অংশ জয় করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। আক্‌বর শাহাও উড়িষ্যার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সৈন্য লইয়া যাউন, আর ভবিষ্যতে আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত থাকুন। ইহাতে বাদশাহের কোন ক্ষতি নাই; বরং পাঠানের ক্ষতি। আমরা যাহা ক্লেশে হস্তগত করিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিতেছি; আক্‌বর শাহা যাহা হস্তগত করিতে পারেন নাই, তাহাই ত্যাগ করিতেছেন।

রাজকুমার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "উত্তম কথা; কিন্তু এ সকল প্রস্তাব আমার নিকট কেন? সন্ধিবিগ্রহের কর্ত্তা মহারাজ মানসিংহ; তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করুন।"

ওস্‌মান কহিলেন, "মহারাজের নিকট দূত প্রেরণ করা হইয়াছিল; দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকট কে রটনা করিয়াছে যে, পাঠানেরা মহাশয়ের প্রাণহানি করিয়াছে। মহারাজ সেই শোকে ও ক্রোধে সন্ধির নামও শ্রবণ করিলেন না; দূতের কথায় বিশ্বাস করিলেন না; যদি মহাশয় স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাবকর্ত্তা হয়েন, তবে তিনি সম্মত হইতে পারিবেন।"

রাজপুত্র ওস্‌মানের প্রতি পুনর্ব্বার স্থিরদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলুন। আমার হস্তাক্ষর প্রেরণ করিলেও মহারাজের প্রতীতি জন্মিবার সম্ভাবনা। তবে আমাকে স্বয়ং যাইতে কেন কহিতেছেন?"

ও। তাহার কারণ এই যে, মহারাজ মানসিংহ স্বয়ং আমাদিগের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত নহেন; আপনার নিকট প্রকৃত বলবত্তা জানিতে পারিবেন। আর মহাশয়ের অনুরোধে বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা; লিপি দ্বারা সেরূপ নহে। সন্ধির আশু এক ফল হইবে যে, আপনি পুনর্ব্বার কারামুক্ত হইবেন। সুতরাং নবাব কতলু খাঁ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আপনি এ সন্ধিতে অবশ্য অনুরোধ করিবেন।

জ। আমি পিতৃসন্নিধানে যাইতে অস্বীকৃত নহি।

ও। শুনিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু আরও এক নিবেদন আছে। আপনি যদি ঐরূপ সন্ধি সম্পাদন করিতে না পারেন, তবে আবার এ দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করিতে অঙ্গীকার করিয়া যাউন।

জ। আমি অঙ্গীকার করিলেই যে প্রত্যাগমন করিব, তাহার নিশ্চয় কি?

ওস্‌মান হাসিয়া কহিলেন, "তাহা নিশ্চয় বটে। রাজপুতের বাক্য যে লঙ্ঘন হয় না, তাহা সকলেই জানে।"

রাজপুত্র সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, পিতার সহিত সাক্ষাৎ পরেই একাকী দুর্গে প্রত্যাগমন করিব।"

ও। আর কোন বিষয়ও স্বীকার করুন; তাহা হইলেই আমরা বিশেষ বাধিত হই।—আপনি যে মহারাজের সাক্ষাৎ লাভ করিলে আমাদিগের বাসনানুযায়ী সন্ধির উদ্যোগী হইবেন, তাহাও স্বীকার করিয়া যাউন।

রাজপুত্র কহিলেন, "সেনাপতি মহাশয়! এ অঙ্গীকার করিতে পারিলাম না। দিল্লীর সম্রাট্ আমাদিগকে পাঠানজয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন, পাঠান জয়ই করিব। সন্ধি করিতে নিযুক্ত করেন নাই, সন্ধি করিব না। কিম্বা সে অনুরোধও করিব না।"

ওস্মানের মুখভঙ্গীতে সন্তোষ অথচ ক্ষোভ উভয়ই প্রকাশ হইল; কহিলেন, "যুবরাজ! আপনি রাজপুতের ন্যায় উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।"

জ। আমার মুক্তিতে দিল্লীশ্বরের কি? রাজপুতকুলেও অনেক রাজপুত্র আছে।

ওস্মান কাতর হইয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমার পরামর্শ শুনুন, এ অভিপ্রায় ত্যাগ করুন।"

জ। কেন মহাশয়?

ও। রাজপুত্র! স্পষ্ট কথা কহিতেছি, আপনার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়াই নবাব সাহেব আপনাকে এ পর্য্যন্ত আদরে রাখিয়াছিলেন; আপনি যদি তাহাতে বক্র হয়েন, তবে আপনার সমূহ পীড়া ঘটাইবেন।

জ। আবার ভয়প্রদর্শন! এইমাত্র আমি কারাবাসের প্রার্থনা আপনাকে জানাইয়াছি।

ও। যুবরাজ! কেবল কারাবাসেই যদি নবাব তৃপ্ত হয়েন, তবে মঙ্গল জানিবেন।

যুবরাজ ভ্রূভঙ্গী করিলেন। কহিলেন, "না হয় বীরেন্দ্রসিংহের রক্তস্রোতঃ বৃদ্ধি করাইব।" চক্ষুঃ হইতে তাঁহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল।

ওস্মান কহিলেন, "আমি বিদায় হইলাম। আমার কার্য্য আমি করিলাম, কতলু খাঁর আদেশ অন্য দূতমুখে শ্রবণ করিবেন।"

কিছু পরে কথিত দূত আগমন করিল। সে ব্যক্তি সৈনিক পুরুষের বেশধারী, সাধারণ পদাতিক অপেক্ষা কিছু উচ্চপদস্থ সৈনিকের ন্যায়। তাহার সমভিব্যাহারী আর চারি জন অস্ত্রধারী পদাতিক ছিল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কার্য্য কি?"

সৈনিক কহিল, "আপনার বাসগৃহ পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক।"

"আমি প্রস্তুত আছি, চল" বলিয়া রাজপুত্র দূতের অনুগামী হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অলৌকিক আভরণ

মহোৎসব উপস্থিত। অদ্য কতলু খাঁর জন্মদিন। দিবসে রঙ্গ, নৃত্য, দান, আহার, পান ইত্যাদিতে সকলেই ব্যাপৃত ছিল। রাত্রিতে ততোধিক। এইমাত্র সায়াহ্ন কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে; দুর্গমধ্যে আলোকময়; সৈনিক, সিপাহি, ওমরাহ, ভৃত্য, পৌরবর্গ, ভিক্ষুক, মদ্যপ, নট, নর্ত্তকী, গায়ক, গায়িকা, বাদক, ঐন্দ্রজালিক, পুষ্পবিক্রেতা, গন্ধবিক্রেতা, তাম্বুলবিক্রেতা, আহারীয়বিক্রেতা, শিল্পকার্য্যোৎপন্নদ্রব্যজাতবিক্রেতা, এই সকলে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ। যথায় যাও, তথায় কেবল দীপমালা, গীতবাদ্য, গন্ধবারি, পান, পুষ্প, বাজী, বেশ্যা। অন্তঃপুরমধ্যেও কতক কতক ঐরূপ। নবাবের বিহারগৃহ অপেক্ষাকৃত স্থিরতর, কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রমোদময়। কক্ষে কক্ষে রজতদীপ, স্ফাটিক দীপ, গন্ধদীপ, স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে; সুগন্ধি কুসুমদাম পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, শয্যায়, আসনে, আর পুরবাসিনীদিগের অঙ্গে বিরাজ করিতেছে; বায়ু আর গোলাবের গন্ধের ভার বহন করিতে পারে না; অগণিত দাসীবর্গ কেহ বা হৈমকার্য্যখচিত বসন, কেহ বা ইচ্ছামত নীল, লোহিত, শ্যামল, পাটলাদি বর্ণের চীনবাস পরিধান করিয়া অঙ্গের স্বর্ণালঙ্কার প্রতি দীপের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা যাঁহাদিগের দাসী, সে সুন্দরীরা কক্ষে কক্ষে বসিয়া মহাযত্নে বেশ বিন্যাস করিতেছিলেন। আজ নবাব প্রমোদমন্দিরে আসিয়া সকলকেই লইয়া প্রমোদ করিবেন; নৃত্যগীত হইবে। যাহার যাহা অভীষ্ট, সে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইবে! কেহ আজ ভ্রাতার চাকরি করিয়া দিবেন আশায় মাথায় চিরুণী জোরে দিতেছিলেন। অপরা, দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইবেন ভাবিয়া অলকগুচ্ছ বক্ষ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিলেন। কাহারও নবপ্রসূত পুত্রের দানস্বরূপ কিছু সম্পত্তি হস্তগত করা অভিলাষ, এজন্য গণ্ডে রক্তিমাবিকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ঘর্ষণ করিতে করিতে রুধির বাহির করিলেন। কেহ বা নবাবের কোন প্রেয়সী ললনার নবপ্রাপ্ত রত্নালঙ্কারের অনুরূপ অলঙ্কার কামনায় চক্ষুর নীচে আকর্ণ কজ্জল লেপন করিলেন। কোন চণ্ডীকে বসন পরাইতে দাসী পেশোয়াজ মাড়াইয়া ফেলিল; চণ্ডী তাহার গালে একটা চাপড় মারিলেন। কোন প্রগল্ভার বয়োমাহাত্ম্যে কেশরাশির ভার ক্রমে শিথিলমূল হইয়া আসিতেছিল, কেশবিন্যাসকালে দাসী চিরুণী দিতে কতকটি চুল চিরুণীর সঙ্গে উঠিয়া আসিল; দেখিয়া কেশাধিকারিণী দরবিগলিত চক্ষুতে উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

কুসুমবনে স্থলপদ্মবৎ, বিহঙ্গকুলে কলাপীবৎ এক সুন্দরী বেশবিন্যাস সমাপন করিয়া, কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অদ্য কাহারও কোথাও যাইতে বাধা ছিল না।

যেখানকার যে সৌন্দর্য্য, বিধাতা সে সুন্দরীকে তাহা দিয়াছেন; যে স্থানের যে অলঙ্কার, কতলু খাঁ তাহা দিয়াছিল; তথাপি সে রমণীর মুখ-মধ্যে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব বা অলঙ্কার-গর্ব্বচিহ্ন ছিল না। আমোদ, হাসি, কিছুই ছিল না। মুখকান্তি গম্ভীর, স্থির; চক্ষুতে কঠোর জ্বালা।

বিমলা এইরূপ পুরীমধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া এক সুসজ্জীভূত গৃহে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশানন্তর দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। এ উৎসবের দিনেও সে কক্ষমধ্যে একটি মাত্র ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। কক্ষের এক প্রান্তভাগে একখানি পালঙ্ক ছিল। সেই পালঙ্কে আপাদমস্তক শয্যোত্তরচ্ছদে আবৃত হইয়া কেহ শয়ন করিয়া ছিল। বিমলা পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি আসিয়াছি।"

শয়ান ব্যক্তি চমকিতের ন্যায় মুখের আবরণ দূর করিল। বিমলাকে চিনিতে পারিয়া, শয্যোত্তরচ্ছদ ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া বসিল, কোন উত্তর করিল না।

বিমলা পুনরপি কহিলেন, "তিলোত্তমা! আমি আসিয়াছি।"

তিলোত্তমা তথাপি কোন উত্তর করিলেন না। স্থিরদৃষ্টিতে বিমলার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তিলোত্তমা আর ব্রীড়াবিবশা বালিকা নহে। তদ্দণ্ডে তাঁহাকে সেই ক্ষীণালোকে দেখিলে বোধ হইত যে, দশ বৎসর পরিমাণ বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে। দেহ অত্যন্ত শীর্ণ; মুখ মলিন। পরিধান একখানি সঙ্কীর্ণায়তন বাস। অবিন্যস্ত কেশভারে ধূলিরাশি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অঙ্গে অলঙ্কারের লেশ নাই; কেবল পূর্ব্বে যে অলঙ্কার পরিধান করিতেন, তাহার চিহ্ন রহিয়াছে মাত্র।

বিমলা পুনরপি কহিলেন, "আমি আসিব বলিয়াছিলাম—আসিয়াছি। কথা কহিতেছ না কেন?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "যে কথা ছিল, তাহা সকল কহিয়াছি, আর কি কহিব?"

বিমলা তিলোত্তমার স্বরে বুঝিতে পারিলেন যে, তিলোত্তমা রোদন করিতেছিলেন; মস্তকে হস্ত দিয়া তাঁহার মুখ তুলিয়া দেখিলেন, চক্ষুর জলে মুখ প্লাবিত রহিয়াছে; অঞ্চল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, অঞ্চল সম্পূর্ণ আর্দ্র। যে উপাধানে মাথা রাখিয়া তিলোত্তমা শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও প্লাবিত। বিমলা কহিলেন, "এমন দিবানিশি কাঁদিলে শরীর কয় দিন বহিবে?"

তিলোত্তমা আগ্রহসহকারে কহিলেন, "বহিয়া কাজ কি? এত দিন বহিল কেন, এই মনস্তাপ।"

বিমলা নিরুত্তর হইলেন। তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিমলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এখন আজিকার উপায় ?"

তিলোত্তমা অসন্তোষের সহিত বিমলার অলঙ্কারাদির দিকে পুনর্ব্বার চক্ষুঃপাত করিয়া কহিলেন, "উপায়ের প্রয়োজন কি ?"

বিমলা কহিলেন, "বাছা, তাচ্ছিল্য করিও না ; আজও কি কতলু খাঁকে বিশেষ জান না ? আপনার অবকাশ অভাবেও বটে, আমাদিগের শোক নিবারণার্থ অবকাশ দেওয়ার অভিলাষেও বটে, এ পর্য্যন্ত দুরাত্মা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছে ; আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের অবসরের যে সীমা, পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আজ আমাদিগকে নৃত্যশালায় না দেখিলে না জানি কি প্রমাদ ঘটাইবে।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "আবার প্রমাদ কি ?"

বিমলা কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া কহিলেন, "তিলোত্তমা, একবারে নিরাশ হও কেন ? এখনও আমাদিগের প্রাণ আছে, ধর্ম্ম আছে ; যত দিন প্রাণ আছে, তত দিন ধর্ম্ম রাখিব।"

তিলোত্তমা তখন কহিলেন, "তবে মা ! এই সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেল ; তুমি অলঙ্কার পরিয়াছ, আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।"

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাছা, আমার সকল আভরণ না দেখিয়া আমাকে তিরস্কার করিও না।"

এই বলিয়া বিমলা নিজ পরিধেয় বাস মধ্যে লুক্কায়িত এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন ; দীপপ্রভায় তাহার শাণিত ফলক বিদ্যুদ্বৎ চমকিয়া উঠিল। তিলোত্তমা বিস্মিতা ও বিশুষ্কমুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথায় পাইলে ?"

বিমলা কহিলেন, "কাল হইতে অন্তঃপুরমধ্যে এক জন নূতন দাসী আসিয়াছে দেখিয়াছ ?"

তি। দেখিয়াছি—আশ্‌মানি আসিয়াছে।

বি। আশ্‌মানির দ্বারা ইহা অভিরাম স্বামীর নিকট হইতে আনাইয়াছি।

তিলোত্তমা নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন ; তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ বেশ অদ্য ত্যাগ করিবে না ?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "না।"

বি। নৃত্যগীতাদিতে যাইবে না ?

তি। না।

বি। তাহাতেও নিস্তার পাইবে না।

তিলোত্তমা কাঁদিতে লাগিলেন। বিমলা কহিলেন, "স্থির হইয়া শুন, আমি তোমার নিষ্কৃতির উপায় করিয়াছি।" তিলোত্তমা আগ্রহসহকারে বিমলার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা তিলোত্তমার হস্তে ওস্‌মানের অঙ্গুরীয় দিয়া কহিলেন, "এই অঙ্গুরীয় ধর; নৃত্যগৃহে যাইও না; অর্দ্ধরাত্রের এ দিকে উৎসব সম্পূর্ণ হইবেক না; সে পর্য্যন্ত আমি পাঠানকে নিবৃত্ত রাখিতে পারিব। আমি যে তোমার বিমাতা, তাহা সে জানিয়াছে, তুমি আমার সাক্ষাতে আসিতে পারিবে না, এই ছলে নৃত্যগীত সমাধা পর্য্যন্ত তাহার দর্শন-বাঞ্ছা ক্ষান্ত রাখিতে পারিব। অর্দ্ধরাত্রে অন্তঃপুরদ্বারে যাইও; তথায় আর এক ব্যক্তি তোমাকে এইরূপ আর এক অঙ্গুরীয় দেখাইবে। তুমি নির্ভয়ে তাহার সঙ্গে গমন করিও, যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, সে তোমাকে তথা লইয়া যাইবে। তুমি তাহাকে অভিরাম স্বামীর কুটীরে লইয়া যাইতে কহিও।"

তিলোত্তমা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন; বিস্ময়ে হউক বা আহ্লাদে হউক, কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, পরে কহিলেন, "এ বৃত্তান্ত কি? এ অঙ্গুরীয় তোমাকে কে দিল?"

বিমলা কহিলেন, "সে সকল বিস্তর কথা; অন্য সময়ে অবকাশ মত কহিব। এক্ষণে নিঃসঙ্কোচচিত্তে, যাহা বলিলাম, তাহা করিও।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "তোমার কি গতি হইবে? তুমি কি প্রকারে বাহির হইবে?"

বিমলা কহিলেন, "আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি অন্য উপায়ে বাহির হইয়া কাল প্রাতে তোমার সহিত মিলিত হইব।"

এই বলিয়া বিমলা তিলোত্তমাকে প্রবোধ দিলেন; কিন্তু তিনি যে তিলোত্তমার জন্য নিজ মুক্তিপথ রোধ করিলেন, তাহা তিলোত্তমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অনেক দিন তিলোত্তমার মুখে হর্ষবিকাশ হয় নাই; বিমলার কথা শুনিয়া তিলোত্তমার মুখ আজ হর্ষোৎফুল্ল হইল।

বিমলা দেখিয়া অন্তরে পুলকপূর্ণ হইলেন। বাষ্পগদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

তিলোত্তমা কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "দেখিতেছি, তুমি দুর্গের সকল সংবাদ পাইয়াছ, আমাদিগের আত্মীয়বর্গ কোথায়? কে কেমন আছে বলিয়া যাও।"

বিমলা দেখিলেন, এ বিপদ্‌সাগরেও জগৎসিংহ তিলোত্তমার মনোমধ্যে জাগিতেছেন। বিমলা রাজপুত্রের নিষ্ঠুর পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে তিলোত্তমার নামও নাই; এ কথা তিলোত্তমা শুনিলে কেবল দগ্ধের উপর দগ্ধ হইবেন মাত্র; অতএব সে সকল কথা কিছুমাত্র

না বলিয়া উত্তর করিলেন, "জগৎসিংহ এই দুর্গমধ্যেই আছেন; তিনি শারীরিক কুশলে আছেন।"

তিলোত্তমা নীরব হইয়া রহিলেন।

বিমলা চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে তথা হইতে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অঙ্গুরীয় প্রদর্শন

বিমলা গমন করিলে পর, একাকিনী কক্ষমধ্যে বসিয়া তিলোত্তমা যে সকল চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা সুখ দুঃখ উভয়েরই কারণ। পাপাত্মার পিঞ্জর হইতে যে আশু মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, এ কথা মুহুর্মুহুঃ মনে পড়িতে লাগিল; কিন্তু কেবল এই কথাই নহে, বিমলা যে তাঁহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, বিমলা হইতেই যে তাঁহার উদ্ধার হইবার উপায় হইল, ইহা পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া দ্বিগুণ সুখী হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিতে লাগিলেন, "মুক্ত হইলেই বা কোথা যাইব? আর কি পিতৃগৃহ আছে?" তিলোত্তমা আবার কাঁদিতে লাগিলেন। সকল চিন্তার শমতা করিয়া আর এক চিন্তা মনোমধ্যে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। "রাজকুমার তবে কুশলে আছেন? কোথায় আছেন? কি ভাবে আছেন? তিনি কি বন্দী?" এই ভাবিতে ভাবিতে তিলোত্তমা বাষ্পাকুললোচনা হইতে লাগিলেন। "হা অদৃষ্ট! রাজপুত্র আমারই জন্য বন্দী। তাঁহার চরণে প্রাণ দিলেও কি ইহার শোধ হইবে? আমি তাঁহার জন্য কি করিব?" আবার ভাবিতে লাগিলেন, "তিনি কি কারাগারে আছেন? কেমন সে কারাগার? সেখানে কি আর কেহই যাইতে পারে না? তিনি কারাগারে বসিয়া কি ভাবিতেছেন? তিলোত্তমা কি তাঁহার মনে পড়িতেছে? পড়িতেছে বই কি? আমিই যে তাঁহার এ যন্ত্রণার মূল! না জানি, মনে মনে আমাকে কত কটূ বলিতেছেন!" আবার ভাবিতেছেন, "সে কি? আমি এ কথা কেন ভাবি! তিনি কি কাহাকে কটূ বলেন? তা নয়, তবে এই আশঙ্কা, যদি আমাকে ভুলিয়া গিয়া থাকেন। কি যদি আমি যবনগৃহবাসিনী হইয়াছি বলিয়া ঘৃণায় আমাকে আর মনোমধ্যে স্থান না দেন।" আবার ভাবেন, "না না—তা কেন করিবেন; তিনিও যেমন দুর্গমধ্যে বন্দী, আমিও তেমনই বন্দীমাত্র; তবে কেন ঘৃণা করিবেন? তবু যদি করেন, তবে আমি তাঁর পায়ে ধরিয়া বুঝাইব। বুঝিবেন না? বুঝিবেন বই কি। না বুঝেন, তাঁহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব। আগে আগুনে

পরীক্ষা হইত; কলিতে তাহা হয় না; না হউক, আমি না হয় তাঁহার সম্মুখে আগুনে প্রাণত্যাগই করিব!" আবার ভাবেন, "কবেই বা তাঁহার দেখা পাইব? কেমন করিয়া তিনি মুক্ত হইবেন? আমি মুক্ত হইলে কি কার্য্য সিদ্ধ হইল? এ অঙ্গুরীয় বিমাতা কোথা পাইলেন? তাঁহার মুক্তির জন্য এ কৌশল হয় না? এ অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকট পাঠাইলে হয় না? কে আমাকে লইতে আসিবে? তাহার দ্বারা কি কোন উপায় হইতে পারিবে না? ভাল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কি বলে। একবার সাক্ষাৎও কি পাইতে পারিব না?" আবার ভাবেন, "কেমন করিয়াই বা সাক্ষাৎ করিতে চাহিব? সাক্ষাৎ হইলেই বা কি বলিয়াই কথা কহিব? কি কথা বলিয়াই বা মনের জ্বালা জুড়াইব?"

তিলোত্তমা অবিরত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এক জন পরিচারিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তিলোত্তমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রি কত?"

দাসী কহিল, "দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে।" তিলোত্তমা দাসীর বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দাসী প্রয়োজন সমাপন করিয়া চলিয়া গেল, তিলোত্তমা বিমলা-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় লইয়া কক্ষমধ্য হইতে যাত্রা করিলেন। তখন আবার মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল; পা কাঁপে, হৃদয় কাঁপে, মুখ শুকায়; একপদে অগ্রসর, একপদে পশ্চাৎ হইতে লাগিলেন। ক্রমে সাহসে ভর করিয়া অন্তঃপুরদ্বার পর্য্যন্ত গেলেন। পৌরবর্গ খোজা হাব্‌সী প্রভৃতি সকলেই প্রমোদে ব্যস্ত; কেহ তাঁহাকে দেখিল না; দেখিলেও তৎপ্রতি মনোযোগ করিল না; কিন্তু তিলোত্তমার বোধ হইতে লাগিল, যেন সকলেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। কোন ক্রমে অন্তঃপুরদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন; তথায় প্রহরিগণ আনন্দে উন্মত্ত। কেহ নিদ্রিত, কেহ জাগ্রতে অচেতন, কেহ অর্দ্ধচেতন। কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। এক জন মাত্র দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল; সেও প্রহরীর বেশধারী। সে তিলোত্তমাকে দেখিয়া কহিল, "আপনার হাতে আঙ্‌টি আছে?"

তিলোত্তমা সভয়ে বিমলাদত্ত অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। প্রহরিবেশী উত্তমরূপে সেই অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ করিয়া নিজ হস্তস্থ অঙ্গুরীয় তিলোত্তমাকে দেখাইল। পরে কহিল, "আমার সঙ্গে আসুন, কোন চিন্তা নাই।"

তিলোত্তমা চঞ্চল চিত্তে প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অন্তঃপুরদ্বারে প্রহরিগণ যেরূপ শিথিলভাবাপন্ন, সর্ব্বত্র প্রহরিগণ প্রায় সেইরূপ। বিশেষ অদ্য রাত্রে অবারিত দ্বার, কেহই কোন কথা কহিল না। প্রহরী তিলোত্তমাকে লইয়া নানা দ্বার, নানা প্রকোষ্ঠ, নানা প্রাঙ্গণভূমি অতিক্রম করিয়া আসিতে লাগিল। পরিশেষে দুর্গপ্রান্তে ফটকে আসিয়া কহিল, "এক্ষণে কোথায় যাইবেন, আজ্ঞা করুন, লইয়া যাই।"

বিমলা কি বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তিলোত্তমার স্মরণ হইল না। আগে জগৎসিংহকে স্মরণ হইল। ইচ্ছা, প্রহরীকে কহেন, "যথায় রাজপুত্র আছেন, তথায় লইয়া চল।" কিন্তু পূর্ব্বশত্রু লজ্জা আসিয়া বৈর সাধিল। কথা মুখে বাধিয়া আসিল। প্রহরী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় লইয়া যাইব?"

তিলোত্তমা কিছুই বলিতে পারিলেন না; যেন জ্ঞানশূন্যা হইলেন, আপনা আপনিই হৃৎকম্প হইতে লাগিল। নয়নে দেখিতে, কর্ণে শুনিতে পান না; মুখ হইতে কি কথা বাহির হইল, তাহাও কিছু জানিতে পারিলেন না; প্রহরীর কর্ণে অর্দ্ধস্পষ্ট "জগৎসিংহ" শব্দটি প্রবেশ করিল।

প্রহরী কহিল, "জগৎসিংহ এক্ষণে কারাগারে আবদ্ধ আছেন, সে অন্যের অগম্য। কিন্তু আমার প্রতি এমন আজ্ঞা আছে যে, আপনি যথায় যাইতে চাহিবেন, তথায় লইয়া যাইব, আসুন।"

প্রহরী দুর্গমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল। তিলোত্তমা কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিলেন; সেই ভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রহরী কারাগারদ্বারে গমন করিয়া দেখিল যে, অন্যত্র প্রহরিগণ যেরূপ প্রমোদাসক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছে, এখানে সেরূপ নহে, সকলেই স্ব স্ব স্থানে সতর্ক আছে। এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজপুত্র কোন্ স্থানে আছেন?" সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া দিল। অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরী কারাগার-রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্দী এক্ষণে নিদ্রিত, না জাগরিত আছেন?" কারাগার-রক্ষী কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিল, "বন্দীর উত্তর পাইয়াছি, জাগিয়া আছে।"

অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরী রক্ষীকে কহিল, "আমাকে ও কক্ষের দ্বার খুলিয়া দাও, এই স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে যাইবেক।"

রক্ষী চমৎকৃত হইয়া কহিল, "সে কি! এমত হুকুম নাই, তুমি কি জান না?"

অঙ্গুরীয়বাহক কারাগারের প্রহরীকে ওস্‌মানের সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় দেখাইল। সে তৎক্ষণাৎ নতশির হইয়া কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল।

রাজকুমার কক্ষমধ্যে এক সামান্য চৌপায়ার উপর শয়ন করিয়াছিলেন; দ্বারোদ্‌ঘাটন-শব্দ শুনিয়া কৌতূহলপ্রযুক্ত দ্বার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিলোত্তমা বাহির দিকে দ্বারের নিকট আসিয়া আর আসিতে পারিলেন না। আবার পা চলে না; দ্বারপার্শ্বে কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অঙ্গুরীয়বাহক তিলোত্তমাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া কহিল, "এ কি ? আপনি এখানে বিলম্ব করেন কেন ?" তথাপি তিলোত্তমার পা উঠিল না।

প্রহরী পুনর্ব্বার কহিল, "না যান, তবে প্রত্যাগমন করুন। এ দাঁড়াইবার স্থান নহে।"

তিলোত্তমা প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলেন। আবার সে দিকেও পা সরে না। কি করেন! প্রহরী ব্যস্ত হইল। ভাবিতে ভাবিতে আপনার অজ্ঞাতসারে তিলোত্তমা এক পা অগ্রসর হইলেন। তিলোত্তমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্রের দর্শনমাত্র আবার তিলোত্তমার গতিশক্তি রহিত হইল, আবার দ্বারপার্শ্বে প্রাচীর অবলম্বনে অধোমুখে দাঁড়াইলেন।

রাজপুত্র প্রথমে তিলোত্তমাকে চিনিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রমণী প্রাচীর ধরিয়া অধোমুখে দাঁড়াইল, নিকটে আইসে না, দেখিয়া আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারের নিকটে আসিলেন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, চিনিতে পারিলেন।

তিলার্দ্ধ জন্য নয়নে নয়নে মিলিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিলোত্তমার চক্ষু অমনই পৃথিবী-পানে নামিল ; কিন্তু শরীর ঈষৎ সম্মুখে হেলিল, যেন রাজপুত্রের চরণতলে পতিত হইবেন।

রাজপুত্র কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন ; অমনই তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া স্থির রহিল। ক্ষণপ্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া উঠিল। রাজপুত্র কথা কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা ?"

তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধিল। "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা ?" এখনকার কি এই সম্বোধন ? জগৎসিংহ কি তিলোত্তমার নামও ভুলিয়া গিয়াছেন ? উভয়েই ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার রাজপুত্র কথা কহিলেন, "এখানে কি অভিপ্রায়ে ?"

"এখানে কি অভিপ্রায়ে !" কি প্রশ্ন ! তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল ; চারি দিকে কক্ষ, শয্যা, প্রদীপ, প্রাচীর, সকলই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ; অবলম্বনার্থ প্রাচীরে মস্তক দিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজপুত্র অনেকক্ষণ প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন ; কে প্রত্যুত্তর দিবে ? প্রত্যুত্তরের সম্ভাবনা না দেখিয়া কহিলেন, "তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ, ফিরিয়া যাও, পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হও।"

তিলোত্তমার আর ভ্রম রহিল না, অকস্মাৎ বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মোহ

জগৎসিংহ আনত হইয়া দেখিলেন, তিলোত্তমার স্পন্দ নাই। নিজ বস্ত্র দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার কোন সংজ্ঞাচিহ্ন না দেখিয়া প্রহরীকে ডাকিলেন।

তিলোত্তমার সঙ্গী তাঁহার নিকটে আসিল। জগৎসিংহ তাঁহাকে কহিলেন, "ইনি অকস্মাৎ মূচ্ছিতা হইয়াছেন। কে ইঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। তাহাকে আসিয়া শুশ্রূষা করিতে বল।"

প্রহরী কহিল, "কেবল আমিই সঙ্গে আসিয়াছি।" রাজপুত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "তুমি?"

প্রহরী কহিল, "আর কেহ আইসে নাই।"

"তবে কি উপায় হইবে? কোন পৌরদাসীকে সংবাদ কর।"

প্রহরী চলিল। রাজপুত্র আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "শোন, অপর কাহাকে সংবাদ দিলে গোলযোগ হইবে। আর আজ রাত্রে কেই বা প্রমোদ ত্যাগ করিয়া ইঁহার সাহায্যে আসিবে?"

প্রহরী কহিল, "সেও বটে। আর কাহাকেই বা প্রহরীরা কারাগারে প্রবেশ করিতে দিবে? অন্য অন্য লোককে কারাগারে আনিতে আমার সাহস হয় না।"

রাজপুত্র কহিলেন, "তবে কি করিব? ইহার একমাত্র উপায় আছে; তুমি ঝটিতি দাসীর দ্বারা নবাবপুত্রীর নিকট এ কথার সংবাদ কর।"

প্রহরী দ্রুতবেগে তদভিপ্রায়ে চলিল। রাজপুত্র সাধ্যমত তিলোত্তমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র মনে কি ভাবিতেছিলেন, কে বলিবে? চক্ষুতে জল আসিয়াছিল কি না, কে বলিবে?

রাজকুমার একাকী কারাগারে তিলোত্তমাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। যদি আয়েষার নিকট সংবাদ যাইতে না পারে, যদি আয়েষা কোন উপায় করিতে না পারেন, তবে কি হইবে?

তিলোত্তমার ক্রমে অল্প অল্প চেতনা হইতে লাগিল। সেই ক্ষণেই মুক্ত দ্বারপথে জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন যে, প্রহরীর সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোক আসিতেছে, এক জন অবগুণ্ঠনবতী। দূর হইতেই, অবগুণ্ঠনবতীর উন্নত শরীর, সঙ্গীতমধুর-পদবিন্যাস লাবণ্যময় গ্রীবাভঙ্গী দেখিয়া রাজপুত্র জানিতে পারিলেন যে, দাসী সঙ্গে আয়েষা স্বয়ং আসিতেছেন, আর যেন সঙ্গে সঙ্গে ভরসা আসিতেছে।

আয়েষা ও দাসী প্রহরীর সঙ্গে কারাগার-দ্বারে আসিলে, দ্বাররক্ষক, অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদেরও যাইতে দিতে হইবে কি ?"

অঙ্গুরীয়বাহক কহিল, "তুমি জান—আমি জানি না।" রক্ষী কহিল, "উত্তম।" এই বলিয়া স্ত্রীলোকদিগকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। নিষেধ শুনিয়া আয়েষা মুখের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া কহিলেন, "প্রহরী! আমাকে প্রবেশ করিতে দাও; যদি ইহাতে তোমার প্রতি কোন মন্দ ঘটে, আমার দোষ দিও।"

প্রহরী আয়েষাকে চিনিত না। কিন্তু দাসী চুপি চুপি পরিচয় দিল। প্রহরী বিস্মিত হইয়া অভিবাদন করিল এবং করযোড়ে কহিল, "দীনের অপরাধ মার্জ্জনা হয়, আপনার কোথাও যাইতে নিষেধ নাই।"

আয়েষা কারাগারমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে তিনি হাসিতেছিলেন না, কিন্তু মুখ স্বতঃ সহাস্য; বোধ হইল হাসিতেছেন। কারাগারের শ্রী ফিরিল; কাহারও বোধ রহিল না যে, এ কারাগার।

আয়েষা রাজপুত্রকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! এ কি সংবাদ ?"

রাজপুত্র কি উত্তর করিবেন ? উত্তর না করিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে ভূতলশায়িনী তিলোত্তমাকে দেখাইয়া দিলেন।

আয়েষা তিলোত্তমাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে ?"

রাজপুত্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

আয়েষা তিলোত্তমাকে কোলে করিয়া বসিলেন। আর কেহ কোনরূপ সঙ্কোচ করিতে পারিত; সাত পাঁচ ভাবিত; আয়েষা একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

আয়েষা যাহা করিতেন, তাহাই সুন্দর দেখাইত; সকল কার্য্য সুন্দর করিয়া করিতে পারিতেন। যখন তিলোত্তমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন, জগৎসিংহ আর দাসী উভয়েই মনে মনে ভাবিলেন, "কি সুন্দর!"

দাসীর হস্ত দিয়া আয়েষা গোলাব সরবত প্রভৃতি আনিয়াছিলেন; তিলোত্তমাকে তৎসমুদায় সেবন ও সেচন করাইতে লাগিলেন। দাসী ব্যজন করিতে লাগিল, পূর্ব্বে তিলোত্তমার চেতনা হইয়া আসিতেছিল; এক্ষণে আয়েষার শুশ্রূষায় সম্পূর্ণরূপ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন।

চারি দিক্ চাহিবা মাত্র পূর্ব্বকথা মনে পড়িল; তৎক্ষণাৎ তিলোত্তমা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু এ রাত্রির শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে শীর্ণ তনু অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল; যাইতে পারিলেন না, পূর্ব্বকথা স্মরণ হইবামাত্র মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া অমনি আবার বসিয়া পড়িলেন। আয়েষা তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "ভগিনি!

তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ? তুমি এক্ষণে অতি দুর্ব্বল, আমার গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিবে চল, পরে তোমার যখন ইচ্ছা, তখন অভিপ্রেত স্থানে তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

তিলোত্তমা উত্তর করিলেন না।

আয়েষা প্রহরীর নিকট, সে যত দূর জানে, সকলই শুনিয়াছিলেন, অতএব তিলোত্তমার মনে সন্দেহ আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, "আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ কেন? আমি তোমার শত্রুকন্যা বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে অবিশ্বাসিনী বিবেচনা করিও না! আমা হইতে কোন কথা প্রকাশ হইবে না। রাত্রি অবসান হইতে না হইতে যেখানে যাইবে, সেইখানে দাসী দিয়া পাঠাইয়া দিব। কেহ কোন কথা প্রকাশ করিবে না।"

এই কথা আয়েষা এমন সুমিষ্টস্বরে কহিলেন যে, তিলোত্তমার তৎপ্রতি কিছুমাত্র অবিশ্বাস হইল না। বিশেষ এক্ষণে চলিতেও আর পারেন না, জগৎসিংহের নিকট বসিয়াও থাকিতে পারেন না, সুতরাং স্বীকৃতা হইলেন। আয়েষা কহিলেন, "তুমি ত চলিতে পারিবে না। এই দাসীর উপর শরীরের ভর রাখিয়া চল।"

তিলোত্তমা দাসীর স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া তদবলম্বনে ধীরে ধীরে চলিলেন। আয়েষাও রাজপুত্রের নিকট বিদায় হয়েন; রাজপুত্র তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছু বলিবেন। আয়েষা ভাব বুঝিতে পারিয়া দাসীকে কহিলেন, "তুমি ইহাকে আমার শয়নাগারে বসাইয়া পুনর্ব্বার আসিয়া আমাকে লইয়া যাইও।"

দাসী তিলোত্তমাকে লইয়া চলিল।

জগৎসিংহ মনে মনে কহিলেন, "তোমায় আমায় এই দেখা শুনা।" গম্ভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। যতক্ষণ তিলোত্তমাকে দ্বারপথে দেখা গেল, ততক্ষণ তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তিলোত্তমাও ভাবিতেছিলেন, "আমার এই দেখা শুনা।" যতক্ষণ দৃষ্টিপথে ছিলেন, ততক্ষণ ফিরিয়া চাহিলেন না। যখন ফিরিয়া চাহিলেন, তখন আর জগৎসিংহকে দেখা গেল না।

অঙ্গুরীয়বাহক তিলোত্তমার নিকটে আসিয়া কহিল, "তবে আমি বিদায় হই?"

তিলোত্তমা উত্তর দিলেন না। দাসী কহিল, "হাঁ।" প্রহরী কহিল, "তবে আপনার নিকট যে সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় আছে, ফিরাইয়া দিউন।"

তিলোত্তমা অঙ্গুরীয় লইয়া প্রহরীকে দিলেন। প্রহরী বিদায় হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মুক্ত কণ্ঠ

তিলোত্তমা ও দাসী কক্ষমধ্য হইতে গমন করিলে আয়েষা শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন ; তথায় আর বসিবার আসন ছিল না। জগৎসিংহ নিকটে দাঁড়াইলেন।

আয়েষা কবরী হইতে একটি গোলাব খসাইয়া তাহার দলগুলি নখে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিলেন, "রাজকুমার, ভাবে বোধ হইতেছে যে, আপনি আমাকে কি বলিবেন। আমা হইতে যদি কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে, তবে বলিতে সঙ্কোচ করিবেন না ; আমি আপনার কার্য্য করিতে পরম সুখী হইব।"

রাজকুমার কহিলেন, "নবাবপুত্রি, এক্ষণে আমার কিছুরই বিশেষ প্রয়োজন নাই। সে জন্য আপনার সাক্ষাতের অভিলাষী ছিলাম না। আমার এই কথা যে, আমি যে দশাপন্ন হইয়াছি, ইহাতে আপনার সহিত পুনর্ব্বার দেখা হইবে, এমন ভরসা করি না, বোধ করি এই শেষ দেখা। আপনার কাছে যে ঋণে বদ্ধ আছি, তাহা কথায় প্রতিশোধ কি করিব? আর কার্য্যেও কখন যে তাহার প্রতিশোধ করিব, সে অদৃষ্টের ভরসা করি না। তবে এই ভিক্ষা যে, যদি কখন সাধ্য হয়, যদি কখন অন্য দিন হয়, তবে আমার প্রতি কোন আজ্ঞা করিতে সঙ্কোচ করিবেন না।"

জগৎসিংহের স্বর এতাদৃশ সকাতর, নৈরাশ্যব্যঞ্জক যে, তাহাতে আয়েষাও ক্লিষ্ট হইলেন, আয়েষা কহিলেন, "আপনি এত নির্ভরসা হইতেছেন কেন? এক দিনের অমঙ্গল পর দিনে থাকে না।"

জগৎসিংহ কহিলেন, "আমি নির্ভরসা হই নাই, কিন্তু আমার আর ভরসা করিতে ইচ্ছা করে না। এ জীবন ত্যাগ করিতে ব্যতীত আর ধারণ করিতে ইচ্ছা করে না। এ কারাগার ত্যাগ করিতে বাসনা করি না। আমার মনের সকল দুঃখ আপনি জানেন না, আমি জানাইতেও পারি না।"

যে করুণ স্বরে রাজপুত্র কথা কহিলেন, তাহাতে আয়েষা বিস্মিত হইলেন, অধিকতর কাতর হইলেন। তখন আর নবাবপুত্রী-ভাব রহিল না; দূরতা রহিল না; স্নেহময়ী রমণী, রমণীর ন্যায় যত্নে, কোমল করপল্লবে রাজপুত্রের কর ধারণ করিলেন, আবার তখনই তাঁহার হস্ত ত্যাগ করিয়া, রাজপুত্রের মুখপানে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "কুমার! এ দারুণ দুঃখ তোমার হৃদয়মধ্যে কেন? আমাকে পর জ্ঞান করিও না। যদি সাহস দাও, তবে বলি,—বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা কি—"

আয়েষার কথা শেষ হইতে না হইতেই রাজকুমার কহিলেন, "ও কথায় আর কাজ কি! সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে।"

আয়েষা নীরবে রহিলেন; জগৎসিংহও নীরবে রহিলেন, উভয়ে বহু ক্ষণ নীরবে রহিলেন; আয়েষা তাঁহার উপর মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

রাজপুত্র অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার করপল্লবে কবোষ্ণ বারিবিন্দু পড়িল। জগৎসিংহ দৃষ্টি নিম্ন করিয়া আয়েষার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, আয়েষা কাঁদিতেছেন; উজ্জ্বল গণ্ডস্থলে দর দর ধারা বহিতেছে।

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ কি আয়েষা? তুমি কাঁদিতেছ?"

আয়েষা কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে গোলাব ফুলটি নিঃশেষে ছিন্ন করিলেন। পুষ্প শত খণ্ড হইলে কহিলেন, "যুবরাজ! আজ যে তোমার নিকট এ ভাবে বিদায় লইব, তাহা মনে ছিল না। আমি অনেক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু কারাগারে তোমাকে একাকী যে এ মনঃপীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে রাখিয়া যাইব, তাহা পারিতেছি না। জগৎসিংহ! তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে আইস; অশ্বশালায় অশ্ব আছে, দিব; অদ্য রাত্রেই নিজ শিবিরে যাইও।"

তদ্দণ্ডে যদি ইষ্টদেবী ভবানী সশরীরে আসিয়া বরপ্রদা হইতেন, তথাপি রাজপুত্র অধিক চমৎকৃত হইতে পারিতেন না। রাজপুত্র প্রথমে উত্তর করিতে পারিলেন না। আয়েষা পুনর্ব্বার কহিলেন, "জগৎসিংহ! রাজকুমার! এস।"

জগৎসিংহ অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "আয়েষা! তুমি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিবে?"

আয়েষা কহিলেন, "এই দণ্ডে।"

রা। তোমার পিতার অজ্ঞাতে?

আ। সে জন্য চিন্তা করিও না, তুমি শিবিরে গেলে—আমি তাঁহাকে জানাইব।

"প্রহরীরা যাইতে দিবে কেন?"

আয়েষা কণ্ঠ হইতে রত্নকণ্ঠী ছিঁড়িয়া দেখাইয়া কহিলেন, "এই পুরস্কার লোভে প্রহরী পথ ছাড়িয়া দিবে।"

রাজপুত্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "এ কথা প্রকাশ হইলে তুমি তোমার পিতার নিকট যন্ত্রণা পাইবে।"

"তাহাতে ক্ষতি কি?"

"আয়েষা! আমি যাইব না।"

আয়েষার মুখ শুষ্ক হইল। ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। তোমার নিকট প্রাণ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, তোমার যাহাতে যন্ত্রণা হইবে, তাহা আমি কদাচ করিব না।

আয়েষা প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "নিশ্চিত যাইবে না?"

রাজকুমার কহিলেন, "তুমি একাকিনী যাও।"

আয়েষা পুনর্ব্বার নীরব হইয়া রহিলেন। আবার চক্ষে দর দর ধারা বিগলিত হইতে লাগিল; আয়েষা কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র আয়েষার নিঃশব্দ রোদন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কহিলেন, "আয়েষা! রোদন করিতেছ কেন?"

আয়েষা কথা কহিলেন না। রাজপুত্র আবার কহিলেন, "আয়েষা! আমার অনুরোধ রাখ, রোদনের কারণ যদি প্রকাশ্য হয়, তবে আমার নিকট প্রকাশ কর। যদি আমার প্রাণদান করিলে তোমার নীরব রোদনের কারণ নিরাকরণ হয়, তাহা আমি করিব। আমি যে বন্দিত্ব স্বীকার করিলাম, কেবল ইহাতেই কখনও আয়েষার চক্ষে জল আইসে নাই। তোমার পিতার কারাগারে আমার ন্যায় অনেক বন্দী কষ্ট পাইয়াছে।"

আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথায় উত্তর না করিয়া অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিলেন। ক্ষণেক নীরব নিস্পন্দ থাকিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! আমি আর কাঁদিব না।"

রাজপুত্র প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। উভয়ে আবার নীরবে মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

প্রকোষ্ঠ-প্রাকারে আর এক ব্যক্তির ছায়া পড়িল; কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া উভয়ের নিকটে দাঁড়াইল, তথাপি দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক স্তম্ভের ন্যায় স্থির দাঁড়াইয়া, পরে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে আগন্তুক কহিল, "নবাবপুত্রি! এ উত্তম।"

উভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিলেন,—ওস্‌মান।

ওস্‌মান তাঁহার অনুচর অঙ্গুরীয়বাহকের নিকট সবিশেষ অবগত হইয়া আয়েষার সন্ধানে আসিয়াছিলেন। রাজপুত্র, ওস্‌মানকে সে স্থলে দেখিয়া আয়েষার জন্য শঙ্কান্বিত হইলেন, পাছে আয়েষা, ওস্‌মান বা কতলু খাঁর নিকট তিরস্কৃতা বা অপমানিতা হন। ওস্‌মান যে ক্রোধপ্রকাশক স্বরে ব্যঙ্গোক্তি করিলেন, তাহাতে সেইরূপ সম্ভাবনা বোধ হইল। ব্যঙ্গোক্তি শুনিবামাত্র আয়েষা ওস্‌মানের কথার অভিপ্রায় নিঃশেষ বুঝিতে পারিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। আর কোন অধৈর্য্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। স্থির স্বরে উত্তর করিলেন, "কি উত্তম, ওস্‌মান?"

ওস্‌মান পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে কহিলেন, "নিশীথে একাকিনী বন্দিসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম। বন্দীর জন্য নিশীথে কারাগারে অনিয়ম প্রবেশও উত্তম।"

আয়েষার পবিত্র চিত্তে এ তিরস্কার সহনাতীত হইল। ওস্মানের মুখপানে চাহিয়া উত্তর করিলেন। সেরূপ গর্ব্বিত স্বর ওস্মান কখন আয়েষার কণ্ঠে শুনেন নাই।

আয়েষা কহিলেন, "এ নিশীথে একাকিনী কারাগারমধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা, আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।"

ওস্মান বিস্মিত হইলেন, বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন; কহিলেন, "প্রয়োজন আছে কি না, কাল প্রাতে নবাবের মুখে শুনিবে।"

আয়েষা পূর্ব্ববৎ কহিলেন, "যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাহার উত্তর দিব। তোমার চিন্তা নাই।"

ওস্মান পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি?"

আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে ওস্মানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহার বিশাল লোচন আরও যেন বর্দ্ধিতায়তন হইল। মুখ-পদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ ঈষৎ এক দিকে হেলিল; হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবালজালবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল; অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন, "ওস্মান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!"

যদি তন্মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে রাজপুত কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতে পারিতেন না। রাজপুত্রের মনে অন্ধকার-মধ্যে যেন কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। আয়েষার নীরব রোদন এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন। ওস্মান কতক কতক ঘুণাক্ষরে পূর্ব্বেই এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই আয়েষার প্রতি এরূপ তিরস্কার করিতেছিলেন, কিন্তু আয়েষা তাঁহার সম্মুখেই মুক্তকণ্ঠে কথা ব্যক্ত করিবেন, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর। ওস্মান নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

আয়েষা পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "শুন, ওস্মান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর,—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইহার শোণিতে আর্দ্র হয়—" বলিতে বলিতে আয়েষা শিহরিয়া উঠিলেন; "তথাপি দেখিবে, হৃদয়-মন্দিরে ইঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর যদি আর চিরন্তন ইঁহার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব। আরও শুন; মনে কর এতক্ষণ একাকিনী কি কথা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, আমি দৌবারিকগণকে বাক্যে পারি, ধনে পারি, বশীভূত

করিয়া দিব; পিতার অশ্বশালা হইতে অশ্ব দিব; বন্দী পিতৃশিবিরে এখনই চলিয়া যাউন। বন্দী নিজে পলায়নে অস্বীকৃত হইলেন। নচেৎ তুমি এতক্ষণ ইঁহার নখাগ্রও দেখিতে পাইতে না।"

আয়েষা আবার অশ্রুজল মুছিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্য প্রকার স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওস্‌মান, এ সকল কথা বলিয়া তোমাকে ক্লেশ দিতেছি, অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি আমায় স্নেহ কর, আমি তোমায় স্নেহ করি; এ আমার অনুচিত। কিন্তু তুমি আজি আয়েষাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছ। আয়েষা অন্য যে অপরাধ করুক, অবিশ্বাসিনী নহে। আয়েষা যে কর্ম্ম করে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে। এখন তোমার সাক্ষাৎ বলিলাম, প্রয়োজন হয়, কাল পিতার সমক্ষে বলিব।"

পরে জগৎসিংহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওস্‌মান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্যকর্ণগোচর হইত না।"

রাজপুত্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন; অন্তঃকরণ সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিল।

ওস্‌মান কথা কহিলেন না। আয়েষা আবার বলিতে লাগিলেন, "ওস্‌মান, আবার বলি, যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ব্বমত স্নেহপরায়ণা ভগিনী; ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্ব্বস্নেহের লাঘব করিও না। কপালের দোষে সন্তাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, ভ্রাতৃস্নেহে নিরাশ করিয়া আমায় অতল জলে ডুবাইও না।"

এই বলিয়া সুন্দরী দাসীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা না করিয়া একাকিনী বহির্গতা হইলেন। ওস্‌মান কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের ন্যায় বিনা বাক্যে থাকিয়া, নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দাসী চরণে

সেই রজনীতে কতলু খাঁর বিলাস-গৃহমধ্যে নৃত্য হইতেছিল। তথায় অপরা নর্ত্তকী কেহ ছিল না—বা অপর শ্রোতা কেহ ছিল না। জন্মদিনোপলক্ষে মোগল সম্রাটেরা যেরূপ পারিষদমণ্ডলী মধ্যে আমোদ-পরায়ণ থাকিতেন, কতলু খাঁর সেরূপ ছিল না। কতলু খাঁর চিত্ত একান্ত আত্মসুখরত, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষী। অদ্য রাত্রে তিনি একাকী নিজ বিলাস-গৃহনিবাসিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগের নৃত্যগীত কৌতুকে মত্ত ছিলেন। খোজাগণ ব্যতীত অন্য পুরুষ তথায় আসিবার অনুমতি ছিল না। রমণীগণ কেহ নাচিতেছে,

কেহ গায়িতেছে, কেহ বাদ্য করিতেছে; অপর সকলে কতলু খাঁকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া শুনিতেছে।

ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর সামগ্রী সকলই তথায় প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। কক্ষমধ্যে প্রবেশ কর; প্রবেশ করিবামাত্র অবিরত সিঞ্চিত গন্ধবারির স্নিগ্ধ ঘ্রাণে আপাদমস্তক শীতল হয়। অগণিত রজত দ্বিরদরদ স্ফাটিক শামাদানের তীব্রোজ্জ্বল জ্বালা নয়ন ঝলসিতেছিল; অপরিমিত পুষ্পরাশি কোথাও মালাকারে, কোথাও স্তূপাকারে, কোথাও স্তবকাকারে, কোথাও রমণী-কেশপাশে, কোথাও রমণীকণ্ঠে, স্নিগ্ধতর প্রভা প্রকাশিত করিতেছে। কাহার পুষ্পব্যজন, কাহারও পুষ্প আভরণ, কেহ বা অন্যের প্রতি পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণ করিতেছে; পুষ্পের সৌরভ; সুরভি বারির সৌরভ; সুগন্ধ দীপের সৌরভ; গন্ধদ্রব্যমার্জ্জিত বিলাসিনীগণের অঙ্গের সৌরভ; পুরীমধ্যে সর্ব্বত্র সৌরভে ব্যাপ্ত। প্রদীপের দীপ্তি, পুষ্পের দীপ্তি, রমণীগণের রত্নালঙ্কারের দীপ্তি, সর্ব্বোপরি ঘন ঘন কটাক্ষ-বর্ষিণী কামিনীমণ্ডলীর উজ্জ্বল নয়নদীপ্তি। সপ্তসুরসম্মিলিত মধুর বীণাদি বাদ্যের ধ্বনি আকাশ ব্যাপিয়া উঠিতেছে, তদধিক পরিষ্কার মধুরনিনাদিনী রমণীকণ্ঠগীতি তাহার সহিত মিশিয়া উঠিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাললয়মিলিত পাদবিক্ষেপে নর্ত্তকীর অলঙ্কারশিঞ্জিত শব্দ মনোমুগ্ধ করিতেছে।

ঐ দেখ পাঠক! যেন পদ্মবনে হংসী সমীরণোত্থিত তরঙ্গহিল্লোলে নাচিতেছে; প্রফুল্ল পদ্মমুখী সবে ঘেরিয়া রহিয়াছে। দেখ, দেখ, ঐ যে সুন্দরী নীলাম্বরপরিধানা, ঐ যার নীল বাস স্বর্ণতারাবলীতে খচিত, দেখ! ঐ যে দেখিতেছ, সুন্দরী সীমন্তপার্শ্বে হীরকতারা ধারণ করিয়াছে, দেখিয়াছ উহার কি সুন্দর ললাট! প্রশান্ত, প্রশস্ত, পরিষ্কার; এ ললাটে কি বিধাতা বিলাসগৃহ লিখিয়াছিলেন? ঐ যে শ্যামা পুষ্পাভরণা, দেখিয়াছ উহার কেমন পুষ্পাভরণ সাজিয়াছে? নারীদেহ শোভার জন্যই পুষ্প-সৃজন হইয়াছিল। ঐ যে দেখিতেছ সম্পূর্ণ, মৃদুরক্ত, ওষ্ঠাধর যার; যে ওষ্ঠাধর ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া রহিয়াছে, দেখ, উহার সুচিক্কণ নীল বাস ফুটিয়া কেমন বর্ণপ্রভা বাহির হইতেছে; যেন নির্ম্মল নীলাম্বুমধ্যে পূর্ণচন্দ্রালোক দেখা যাইতেছে। এই যে সুন্দরী মরালনিন্দিত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে, দেখিয়াছ উহার কেমন কর্ণের কুণ্ডল দুলিতেছে? কে তুমি সুকেশি সুন্দরি? কেন উরঃপর্য্যন্ত কুঞ্চিতালক-রাশি লম্বিত করিয়া দিয়াছ? পদ্মবৃক্ষে কেমন করিয়া কাল ফণিনী জড়ায়, তাহাই কি দেখাইতেছ?

আর, তুমি কে সুন্দরি, যে কতলু খাঁর পার্শ্বে বসিয়া হেমপাত্রে সুরা ঢালিতেছ? কে তুমি, যে সকল রাখিয়া তোমার পূর্ণলাবণ্য দেহ প্রতি কতলু খাঁ ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে? কে তুমি অব্যর্থ কটাক্ষে কতলু খাঁর হৃদয় ভেদ করিতেছ? ও মধুর কটাক্ষ চিনি; তুমি বিমলা। অত সুরা ঢালিতেছ কেন? ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল, বসন মধ্যে

ছুরিকা আছে ত? আছে বই কি। তবে অত হাসিতেছ কিরূপে? কতলু খাঁ তোমার মুখপানে চাহিতেছে। ও কি? কটাক্ষ! ও কি, আবার কি! ঐ দেখ, সুরাস্বাদ-প্রমত্ত যবনকে ক্ষিপ্ত করিলে। এই কৌশলেই বুঝি সকলকে বর্জ্জিত করিয়া কতলু খাঁর প্রেয়সী হইয়া বসিয়াছ? না হবে কেন, যে হাসি, যে অঙ্গভঙ্গী, যে সরস কথারহস্য, যে কটাক্ষ! আবার সরাব! কতলু খাঁ, সাবধান! কতলু খাঁ কি করিবে! যে চাহনি চাহিয়া বিমলা হাতে সুরাপাত্র দিতেছে! ও কি ধ্বনি? এ কে গায়? এ কি মানুষের গান, না, সুররমণী গায়? বিমলা গায়িকাদিগের সহিত গায়িতেছে। কি সুর! কি ধ্বনি! কি লয়! কতলু খাঁ, এ কি? মন কোথায় তোমার? কি দেখিতেছ? সমে সমে হাসিয়া কটাক্ষ করিতেছে; ছুরির অধিক তোমার হৃদয়ে বসাইতেছে, তাহাই দেখিতেছ? অমনি কটাক্ষে প্রাণহরণ করে, আবার সঙ্গীতের সন্ধিসম্বন্ধ কটাক্ষ! আরও দেখিয়াছ কটাক্ষের সঙ্গে আবার অল্প মস্তক-দোলন? দেখিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে কেমন কর্ণাভরণ দুলিতেছে? হাঁ। আবার সুরা ঢাল, দে মদ দে, এ কি! এ কি! বিমলা উঠিয়া নাচিতেছে। কি সুন্দর! কিবা ভঙ্গী! দে মদ! কি অঙ্গ! কি গঠন! কতলু খাঁ! জাঁহাপনা! স্থির হও! স্থির! উঃ! কতলুর শরীরে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। পিয়ালা! আহা! দে পিয়ালা! মেরি পিয়ারী! আবার কি? এর উপর হাসি, এর উপর কটাক্ষ? সরাব! দে সরাব!

কতলু খাঁ উন্মত্ত হইল। বিমলাকে ডাকিয়া কহিল, "তুমি কোথা, প্রিয়তমে!"

বিমলা কতলু খাঁর স্কন্ধে এক বাহু দিয়া কহিলেন, "দাসী শ্রীচরণে।"—অপর করে ছুরিকা—

তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর চীৎকার ধ্বনি করিয়া বিমলাকে কতলু খাঁ দূরে নিক্ষেপ করিল; এবং যেই নিক্ষেপ করিল, অমনি আপনিও ধরাতলশায়ী হইল। বিমলা তাহার বক্ষঃস্থলে আমূল তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছিলেন।

"পিশাচী—সয়তানী!" কতলু খাঁ এই কথা বলিয়া চীৎকার করিল। "পিশাচী নহি—সয়তানী নহি—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী।" এই বলিয়া বিমলা কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন।

কতলু খাঁর বাঙ্‌নিষ্পত্তি-ক্ষমতা ঝটিতি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি সাধ্যমত চীৎকার করিতে লাগিল। বিবিরা যথাসাধ্য চীৎকার করিতে লাগিল। বিমলা চীৎকার করিতে করিতে ছুটিলেন। কক্ষান্তরে গিয়া কথোপকথন শব্দ পাইলেন। বিমলা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। এক কক্ষপরে দেখেন, তথায় প্রহরী ও খোজাগণ রহিয়াছে। চীৎকার শুনিয়া ও বিমলার ত্রস্ত ভাব দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

প্রত্যুৎপন্নমতি বিমলা কহিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শীঘ্র যাও, কক্ষমধ্যে মোগল প্রবেশ করিয়াছে, বুঝি নবাবকে খুন করিল।"

প্রহরী ও খোজাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে কক্ষাভিমুখে ছুটিল। বিমলাও ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুর-দ্বারাভিমুখে পলায়ন করিলেন। দ্বারে প্রহরী প্রমোদক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, বিমলা বিনা বিঘ্নে দ্বার অতিক্রম করিলেন। দেখিলেন, সর্ব্বত্রই প্রায় ঐরূপ, অবাধে দৌড়িতে লাগিলেন। বাহির ফটকে দেখিলেন, প্রহরিগণ জাগরিত। এক জন বিমলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও, কোথা যাও ?"

তখন অন্তঃপুরমধ্যে মহা কোলাহল উঠিয়াছে, সকল লোক জাগিয়া সেই দিকে ছুটিতেছিল। বিমলা কহিলেন, "বসিয়া কি করিতেছ, গোলযোগ শুনিতেছ না ?"

প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের গোলযোগ ?"

বিমলা কহিলেন, "অন্তঃপুরে সর্ব্বনাশ হইতেছে, নবাবের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে।"

প্রহরিগণ ফটক ফেলিয়া দৌড়িল ; বিমলা নির্ব্বিঘ্নে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বিমলা ফটক হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, এক জন পুরুষ এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছেন। দৃষ্টিমাত্র বিমলা তাঁহাকে অভিরাম স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বিমলা তাঁহার নিকট যাইবা মাত্র অভিরাম স্বামী কহিলেন, "আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইতেছিলাম ; দুর্গমধ্যে কোলাহল কিসের ?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "আমি বৈধব্য যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিয়া আসিয়াছি। এখানে আর অধিক কথায় কাজ নাই, শীঘ্র আশ্রমে চলুন ; পরে সবিশেষ নিবেদিব। তিলোত্তমা আশ্রমে গিয়াছে ত ?"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "তিলোত্তমা অগ্রে অগ্রে আশ্‌মানির সহিত যাইতেছে, শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবেক।"

এই বলিয়া উভয়ে দ্রুতবেগে চলিলেন। অচিরাৎ কুটীর মধ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ক্ষণপূর্ব্বেই আয়েষার অনুগ্রহে তিলোত্তমা আশ্‌মানির সঙ্গে তথায় আসিয়াছেন। তিলোত্তমা অভিরাম স্বামীর পদযুগলে প্রণত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অভিরাম স্বামী তাঁহাকে স্থির করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় তোমরা দুরাত্মার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে, এখন আর তিলার্দ্ধ এদেশে তিষ্ঠান নহে। যবনেরা সন্ধান পাইলে এবারে প্রাণে মারিয়া প্রভুর মৃত্যুশোক নিবারণ করিবে। আমরা অদ্য রাত্রিতে এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাই চল।"

সকলেই এ পরামর্শে সম্মত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অন্তিম কাল

বিমলার পলায়নের ক্ষণমাত্র পরেই এক জন কর্ম্মচারী অতিব্যস্তে জগৎসিংহের কারাগারমধ্যে আসিয়া কহিল, "যুবরাজ! নবাব সাহেবের মৃত্যুকাল উপস্থিত, তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

যুবরাজ চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি!"

রাজপুরুষ কহিলেন, "অন্তঃপুর মধ্যে শত্রু প্রবেশ করিয়া নবাব সাহেবকে আঘাত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এখনও প্রাণত্যাগ হয় নাই, কিন্তু আর বিলম্ব নাই, আপনি ঝটিতি চলুন, নচেৎ সাক্ষাৎ হইবে না।"

রাজপুত্র কহিলেন, "এ সময়ে আমার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন?"

দূত কহিল, "কি জানি? আমি বার্ত্তাবহ মাত্র।"

যুবরাজ দূতের সহিত অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখেন যে, কতলু খাঁর জীবন-প্রদীপ সত্য সত্যই নির্ব্বাণ হইয়া আসিয়াছে, অন্ধকারের আর বিলম্ব নাই, চতুর্দ্দিকে ওস্‌মান, আয়েষা, মুমূর্ষুর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ, পত্নী, উপপত্নী, দাসী, অমাত্যবর্গ প্রভৃতি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। রোদনাদির কোলাহল পড়িয়াছে; প্রায় সকলেই উচ্চরবে কাঁদিতেছে; শিশুগণ না বুঝিয়া কাঁদিতেছে; আয়েষা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে না। আয়েষার নয়ন-ধারায় মুখ প্লাবিত হইতেছে; নিঃশব্দে পিতার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। জগৎসিংহ দেখিলেন, সে মূর্ত্তি স্থির, গম্ভীর, নিস্পন্দ।

যুবরাজ প্রবেশ মাত্র খ্বাজা ইসা নামে অমাত্য তাঁহার কর ধরিয়া কতলু খাঁর নিকটে লইলেন; যেরূপ উচ্চস্বরে বধিরকে সম্ভাষণ করিতে হয়, সেইরূপ স্বরে কহিলেন, "যুবরাজ জগৎসিংহ আসিয়াছেন।"

কতলু খাঁ ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমি শত্রু; মরি;—রাগ দ্বেষ ত্যাগ।"

জগৎসিংহ বুঝিয়া কহিলেন, "এ সময়ে ত্যাগ করিলাম।"

কতলু খাঁ পুনরপি সেইরূপ স্বরে কহিলেন, "যাচ্ঞা—স্বীকার।"

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি স্বীকার করিব?"

কতলু খাঁ পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "বালক সব—যুদ্ধ—বড় তৃষা।"

আয়েষা মুখে সর্‌বত সিঞ্চন করিলেন।

"যুদ্ধ—কাজ নাই—সন্ধি—"

কতলু খাঁ নীরব হইলেন। জগৎসিংহ কোন উত্তর করিলেন না। কতলু খাঁ তাঁহার মুখপানে উত্তর প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিলেন। উত্তর না পাইয়া কষ্টে কহিলেন, "অস্বীকার?"

যুবরাজ কহিলেন, "পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করিলে আমি সন্ধির জন্য অনুরোধ করিতে স্বীকার করিলাম।"

কতলু খাঁ পুনরপি অর্দ্ধস্ফুটশ্বাসে কহিলেন, "উড়িষ্যা?"

রাজপুত্র বুঝিয়া কহিলেন, "যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তবে আপনার পুত্রেরা উড়িষ্যাচ্যুত হইবে না।"

কতলুর মৃত্যু-ক্লেশ-নিপীড়িত মুখকান্তি প্রদীপ্ত হইল।

মুমূর্ষু কহিল, "আপনি—মুক্ত—জগদীশ্বর—মঙ্গল—" জগৎসিংহ চলিয়া যান, আয়েষা মুখ অবনত করিয়া পিতাকে কি কহিয়া দিলেন। কতলু খাঁ খ্বাজা ইসার প্রতি চাহিয়া আবার প্রতিগমনকারী রাজপুত্রের দিকে চাহিলেন। খ্বাজা ইসা রাজপুত্রকে কহিলেন, "বুঝি আপনার সঙ্গে আরও কথা আছে।"

রাজপুত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কতলু খাঁ কহিলেন, "কাণ।"

রাজপুত্র বুঝিলেন। মুমূর্ষুর অধিকতর নিকটে দাঁড়াইয়া মুখের নিকট কর্ণাবনত করিলেন। কতলু খাঁ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "বীর।—"

ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ—তৃষা।"

আয়েষা পুনরপি অধরে পেয় সিঞ্চন করিলেন।

"বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

রাজপুত্রকে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল; চমকিতের ন্যায় ঋজ্বায়ত হইয়া কিঞ্চিদ্দূরে দাঁড়াইলেন। কতলু খাঁ বলিতে লাগিলেন, "পিতৃহীনা—আমি পাপিষ্ঠ—উঃ তৃষা।"

আয়েষা পুনঃ পুনঃ পানীয়াভিষিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর বাক্যস্ফুরণ দুর্ঘট হইল। শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিতে লাগিলেন, "দারুণ জ্বালা—সাধ্বী—তুমি দেখিও—"

রাজপুত্র কহিলেন, "কি?" কতলু খাঁর কর্ণে এই প্রশ্ন মেঘগর্জ্জনবৎ বোধ হইল। কতলু খাঁ বলিতে লাগিলেন, "এই ক—কন্যার—মত পবিত্রা।—তুমি।—উঃ!—বড় তৃষা—যাই যে—আয়েষা।"

আর কথা সরিল না; সাধ্যাতীত পরিশ্রম হইয়াছিল, শ্রমাতিরেক ফলে নির্জ্জীব মস্তক ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। কন্যার নাম মুখে থাকিতে থাকিতে নবাব কতলু খাঁর প্রাণবিয়োগ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিতা

জগৎসিংহ কারামুক্ত হইয়া পিতৃশিবিরে গমনানন্তর নিজ স্বীকারানুযায়ী মোগল পাঠানে সন্ধিসম্বন্ধ করাইলেন। পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও উৎকলাধিকারী হইয়া রহিলেন। সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ ইতিবৃত্তে বর্ণনীয়। এ স্থলে অতি-বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। সন্ধি সমাপনান্তে উভয় দল কিছু দিন পূর্ব্বাবস্থিতির স্থানে রহিলেন। নবপ্রীতিসম্বর্দ্ধনার্থে কতলু খাঁর পুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রধান রাজমন্ত্রী খ্বাজা ইসা ও সেনাপতি ওস্‌মান রাজা মানসিংহের শিবিরে গমন করিলেন; সার্দ্ধশত হস্তী আর অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া রাজার পরিতোষ জন্মাইলেন; রাজাও তাঁহাদিগের বহুবিধ সম্মান করিয়া সকলকে খেলোয়াৎ দিয়া বিদায় করিলেন।

এইরূপ সন্ধিসম্বন্ধ সমাপন করিতে ও শিবির-ভঙ্গোদ্যোগ করিতে কিছু দিন গত হইল।

পরিশেষে রাজপুত সেনার পাটনায় যাত্রার সময় আগত হইলে, জগৎসিংহ এক দিবস অপরাহ্ণে সহচর সমভিব্যাহারে পাঠান-দুর্গে ওস্‌মান প্রভৃতির নিকট বিদায় লইতে গমন করিলেন। কারাগারে সাক্ষাতের পর, ওস্‌মান রাজপুত্রের প্রতি আর সৌহৃদ্যভাব প্রকাশ করেন নাই। অদ্য সামান্য কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় দিলেন।

জগৎসিংহ ওস্‌মানের নিকট ক্ষুণ্ণমনে বিদায় লইয়া খ্বাজা ইসার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। তথা হইতে আয়েষার নিকট বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে চলিলেন। এক জন অন্তঃপুর-রক্ষী দ্বারা আয়েষার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, আর রক্ষীকে কহিয়া দিলেন যে, "বলিও, নবাব সাহেবের লোকান্তর পরে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এক্ষণে আমি পাটনায় চলিলাম, পুনর্ব্বার সাক্ষাতের সম্ভাবনা অতি বিরল; অতএব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যাইতে চাহি।"

খোজা কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, "নবাবপুত্রী বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না; অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাজপুত্র সম্বর্দ্ধিত বিষাদে আত্মশিবিরাভিমুখ হইলেন। দুর্গদ্বারে দেখিলেন, ওস্‌মান তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাজপুত্র ওস্‌মানকে দেখিয়া পুনরপি অভিবাদন করিয়া চলিয়া যান, ওস্‌মান পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজপুত্র কহিলেন, "সেনাপতি মহাশয়, আপনার যদি কোন আজ্ঞা থাকে প্রকাশ করুন, আমি প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হই।"

ওস্মান কহিলেন, "আপনার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে, এত সহচর সাক্ষাৎ তাহা বলিতে পারিব না, সহচরদিগকে অগ্রসর হইতে অনুমতি করুন, একাকী আমার সঙ্গে আসুন।"

রাজপুত্র বিনা সঙ্কোচে সহচরগণকে অগ্রসর হইতে বলিয়া দিয়া একা অশ্বারোহণে পাঠানের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; ওস্মানও অশ্ব আনাইয়া আরোহণ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ওস্মান রাজপুত্র সঙ্গে এক নিবিড় শাল-বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনের মধ্যস্থলে এক ভগ্ন অট্টালিকা ছিল; বোধ হয়, অতি পূর্ব্বকালে কোন রাজবিদ্রোহী এ স্থলে আসিয়া কাননাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল। শালবৃক্ষে ঘোটক বন্ধন করিয়া ওস্মান রাজপুত্রকে সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে লইয়া গেলেন। অট্টালিকা মনুষ্যশূন্য। মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ; তাহার এক পার্শ্বে এক যাবনিক সমাধিখাত প্রস্তুত রহিয়াছে, অথচ শব নাই; অপর পার্শ্বে চিতাসজ্জা রহিয়াছে, অথচ কোন মৃতদেহ নাই।

প্রাঙ্গণমধ্যে আসিলে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কি?"

ওস্মান কহিলেন, "এ সকল আমার আজ্ঞাক্রমে হইয়াছে; আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে মহাশয় আমাকে এই কবরমধ্যে সমাধিস্থ করিবেন, কেহ জানিবে না; যদি আপনি দেহত্যাগ করেন, তবে এই চিতায় ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনার সৎকার করাইব, অপর কেহ জানিবে না।"

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি?"

ওস্মান কহিলেন, "আমরা পাঠান—অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করি না; এ পৃথিবী মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, এক জন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।"

তখন রাজপুত্র আদ্যোপান্ত বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কহিলেন, "আপনার কি অভিপ্রায়?"

ওস্মান কহিলেন, "সশস্ত্র আছ, আমার সহিত যুদ্ধ কর। সাধ্য হয়, আমাকে বধ করিয়া আপনার পথ মুক্ত কর, নচেৎ আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া আমার পথ ছাড়িয়া যাও।"

এই বলিয়া ওস্মান জগৎসিংহকে প্রত্যুত্তরের অবকাশ দিলেন না, অসিহস্তে তৎপ্রতি আক্রমণ করিলেন। রাজপুত্র অগত্যা আত্মরক্ষার্থ শীঘ্রহস্তে কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া ওস্মানের আঘাতের প্রতিঘাত করিতে লাগিলেন। ওস্মান রাজপুত্রের প্রাণনাশে পুনঃ পুনঃ বিষমোদ্যম করিতে লাগিলেন; রাজপুত্র ভ্রমক্রমেও ওস্মানকে আঘাতের চেষ্টা করিলেন না; কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। উভয়েই শস্ত্রবিদ্যায়

সুশিক্ষিত, বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলে, কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিলেন না। ফলতঃ যবনের অস্ত্রাঘাতে রাজপুত্রের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল; রুধিরে অঙ্গ প্লাবিত হইল; ওস্‌মান প্রতি তিনি একবারও আঘাত করেন নাই, সুতরাং ওস্‌মান অক্ষত। রক্তস্রাবে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল দেখিয়া, আর এরূপ সংগ্রামে মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া জগৎসিংহ কাতরস্বরে কহিলেন, "ওস্‌মান, ক্ষান্ত হও, আমি পরাভব স্বীকার করিলাম।"

ওস্‌মান উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, "এ ত জানিতাম না যে, রাজপুত সেনাপতি মরিতে ভয় পায়; যুদ্ধ কর, আমি তোমায় বধ করিব, ক্ষমা করিব না। তুমি জীবিতে আয়েষাকে পাইব না।"

রাজপুত্র কহিলেন, "আমি আয়েষার অভিলাষী নহি।"

ওস্‌মান অসি ঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "তুমি আয়েষার অভিলাষী নও, আয়েষা তোমার অভিলাষী। যুদ্ধ কর, ক্ষমা নাই।"

রাজপুত্র অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না। তুমি অসময়ে আমার উপকার করিয়াছ; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

ওস্‌মান সক্রোধে রাজপুত্রকে পদাঘাত করিলেন, কহিলেন, "যে সিপাহি যুদ্ধ করিতে ভয় পায়, তাহাকে এইরূপে যুদ্ধ করাই।"

রাজকুমারের আর ধৈর্য্য রহিল না। শীঘ্রহস্তে ত্যক্ত প্রহরণ ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া শৃগালদংশিত সিংহবৎ প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া রাজপুত্র যবনকে আক্রমণ করিলেন। সে দুর্দ্দম প্রহার যবন সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজপুত্রের বিশাল শরীরাঘাতে ওস্‌মান ভূমিশায়ী হইলেন। রাজপুত্র তাঁহার বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া হস্ত হইতে অসি উন্মোচন করিয়া লইলেন, এবং নিজ করস্থ প্রহরণ তাঁহার গলদেশে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "কেমন, সমর-সাধ মিটিয়াছে ত?"

ওস্‌মান কহিলেন, "জীবন থাকিতে নহে।"

রাজপুত্র কহিলেন, "এখনই ত জীবন শেষ করিতে পারি?"

ওস্‌মান কহিলেন, "কর; নচেৎ তোমার বধাভিলাষী শত্রু জীবিত থাকিবে।"

জগৎসিংহ কহিলেন, "থাকুক, রাজপুত তাহাতে ডরে না; তোমার জীবন শেষ করিতাম, কিন্তু তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, আমিও করিলাম।"

এই বলিয়া দুই চরণের সহিত ওস্‌মানের দুই হস্ত বদ্ধ রাখিয়া, একে একে তাঁহার সকল অস্ত্র শরীর হইতে হরণ করিলেন। তখন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে যাও, তুমি যবন হইয়া রাজপুতের শরীরে পদাঘাত করিয়াছিলে, এই জন্য তোমার এ দশা করিলাম, নচেৎ রাজপুতেরা এত কৃতঘ্ন নহে যে, উপকারীর অঙ্গস্পর্শ করে।"

ওস্‌মান মুক্ত হইলে আর একটি কথা না কহিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একেবারে দুর্গাভিমুখে দ্রুতগমনে চলিলেন।

রাজপুত্র বস্ত্র দ্বারা প্রাঙ্গণস্থ কূপ হইতে জল আহরণ করিয়া গাত্র ধৌত করিলেন। গাত্র ধৌত করিয়া শালতরু হইতে অশ্ব মোচনপূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। অশ্বারোহণ করিয়া দেখেন, অশ্বের বল্গায়, লতা গুল্মাদির দ্বারা একখানি লিপি বাঁধা রহিয়াছে। বল্গা হইতে পত্র মোচন করিয়া দেখিলেন যে, পত্রখানি মনুষ্যের কেশ দ্বারা বন্ধ করা আছে, তাহার উপরিভাগে লেখা আছে যে, "এই পত্র দুই দিবস মধ্যে খুলিবেন না, যদি খুলেন, তবে ইহার উদ্দেশ্য বিফল হইবে।"

রাজপুত্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করাই স্থির করিলেন। পত্র কবচ মধ্যে রাখিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া শিবিরাভিমুখে চলিলেন।

রাজপুত্র শিবিরে উপনীত হইবার পরদিন দ্বিতীয় এক লিপি দূতহস্তে পাইলেন। এই লিপি আয়েষার প্রেরিত। কিন্তু তদ্‌বৃত্তান্ত পর-পরিচ্ছেদে বক্তব্য।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আয়েষার পত্র

আয়েষা লেখনী হস্তে পত্র লিখিতে বসিয়াছেন। মুখকান্তি অত্যন্ত গম্ভীর, স্থির; জগৎসিংহকে পত্র লিখিতেছেন। একখানা কাগজ লইয়া পত্র আরম্ভ করিলেন। প্রথমে লিখিলেন, "প্রাণাধিক," তখনই প্রাণাধিক শব্দ কাটিয়া দিয়া লিখিলেন, "রাজকুমার," "প্রাণাধিক" শব্দ কাটিয়া "রাজকুমার" লিখিতে আয়েষার অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পত্রে পড়িল। আয়েষা অমনি সে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পুনর্ব্বার অন্য কাগজে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কয়েক ছত্র লেখা হইতে না হইতে আবার পত্র অশ্রুকলঙ্কিত হইল। আয়েষা সে লিপিও বিনষ্ট করিলেন। অন্য বারে অশ্রুচিহ্নশূন্য একখণ্ড লিপি সমাধা করিলেন। সমাধা করিয়া একবার পড়িতে লাগিলেন, পড়িতে নয়নবাষ্পে দৃষ্টিলোপ হইতে লাগিল। কোন মতে লিপি বদ্ধ করিয়া দূতহস্তে দিলেন। লিপি লইয়া দূত রাজপুত-শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিল। আয়েষা একাকিনী পালঙ্ক-শয়নে রোদন করিতে লাগিলেন।

জগৎসিংহ পত্র পাইয়া পড়িতে লাগিলেন।

"রাজকুমার!

আমি যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, সে আত্মধৈর্য্যের প্রতি অবিশ্বাসিনী বলিয়া নহে। মনে করিও না আয়েষা অধীরা। ওস্‌মান নিজ হৃদয় মধ্যে অগ্নি জ্বালিত

করিয়াছে, কি জানি আমি তোমার সাক্ষাৎলাভ করিলে, যদি সে ক্লেশ পায়, এই জন্যই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। সাক্ষাৎ না হইলে তুমি যে ক্লেশ পাইবে, সে ভরসাও করি নাই। নিজের ক্লেশ—সে সকল সুখ দুঃখ জগদীশ্বরচরণে সমর্পণ করিয়াছি। তোমাকে যদি সাক্ষাতে বিদায় দিতে হইত, তবে সে ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতাম। তোমার সহিত যে সাক্ষাৎ হইল না, এ ক্লেশও পাষাণীর ন্যায় সহ্য করিতেছি।

তবে এ পত্র লিখি কেন? এক ভিক্ষা আছে, সেই জন্যই এ পত্র লিখিলাম। যদি শুনিয়া থাক যে, আমি তোমাকে স্নেহ করি, তবে তাহা বিস্মৃত হও। এ দেহ বর্ত্তমানে এ কথা প্রকাশ করিব না সঙ্কল্প ছিল, বিধাতার ইচ্ছায় প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে বিস্মৃত হও।

আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নহি। আমার যাহা দিবার তাহা দিয়াছি, তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না। আমার স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে, তুমি স্নেহ না করিলেও আমি সুখী; কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি!

তোমাকে অসুখী দেখিয়াছিলাম। যদি কখন সুখী হও, আয়েষাকে স্মরণ করিয়া সংবাদ দিও। ইচ্ছা না হয়, সংবাদ দিও না। যদি কখন অন্তঃকরণে ক্লেশ পাও, তবে আয়েষাকে কি স্মরণ করিবে?

আমি যে তোমাকে পত্র লিখিলাম, কি যদি ভবিষ্যতে লিখি, তাহাতে লোকে নিন্দা করিবে। আমি নির্দ্দোষী, সুতরাং তাহাতে ক্ষতি বিবেচনা করিও না—যখন ইচ্ছা হইবে, পত্র লিখিও।

তুমি চলিলে, আপাততঃ এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিলে। এই পাঠানেরা শান্ত নহে। সুতরাং পুনর্ব্বার তোমার এ দেশে আসাই সম্ভব। কিন্তু আমার সহিত আর সন্দর্শন হইবে না। পুনঃ পুনঃ হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিয়া ইহা স্থির করিয়াছি। রমণীহৃদয় যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, তাহাতে অধিক সাহস অনুচিত।

আর একবার মাত্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব মানস আছে। যদি তুমি এ প্রদেশে বিবাহ কর, তবে আমায় সংবাদ দিও; আমি তোমার বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া তোমার বিবাহ দিব। যিনি তোমার মহিষী হইবেন, তাঁহার জন্য কিছু সামান্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম, যদি সময় পাই, স্বহস্তে পরাইয়া দিব।

আর এক প্রার্থনা। যখন আয়েষার মৃত্যুসংবাদ তোমার নিকট যাইবে, তখন একবার এ দেশে আসিও, তোমার নিমিত্ত সিন্দুকমধ্যে যাহা রহিল, তাহা আমার অনুরোধে গ্রহণ করিও।

আর কি লিখিব? অনেক কথা লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করিবেন, আয়েষার কথা মনে করিয়া কখনও দুঃখিত হইও না।”

জগৎসিংহ পত্র পাঠ করিয়া বহুক্ষণ তাম্বুমধ্যে পত্রহস্তে পদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে অকস্মাৎ শীঘ্রহস্তে একখানা কাগজ লইয়া নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে দিলেন।

"আয়েষা, তুমি রমণীরত্ন। জগতে মনঃপীড়াই বুঝি বিধাতার ইচ্ছা! আমি তোমার কোন প্রত্যুত্তর লিখিতে পারিলাম না। তোমার পত্রে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। এ পত্রের যে উত্তর, তাহা এক্ষণে দিতে পারিলাম না। আমাকে ভুলিও না। বাঁচিয়া থাকি, তবে এক বৎসর পরে ইহার উত্তর দিব।"

দূত এই প্রত্যুত্তর লইয়া আয়েষার নিকট প্রতিগমন করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ

যে পর্য্যন্ত তিলোত্তমা আশ্‌মানির সঙ্গে আয়েষার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত আর কেহ তাঁহার কোন সংবাদ পায় নাই। তিলোত্তমা, বিমলা, আশ্‌মানি, অভিরাম স্বামী, কাহারও কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। যখন মোগলপাঠানে সন্ধিসম্বন্ধ হইল, তখন বীরেন্দ্রসিংহ আর তৎপরিজনের অশ্রুতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া উভয় পক্ষই সম্মত হইলেন যে, বীরেন্দ্রের স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে গড় মান্দারণে পুনরবস্থাপিত করা যাইবে। সেই কারণেই, ওস্‌মান, খ্বাজা ইসা, মানসিংহ প্রভৃতি সকলেই তাহাদিগের বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তিলোত্তমার আশ্‌মানির সঙ্গে আয়েষার নিকট হইতে আসা ব্যতীত আর কিছুই কেহ অবগত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে মানসিংহ নিরাশ হইয়া এক জন বিশ্বাসী অনুচরকে গড় মান্দারণে স্থাপন করিয়া এই আদেশ করিলেন যে, "তুমি এইখানে থাকিয়া মৃত জায়গীরদারের স্ত্রীকন্যার উদ্দেশ করিতে থাক; সন্ধান পাইলে তাহাদিগকে দুর্গে স্থাপনা করিয়া আমার নিকট যাইবে, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করিব, এবং অন্য জায়গীর দিব।"

এইরূপ স্থির করিয়া মানসিংহ পাটনায় গমনোদ্যোগী হইলেন।

মৃত্যুকালে কতলু খাঁর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে জগৎসিংহের হৃদয়মধ্যে কোন ভাবান্তর জন্মিয়াছিল কি না, তাহা কিছুই প্রকাশ পাইল না। জগৎসিংহ অর্থব্যয় এবং শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যত্ন কেবল পূর্ব্ব সম্বন্ধের

স্মৃতিজনিত, কি যে যে অপরাপর কারণে মানসিংহ প্রভৃতি সেইরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই কারণসম্ভূত, কি পুনঃসঞ্চারিত প্রেমানুরোধে উৎপন্ন, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। যত্ন যে কারণেই হইয়া থাকুক, বিফল হইল।

মানসিংহের সেনাসকল শিবির ভঙ্গ করিতে লাগিল, পরদিন প্রভাতে "কুচ" করিবে। যাত্রার পূর্ব্ব দিবস অশ্ববল্গায় প্রাপ্ত লিপি পড়িবার সময় উপনীত হইল। রাজপুত্র কৌতূহলী হইয়া লিপি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে কেবল এইমাত্র লেখা আছে,

"যদি ধর্ম্মভয় থাকে, যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে পত্র পাঠমাত্র এই স্থানে একা আসিবে। ইতি

অহং ব্রাহ্মণঃ।"

রাজপুত্র লিপি পাঠে চমৎকৃত হইলেন। একবার মনে করিলেন, কোন শত্রুর চাতুরীও হইতে পারে, যাওয়া উচিত কি? রাজপুতহৃদয়ে ব্রহ্মশাপের ভয় ভিন্ন অন্য ভয় প্রবল নহে; সুতরাং যাওয়াই স্থির হইল। অতএব নিজ অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন যে, যদি তিনি সৈন্যযাত্রার মধ্যে না আসিতে পারেন, তবে তাহারা তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিবে না; সৈন্য অগ্রগামী হয়, হানি নাই, পশ্চাৎ বর্দ্ধমানে কি রাজমহলে তিনি মিলিত হইতে পারিবেন। এইরূপ আদেশ করিয়া জগৎসিংহ একাকী শালবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বকথিত ভগ্নাট্টালিকা-দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্র পূর্ব্ববৎ শালবৃক্ষে অশ্ব বন্ধন করিলেন। ইতস্ততঃ দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। পরে অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, প্রাঙ্গণে পূর্ব্ববৎ এক পার্শ্বে সমাধিমন্দির, এক পার্শ্বে চিতাসজ্জা রহিয়াছে; চিতাকাষ্ঠের উপর এক জন ব্রাহ্মণই বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ অধোমুখে বসিয়া রোদন করিতেছেন।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাকে এখানে আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ মুখ তুলিলেন; রাজপুত্র জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন, ইনি অভিরাম স্বামী।

রাজপুত্রের মনে একেবারে বিস্ময়, কৌতূহল, আহ্লাদ, এই তিনেরই আবির্ভাব হইল; প্রণাম করিয়া ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দর্শন জন্য যে কত উদ্যোগ পাইয়াছি, কি বলিব। এখানে অবস্থিতি কেন?"

অভিরাম স্বামী চক্ষুঃ মুছিয়া কহিলেন, "আপাততঃ এইখানেই বাস!"

স্বামীর উত্তর শুনিতে না শুনিতেই রাজপুত্র প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। "আমাকে স্মরণ করিয়াছেন কি জন্য? রোদনই বা কেন?"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "যে কারণে রোদন করিতেছি, সেই কারণেই তোমাকে ডাকিয়াছি; তিলোত্তমার মৃত্যুকাল উপস্থিত।"

ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু, তিল তিল করিয়া, যোদ্ধৃপতি সেইখানে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। তখন আদ্যোপান্ত সকল কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল; একে একে অন্তঃকরণ-মধ্যে দারুণ তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত হইতে লাগিল। দেবালয়ে প্রথম সন্দর্শন, শৈলেশ্বর-সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা, কক্ষমধ্যে প্রথম পরিচয়ে উভয়ের প্রেমোত্থিত অশ্রুজল, সেই কাল-রাত্রির ঘটনা, তিলোত্তমার মূর্চ্ছাবস্থ মুখ, যবনাগারে তিলোত্তমার পীড়ন, কারাগারমধ্যে নিজ নির্দ্দয় ব্যবহার, পরে এক্ষণকার এই বনবাসে মৃত্যু, এই সকল একে একে রাজকুমারের হৃদয়ে আসিয়া ঝটিকা-প্রঘাতবৎ লাগিতে লাগিল। পূর্ব্ব হুতাশন শতগুণ প্রচণ্ড জ্বালার সহিত জ্বলিয়া উঠিল।

রাজপুত্র অনেকক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন। অভিরাম স্বামী বলিতে লাগিলেন, "যে দিন বিমলা যবন-বধ করিয়া বৈধব্যের প্রতিশোধ করিয়াছিল, সেই দিন অবধি আমি কন্যা দৌহিত্রী লইয়া যবন-ভয়ে নানা স্থানে অজ্ঞাতে ভ্রমণ করিতেছিলাম, সেই দিন অবধি তিলোত্তমার রোগের সঞ্চার। যে কারণে রোগের সঞ্চার, তাহা তুমি বিশেষ অবগত আছ।"

জগৎসিংহের হৃদয়ে শেল বিঁধিল।

"সে অবধি তাহাকে নানা স্থানে রাখিয়া নানা মত চিকিৎসা করিয়াছি, নিজে যৌবনাবধি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, অনেক রোগের চিকিৎসা করিয়াছি; অন্যের অজ্ঞাত অনেক ঔষধ জানি। কিন্তু যে রোগ হৃদয়মধ্যে, চিকিৎসায় তাহার প্রতীকার নাই। এই স্থান অতি নির্জ্জন বলিয়া ইহারই মধ্যে এক নিভৃত অংশে আজ পাঁচ সাত দিন বসতি করিতেছি। দৈবযোগে এখানে তুমি আসিয়াছ দেখিয়া তোমার অশ্ববল্গায় পত্র বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। পূর্ব্বাবধি অভিলাষ ছিল যে, তিলোত্তমাকে রক্ষা করিতে না পারিলে, তোমার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করাইয়া অন্তিম কালে তাহার অন্তঃকরণকে তৃপ্ত করিব। সেই জন্যই তোমাকে আসিতে লিখিয়াছি। তখনও তিলোত্তমার আরোগ্যের ভরসা দূর হয় নাই; কিন্তু বুঝিয়াছিলাম যে, দুই দিন মধ্যে কিছু উপশম না হইলে চরম কাল উপস্থিত হইবে। এই জন্য দুই দিন পরে পত্র পড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। এক্ষণে যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। তিলোত্তমার জীবনের কোন আশা নাই। জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে।"

এই বলিয়া অভিরাম স্বামী পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন। জগৎসিংহও রোদন করিতেছিলেন।

স্বামী পুনশ্চ কহিলেন, "অকস্মাৎ তোমার তিলোত্তমা সন্নিধানে যাওয়া হইবেক না; কি জানি, যদি এ অবস্থায় উল্লাসের আধিক্য সহ্য না হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, তোমাকে আসিতে সংবাদ দিয়াছি, তোমার আসার সম্ভাবনা আছে। এই ক্ষণে আসার সংবাদ দিয়া আসি, পশ্চাৎ সাক্ষাৎ করিও।"

এই বলিয়া পরমহংস, যে দিকে ভগ্নাট্টালিকার অন্তঃপুর, সেই দিকে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজপুত্রকে কহিলেন, "আইস।"

রাজপুত্র পরমহংসের সঙ্গে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। দেখিলেন, একটি কক্ষ অভগ্ন আছে, তন্মধ্যে জীর্ণ ভগ্ন পালঙ্ক, তদুপরি ব্যাধিক্ষীণা, অথচ অনতিবিলুপ্তরূপ-রাশি তিলোত্তমা শয়নে রহিয়াছে; এ সময়েও পূর্ব্বলাবণ্যের মৃদুলতর-প্রভাপরিবেষ্টিত রহিয়াছে;—নির্ব্বাণোন্মুখ প্রভাততারার ন্যায় মনোমোহিনী হইয়া রহিয়াছে। নিকটে একটি বিধবা বসিয়া অঙ্গে হস্তমার্জ্জন করিতেছে; সে নিরাভরণা, মলিনা, দীনা বিমলা। রাজকুমার তাহাকে প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, কিসেই বা চিনিবেন, যে স্থিরযৌবনা ছিল, সে এক্ষণে প্রাচীনা হইয়াছে।

যখন রাজপুত্র আসিয়া তিলোত্তমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন, তখন তিলোত্তমা নয়ন মুদ্রিত করিয়া ছিলেন। অভিরাম স্বামী ডাকিয়া কহিলেন, "তিলোত্তমে! রাজকুমার জগৎসিংহ আসিয়াছেন।"

তিলোত্তমা নয়ন উন্মীলিত করিয়া জগৎসিংহের প্রতি চাহিলেন; সে দৃষ্টি কোমল, কেবল স্নেহব্যঞ্জক; তিরস্করণাভিলাষের চিহ্নমাত্রে বর্জ্জিত। তিলোত্তমা চাহিবামাত্র দৃষ্টি বিনত করিলেন; দেখিতে দেখিতে লোচনে দর দর ধারা বহিতে লাগিল! রাজকুমার আর থাকিতে পারিলেন না; লজ্জা দূরে গেল; তিলোত্তমার পদপ্রান্তে বসিয়া নীরবে নয়নাসারে তাঁহার দেহলতা সিক্ত করিলেন।

একবিংশত্তিতম পরিচ্ছেদ

সফলে নিষ্ফল স্বপ্ন

পিতৃহীনা অনাথিনী, রুগ্না শয্যায়;—জগৎসিংহ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে। দিন যায়, রাত্রি যায়, আর বার দিন আসে; আর বার দিন যায়, রাত্রি আসে। রাজপুত-কুল-গৌরব তাহার ভগ্ন পালঙ্কের পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন; সেই দীনা, শব্দহীনা বিধবার অবিরল কার্য্যের সাহায্য করিতেছেন। আধিক্ষীণা দুঃখিনী তাঁহার পানে চাহে কি না—

তার শিশিরনিপীড়িত পদ্মমুখে পূর্ব্বকালের সে হাসি আসে কি না, তাহাই দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় তাহার মুখপানে চাহিয়া আছেন।

কোথায় শিবির? কোথায় সেনা?—শিবির ভঙ্গ করিয়া সেনা পাটনায় চলিয়া গিয়াছে! কোথায় অনুচর সব? দারুকেশ্বর-তীরে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কোথায় প্রভু? প্রবলাতপবিশোষিত সুকুমার কুসুম-কলিকায় নয়নবারি সেচনে পুনরুৎফুল্ল করিতেছেন।

কুসুম-কলিকা ক্রমে পুনরুৎফুল্ল হইতে লাগিল। এ সংসারের প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ! ব্যাধি-প্রতীকারে প্রধান ঔষধ প্রণয়। নহিলে হৃদয়-ব্যাধি কে উপশম করিতে পারে?

যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ বিন্দু বিন্দু তৈলসঞ্চারে ধীরে ধীরে আবার হাসিয়া উঠে, যেমন নিদাঘশুষ্ক বল্লরী আষাঢ়ের নববারি সিঞ্চনে ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার বিকশিত হয়; জগৎসিংহকে পাইয়া তিলোত্তমা তদ্রূপ দিনে দিনে পুনর্জ্জীবন পাইতে লাগিলেন।

ক্রমে সবলা হইয়া পালঙ্কোপরি বসিতে পারিলেন। বিমলার অবর্ত্তমানে দুজনে কাছে কাছে বসিয়া অনেক দিনের মনের কথা সকল বলিতে পারিলেন। কত কথা বলিলেন, মানসকৃত কত অপরাধ স্বীকার করিলেন, কত অন্যায় ভরসা মনোমধ্যে উদয় হইয়া মনোমধ্যেই নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা বলিলেন; জাগরণে কি নিদ্রায় কত মনোমোহন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। রুগ্নশয্যায় শয়নে অচেতনে যে এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এক দিন তাহা বলিলেন—

যেন নব বসন্তের শোভাপরিপূর্ণ এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি তিনি জগৎসিংহের সহিত পুষ্পক্রীড়া করিতেছিলেন; স্তূপে স্তূপে বসন্তকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিলেন, আপনি এক মালা কণ্ঠে পরিলেন, আর এক মালা জগৎসিংহের কণ্ঠে দিলেন; জগৎসিংহের কটিস্থ অসিস্পর্শে মালা ছিঁড়িয়া গেল। "আর তোমার কণ্ঠে মালা দিব না, চরণে নিগড় দিয়া বাঁধিব" এই বলিয়া যেন কুসুমের নিগড় রচনা করিলেন। নিগড় পরাইতে গেলেন, জগৎসিংহ অমনই সরিয়া গেলেন। তিলোত্তমা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; জগৎসিংহ বেগে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন; পথে এক ক্ষীণা নির্ঝরিণী ছিল, জগৎসিংহ লম্ফ দিয়া পার হইলেন; তিলোত্তমা স্ত্রীলোক—লম্ফে পার হইতে পারিলেন না, যেখানে নির্ঝরিণী সঙ্কীর্ণা হইয়াছে, সেইখানে পার হইবেন, এই আশায়, নির্ঝরিণীর ধারে ধারে ছুটিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন! নির্ঝরিণী সঙ্কীর্ণা হওয়া দূরে থাকুক, যত যান, তত আয়তনে বাড়ে; নির্ঝরিণী ক্রমে ক্ষুদ্র নদী হইল; ক্ষুদ্র নদী ক্রমে বড় নদী হইল; আর জগৎসিংহকে দেখা যায় না; তীর অতি উচ্চ, অতি বন্ধুর, আর পাদচালন হয় না;

তাহাতে আবার তিলোত্তমার চরণতলস্থ উপকূলের মৃত্তিকা খণ্ডে খণ্ডে খসিয়া গম্ভীর নাদে জলে পড়িতে লাগিল, নীচে প্রচণ্ড ঘূর্ণিত জলাবর্ত্ত, দেখিতে সাহস হয় না। তিলোত্তমা পর্ব্বতে পুনরারোহণ করিয়া নদীগ্রাস হইতে পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; পথ বন্ধুর, চরণ চলে না ; তিলোত্তমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন ; অকস্মাৎ কালমূর্ত্তি কতলু খাঁ পুনরুজ্জীবিত হইয়া তাঁহার পথরোধ করিল ; কণ্ঠের পুষ্পমালা অমনই গুরুভার লৌহশৃঙ্খল হইল ; কুসুমনিগড় হস্তচ্যুত হইয়া আত্মচরণে পড়িল ; সে নিগড় অমনি লৌহনিগড় হইয়া বেড়িল ; অকস্মাৎ অঙ্গ স্তম্ভিত হইল ; তখন কতলু খাঁ তাঁহার গলদেশ ধরিয়া ঘূর্ণিত করিয়া নদী-তুরঙ্গ-প্রবাহমধ্যে নিক্ষেপ করিল।

স্বপ্নের কথা সমাপন করিয়া তিলোত্তমা সজলচক্ষে কহিলেন, "যুবরাজ, আমার এ শুধু স্বপ্ন নহে ; তোমার জন্য যে কুসুমনিগড় রচিয়াছিলাম, বুঝি তাহা সত্যই আত্মচরণে লৌহনিগড় হইয়া ধরিয়াছে। যে কুসুমমালা পরাইয়াছিলাম, তাহা অসির আঘাতে ছিঁড়িয়াছে।"

যুবরাজ তখন হাস্য করিয়া কটিস্থিত অসি তিলোত্তমার পদতলে রাখিলেন ; কহিলেন, "তিলোত্তমা, তোমার সম্মুখে এই অসিশূন্য হইলাম, আবার মালা দিয়া দেখ, অসি তোমার সম্মুখে দ্বিখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিতেছি।"

তিলোত্তমাকে নিরুত্তর দেখিয়া, রাজকুমার কহিলেন, "তিলোত্তমা, আমি কেবল রহস্য করিতেছি না।"

তিলোত্তমা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।

সেই দিন প্রদোষকালে অভিরাম স্বামী কক্ষান্তরে প্রদীপের আলোকে বসিয়া পুতি পড়িতেছিলেন ; রাজপুত্র তথায় গিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "মহাশয়, আমার এক নিবেদন, তিলোত্তমা এক্ষণে স্থানান্তর গমনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন, অতএব আর এ ভগ্ন গৃহে কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি ? কাল যদি মন্দ দিন না হয়, তবে গড় মান্দারণে লইয়া চলুন। আর যদি আপনার অনভিমত না হয়, তবে অম্বরের বংশে দৌহিত্রী সম্প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

অভিরাম স্বামী পুতি ফেলিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, পুতির উপর যে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা জ্ঞান নাই।

যখন রাজপুত্র স্বামীর নিকট আইসেন, তখন ভাব বুঝিয়া বিমলা আর আশ্‌মানি শনৈঃ শনৈঃ রাজপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন ; বাহিরে থাকিয়া সকল শুনিয়াছিলেন। রাজপুত্র বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, বিমলার অকস্মাৎ পূর্ব্বভাবপ্রাপ্তি ; অনবরত হাসিতেছেন, আর আশ্‌মানির চুল ছিঁড়িতেছেন ও কিল মারিতেছেন ; আশ্‌মানি

মারপিট তৃণজ্ঞান করিয়া বিমলার নিকট নৃত্যের পরীক্ষা দিতেছে। রাজকুমার এক পাশ দিয়া সরিয়া গেলেন।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

ফুল ফুটিল। অভিরাম স্বামী গড় মান্দারণে গমন করিয়া মহাসমারোহের সহিত দৌহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগৃহিত্রী করিলেন।

উৎসবাদির জন্য জগৎসিংহ নিজ সহচরবর্গকে জাহানাবাদ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। তিলোত্তমার পিতৃবন্ধুও অনেকে আহ্বানপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দকার্য্যে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

আয়েষার প্রার্থনামতে জগৎসিংহ তাঁহাকেও সংবাদ করিয়াছিলেন। আয়েষা নিজ কিশোরবয়স্ক সহোদরকে সঙ্গে লইয়া এবং আর আর পৌরবর্গে বেষ্টিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

আয়েষা যবনী হইয়াও তিলোত্তমা আর জগৎসিংহের অধিক স্নেহবশতঃ সহচরীবর্গের সহিত দুর্গান্তঃপুরবাসিনী হইলেন। পাঠক মনে করিতে পারেন যে, আয়েষা তাপিতহৃদয়ে বিবাহের উৎসবে উৎসব করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। আয়েষা নিজ সহর্ষ চিত্তের প্রফুল্লতায় সকলকেই প্রফুল্ল করিতে লাগিলেন; প্রস্ফুট শারদ সরসীরুহের মন্দান্দোলন স্বরূপ সেই মৃদুমধুর হাসিতে সর্ব্বত্র শ্রীসম্পাদন করিতে লাগিলেন।

বিবাহকার্য্য নিশীথে সমাপ্ত হইল। আয়েষা তখন সহচরগণ সহিত প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিলেন; হাসিয়া বিমলার নিকট বিদায় লইলেন। বিমলা কিছুই জানেন না, হাসিয়া কহিলেন, "নবাবজাদী! আবার আপনার শুভকার্য্যে আমরা নিমন্ত্রিত হইব।"

বিমলার নিকট হইতে আসিয়া আয়েষা তিলোত্তমাকে ডাকিয়া এক নিভৃত কক্ষে আনিলেন। তিলোত্তমার কর ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভগিনি! আমি চলিলাম। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি, তুমি অক্ষয় সুখে কালযাপন কর।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "আবার কত দিনে আপনার সাক্ষাৎ পাইব?"

আয়েষা কহিলেন, "সাক্ষাতের ভরসা কিরূপে করিব?" তিলোত্তমা বিষণ্ণ হইলেন। উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে আয়েষা কহিলেন, "সাক্ষাৎ হউক বা না হউক, তুমি আয়েষাকে ভুলিয়া যাইবে না?"

তিলোত্তমা হাসিয়া কহিলেন, "আয়েষাকে ভুলিলে যুবরাজ আমার মুখ দেখিবেন না।"

আয়েষা গাম্ভীর্য্যসহকারে কহিলেন, "এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। তুমি আমার কথা কখন যুবরাজের নিকট তুলিও না। এ কথা অঙ্গীকার কর।"

আয়েষা বুঝিয়াছিলেন যে, জগৎসিংহের জন্য আয়েষা যে এ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এ কথা জগৎসিংহের হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিদ্ধ রহিয়াছে। আয়েষার প্রসঙ্গমাত্রও তাঁহার অনুতাপকর হইতে পারে।

তিলোত্তমা অঙ্গীকার করিলেন। আয়েষা কহিলেন, "অথচ বিস্মৃতও হইও না, স্মরণার্থ যে চিহ্ন দিই, তাহা ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া আয়েষা দাসীকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞামত দাসী গজদন্ত-নির্ম্মিত পাত্রমধ্যস্থ রত্নালঙ্কার আনিয়া দিল। আয়েষা দাসীকে বিদায় দিয়া সেই সকল অলঙ্কার স্বহস্তে তিলোত্তমার অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন।

তিলোত্তমা ধনাঢ্য ভূস্বামিকন্যা, তথাপি সে অলঙ্কাররাশির অদ্ভুত শিল্পরচনা এবং তন্মধ্যবর্ত্তী বহুমূল্য হীরকাদি রত্নরাজির অসাধারণ তীব্র দীপ্তি দেখিয়া চমৎকৃতা হইলেন। বস্তুতঃ আয়েষা পিতৃদত্ত নিজ অঙ্গভূষণরাশি নষ্ট করিয়া তিলোত্তমার জন্য অন্যজনদুর্লভ এই সকল রত্নভূষা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিলোত্তমা তত্তাবতের গৌরব করিতে লাগিলেন। আয়েষা কহিলেন, "ভগিনি, এ সকলের প্রশংসা করিও না। তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁহার চরণরেণুর তুল্য নহে।" এই কথা বলিতে বলিতে আয়েষা কত ক্লেশে যে চক্ষুর জল সংবরণ করিলেন, তিলোত্তমা তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

অলঙ্কারসন্নিবেশ সমাধা হইলে, আয়েষা তিলোত্তমার দুইটি হস্ত ধরিয়া তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ সরল প্রেমপ্রতিম মুখ দেখিয়া ত বোধ হয়, প্রাণেশ্বর কখন মনঃপীড়া পাইবেন না। যদি বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা না হইল, তবে তাঁহার চরণে এই ভিক্ষা যে, যেন ইহার দ্বারা তাঁহার চিরসুখ সম্পাদন করেন।"

তিলোত্তমাকে কহিলেন, "তিলোত্তমা! আমি চলিলাম। তোমার স্বামী ব্যস্ত থাকিতে পারেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কালহরণ করিব না। জগদীশ্বর তোমাদিগকে দীর্ঘায়ুঃ করিবেন। আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার —তোমার সার রত্ন হৃদয়মধ্যে রাখিও।"

"তোমার সার রত্ন" বলিতে আয়েষার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিলোত্তমা দেখিলেন, আয়েষার নয়নপল্লব জলভারস্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতেছে।

তিলোত্তমা সমদুঃখিনীর ন্যায় কহিলেন, "কাঁদিতেছ কেন?" অমনি আয়েষার নয়নবারিস্রোত দরদরিত হইয়া বহিতে লাগিল।

২০

আয়েষা আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া দোলারোহণ করিলেন।

আয়েষা যখন আপন আবাসগৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখনও রাত্রি আছে। আয়েষা বেশ ত্যাগ করিয়া, শীতল-পবন-পথ কক্ষবাতায়নে দাঁড়াইলেন। নিজ পরিত্যক্ত বসনাধিক কোমল নীলবর্ণ গগনমণ্ডলমধ্যে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলিতেছে; মৃদুপবনহিল্লোলে অন্ধকারস্থিত বৃক্ষ সকলের পত্র মুখরিত হইতেছে। দুর্গশিরে পেচক মৃদুগম্ভীর নিনাদ করিতেছে। সম্মুখে দুর্গপ্রাকার-মূলে যেখানে আয়েষা দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারই নীচে, জলপরিপূর্ণ দুর্গপরিখা নীরবে আকাশপটপ্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

আয়েষা বাতায়নে বসিয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে মনে করিতেছিলেন, "এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি।" আবার ভাবিতে-ছিলেন, "এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?"

আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, "এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য; প্রলোভনকে দূর করাই ভাল!"

এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বিভিন্ন সংস্করণে 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাঠভেদ

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস, তাঁহার সাতাশ বৎসর বয়সে মুদ্রিত এবং অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সের রচনা। সুতরাং এই পুস্তকের পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পরবর্ত্তী দুইটি উপন্যাসে—'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'তে খণ্ড ও পরিচ্ছেদ বিভাগে যেরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তাহা একেবারেই করেন নাই; উপন্যাসের মূল কাঠামো বজায় রাখিয়াছেন। তবে 'কপালকুণ্ডলা' হইতে ইহাতে বর্জ্জন ও সংযোজন অধিক, শব্দ ও বাক্যগত পরিবর্ত্তন 'মৃণালিনী' হইতে কম হইলেও 'কপালকুণ্ডলা'র তুলনায় বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে এই পুস্তকের ত্রয়োদশটি সংস্করণ হয়। আমরা নিম্নলিখিত সংস্করণগুলির সন্ধান পাইয়াছি। ১ম—১৮৬৫, পৃ. ৩০৭; ৩য়—১৮৬৯, পৃ. ২৯৮; ৪র্থ—১৮৭১, পৃ. ২৯৮; ৫ম—১৮৭৪, পৃ. ২২০; ৬ষ্ঠ—১৮৭৫, পৃ. ২২০; ৭ম—১৮৭৯, পৃ. ২২০; ৯ম—১৮৮৩, পৃ. ২১৭; ১০ম—১২৯২ সাল (১৮৮৪?), পৃ. ২৩৮+২; ১১শ—১৮৮৮, পৃ. ২৩৮; ১৩শ—১৮৯৩, পৃ. ৩১৪। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক সংস্করণেই কিছু না কিছু শব্দ ও বাক্যের পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংশোধন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সংস্করণের পরিবর্ত্তন প্রদর্শন সম্ভব নহে। আমরা প্রথম ও ত্রয়োদশ সংস্করণের উল্লেখ যোগ্য পাঠভেদ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

পৃ. ১, পংক্তি ৪, '৯৯৭ বঙ্গাব্দের' স্থলে '৯৯৮ বঙ্গাব্দের' ছিল।

পংক্তি ৫, 'মান্দারণের' স্থলে 'জাহানাবাদের' ছিল।

পংক্তি ২০, 'অশ্বকে ছাড়িয়া' স্থলে 'অশ্বকে যথেচ্ছা স্থানে যাইতে' ছিল।

পৃ. ৩, পংক্তি ৪, 'যিনি কথা কহিতেছিলেন' স্থলে 'পূর্ব্বালাপকারিণী' ছিল।

পংক্তি ১৮, 'হীরকমণ্ডিত চূড়' স্থলে 'হীরকমণ্ডিত মারওয়াড়ী চূড়' ছিল।

পৃ. ৪, পংক্তি ১২, 'জ্যেষ্ঠা কহিলেন, "স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি?' স্থলে ছিল—

কামিনী কহিল, "মহাশয়, কোন্ কালে স্ত্রীলোকে অগ্রে পরিচয় দিয়া থাকে?"

যুবা কহিলেন, "পরিচয়ের অগ্র পশ্চাৎ কি?"

উত্তরদায়িনী কহিলেন, "স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি?"

পৃ. ৫, পংক্তি ১৯, 'মানসিংহের' স্থলে 'কিনোড় মানসিংহের' ছিল।

পৃ. ৬, পংক্তি ২৫, 'শত শত' স্থলে 'সার্দ্ধেক সহস্র' ছিল।

পৃ. ৭, পংক্তি ২৩, 'লম্ফ দিয়া' স্থলে 'লম্ফত্যাগে' ছিল।

পৃ, ৮, পংক্তি ৭, '৯৭২ হেঃ অব্দে' স্থলে '৯৩২ শালে' ছিল।

পৃ. ৮, পংক্তি ১৪, '৯৮২ হেঃ অব্দে' স্থলে '৯৮২ শালে' ছিল।

পংক্তি ২৪, 'মেদিনীপুরও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল।' স্থলে ছিল—

তদ্ভিন্ন, সুযোগে অধিক বলপ্রকাশ করিয়া উড়িষ্যার সীমার বাহিরে মেদিনীপুর এবং বিষ্ণুপুর অধিকার করিয়া লইল।

পৃ. ৯, পংক্তি ৮-র গোড়ায় এই অংশ বসিবে—

যখন নবধর্ম্মানুরাগে মুসলমান সেনাতরঙ্গ হিমাদ্রিশিখরমালা হইতে বলদর্পে ভারতবর্ষে অবতরণ করে, তখন পৃথ্বীরাজপ্রভৃতি রাজপুত বীরেরা অসাধারণ শৌর্য্য সহকারে সেই বেগের প্রতিরোধ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অধোগতি বিধাতার ইচ্ছায় ছিল, সুতরাং রাজপুত সম্রাটেরা তৎকালে পরস্পর সংমিলিত না হইয়া, একে অন্যের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। মুসলমানেরা যত্নপৌনঃপুন্যে হিন্দুরাজগণকে একে একে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভব রাজপুতগণকে একেবারে তেজোহীন করিতে পারিলেন না। অনেক রাজপুত ভূপাল স্বাধীন রহিলেন; ও অদ্যাবধি মুসলমান রাজ্য লোপ পর্য্যন্ত রাজপুতেরা পুনঃ পুনঃ যবনদিগকে রণক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, অনেক বার পরাঙ্মুখও করিয়াছিলেন। কালে অনেক রাজপুত বংশকে দিল্লীশ্বর চরণে করপ্রদ হইতে হইল। এবং বাহুবলের নির্যাতনে জাতিকুল-গৌরব ত্যাগ করিয়া দিল্লীর রাজবংশে কন্যা সম্প্রদানাদির দ্বারা জেতার পরিতোষ জন্মাইতে হইল। দিল্লীর অধিপতিগণও বীরবৈরিকে সখিত্ব কুটুম্বিতাদির দ্বারা বাধ্য করিতে যত্নবন্ত হইলেন। ক্রমে করপ্রদ রাজপুত রাজগণ দিল্লীর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন।

পৃ. ৯, পংক্তি ১৯, 'দারুকেশ্বরতীরে শিবির সংস্থাপিত' স্থলে 'দারুকেশ্বর তীরে জাহানাবাদ গ্রামে শিবির স্থাপন' ছিল।

পৃ. ১২, পংক্তি ৮, 'দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম।' স্থলে 'দক্ষিণে গড় মান্দারণ গ্রাম।' ছিল।

পৃ. ১২, পংক্তি ৯, 'মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল।' এই অংশ প্রথম সংস্করণে ছিল না।

পৃ. ১২, পংক্তি ২২-র পর 'বাঙ্গালার পাঠান··· বসতি করিতেন।' এই অংশের পরিবর্ত্তে প্রথম সংস্করণে ছিল—

এই কয়েক দুর্গ মধ্যে একবংশীয় কয়েক জন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ বসতি করিতেন। কিন্তু প্রথম কথিত দুর্গ ব্যতীত অন্য গড়ের সহিত অত্র আখ্যায়িকার সংস্রব নাই।

যৎকালে দিল্লীশ্বর বালিন সসৈন্যে বঙ্গ জয় করিতে আইসেন, তখন জয়ধরসিংহ নামে এক জন সৈনিক সম্রাটের সঙ্গে আসিয়াছিলেন; যে রাত্রে বালিনের জয়লাভ হয়, সেই রাত্রে ঐ সৈনিক অসম্ভব সাহস প্রকাশ করিয়া দিল্লীনাথের কার্য্যোদ্ধার করেন; দিল্লীশ্বর পুরস্কার-স্বরূপ তাহাকে এই গড়মান্দারণ গ্রামে এক জায়গীর দান করেন। জায়গীরদারের বংশ ক্রমে বলবন্ত হইয়া বঙ্গেশ্বরকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, এবং স্বেচ্ছামত দুর্গ নির্ম্মাণ করিল। যে দুর্গের বিস্তারিত বর্ণনা করা গিয়াছে, ৯৯৮ অব্দে তন্মধ্যে বীরেন্দ্র সিংহনামা জয়ধর সিংহের এক জন উত্তর পুরুষ বসতি করিতেন।

পৃ. ১৩, পংক্তি ৮, 'বিবাহ করিয়া আবার বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন' স্থলে 'বিবাহ করিলেন' ছিল।

পৃ. ১৩, পংক্তি ২৬, 'বিমলা গৃহমধ্যে' এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

বিমলাকে আমরা পূর্ব্বে পরিচারিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে পরিচারিকা বলিতেছি; তিনি পরিচর্য্যার্থ বীরেন্দ্রের বেতনভোগিনী বলিয়া রটনা ছিল, আর

পৃ. ১৪, পংক্তি ৭, 'রসিকরাজ রসোপাধ্যায়' স্থলে 'রসিকদাস স্বামী' ছিল।

পৃ. ১৮, পংক্তি ৪, 'তিলোত্তমা সুন্দরী।' কথা দুইটির পর প্রথম সংস্করণে ছিল—

পাঠককে সুন্দরীর রূপানুভব করাইতে বাসনা করি, কিন্তু কিরূপে সে রূপরাশি অনুভূত করাইব?

পৃ. ১৮, পংক্তি ২৯, 'দৃষ্টি করিতেন না।' কথাগুলির পর ছিল—

তিলোত্তমার সুগঠন নাসিকা কখন নথের ভারবহন যন্ত্রণা ভোগ করে নাই; সে একটু পুরু চামড়ার কর্ম্ম।

পৃ. ১৯, পংক্তি ৭, 'রত্নবলয়' স্থলে 'মাড়ওয়ারী চূড়' ছিল।

পংক্তি ১৫-এর পর প্রথম সংস্করণে এই প্যারাটি ছিল—

এত গভীর কিসের চিন্তা? এ বালিকা বয়সে এত চিন্তা কি জন্য? তিলোত্তমার মনোমধ্যে প্রথম প্রেম-সঞ্চার সুখ প্রবেশ করিয়াছে? হবে!

পৃ. ১৯, পংক্তি ১৮, 'পুস্তকখানি' স্থলে ছিল 'কি পুস্তক পড়িতেছেন?'

পংক্তি ২২, 'পড়িতে পড়িতে' স্থলে ছিল—

"মুখর মধীরং ত্যজ মঞ্জীর; রিপুমিব কেলিষু লোলন্" এই চরণ পড়িবামাত্র

পৃ. ২২, পংক্তি ৯-এর পর নিম্নলিখিত অংশ বাদ গিয়াছে—

আখ্যায়িকা মধ্যে বঙ্গীয় ইতিবৃত্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, অতএব কুমারকৃত এই পঞ্চ-দিনের যুদ্ধকার্য্য আমূল লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল সন্তোষার্থ সংক্ষেপে তাঁহার রণপ্রণালী অত্র স্থলে বর্ণিত করিব।

পৃ. ২৩, পংক্তি ২৮-এর পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

পাষাণ কি মনুষ্য চল গিয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করি! যুদ্ধ গোলযোগ থাক্; বিমলাই ইহার মধ্যে সরস।

পৃ. ২৪, পংক্তি ১৫, 'সুখলালসাপরিপূর্ণা' স্থলে 'মদন-রসলালসা পরিপূর্ণা' ছিল।

পংক্তি ২৩, 'শ্রবণ কর;' কথাগুলির পরে ছিল—

প্রবৃত্তি হয়, কাঁচলিশূন্য বক্ষঃস্থল কালজয়ী কি না দেখ।

পৃ. ২৫, পংক্তি ২, 'রোপিত করিলেন।' কথা দুইটির পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

বিমলা বেতনভোগিনী দাসী, এত ঐশ্বর্য্য কোথা পাইলেন? পরে জানিবে।

পৃ. ২৭, পংক্তি ৭, 'তবে শুনুন,' হইতে পংক্তি ১৩-র 'প্রস্থান করিল।' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

আমার উপপতি আছে।

"উপ-ছাই আছে; কোথা যাবি বল্।"

"বলি।"

এই বলিয়া বিমলা এক বাহু,—স্পর্দ্ধা শুন পাঠক! এক বাহু বীরেন্দ্রের গলদেশে দিলেন, অপর বাহু তাঁহার বক্ষোমধ্যে রোপণ করিলেন; বীরেন্দ্রের হৃদয়ে কাঁচলিমুক্তা স্পর্শ হইল। একবার দ্বারের দিকে নেত্রপাত করিয়া নিজ রসাল ওষ্ঠাধর বীরেন্দ্রের ওষ্ঠে সংলিপ্ত করিলেন।

বিমলা প্রগাঢ় মুখচুম্বন করিয়া বেগে তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

পৃ. ২৮, পংক্তি ২৯, 'কাষ্ঠের পরিমাণ।' কথা দুইটির পর ছিল—

পরিধানে একখানি চারিহাত সাড়ে চারিহাত ধুতি, উরুদেশের সবটুকুই প্রায় দেখা যাইত, তাতে আবার

পৃ. ২৯, পংক্তি ১১, 'রামকান্ত' স্থলে 'রামান্তঃ' ছিল।

পৃ. ৩০, পংক্তি ২-এর পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

আজ মাধবের কপালে বড় আনন্দ; বৃষভানু-সুতা কুব্জাকুটীরে আসিতেছে।

পৃ. ৩০, পংক্তি ১৪-১৫, 'সমাস-পটল···ভোগ দিব।' এই অংশ ছিল না।

পৃ. ৩০, পংক্তি ১৫, 'কচিৎ কৃপাকারিণি!' এই কথা কয়টির পর ছিল—

হে অধমতারিণি,

পৃ. ৩০, পংক্তি ২০, 'উত্তরচরিত' স্থলে 'মালতীমাধব' ছিল।

পৃ. ৩১, পংক্তি ৪, 'মুখচন্দ্র' স্থলে 'মুখ চন্দ্রের' ছিল।

পংক্তি ১০, 'কারণান্তরে' স্থলে 'কুচযুগ দেখিয়া' ছিল।

পংক্তি ১২, 'এ চূড়া' স্থলে 'ইহার পয়োধর' ছিল।

পংক্তি ১৪, 'বসিয়া আছেন।' কথা কয়টির পর ছিল—

নিতম্ব ধরার অপেক্ষায় বৃহৎ, তাহাতে বিস্তর গাছ পালা, গো মনুষ্যাদি থাকিতে পারে, কিন্তু নিকটে উরু স্বরূপ দুইটা কদলী গাছ; কদলীগাছের আওতায় অন্য গাছ গজায় না; আর পাছে কলা গাছ খাইয়া ফেলে বলিয়া বিধাতা তথায় গো মনুষ্যের সৃষ্টি করেন নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই বর্ণনায় যদি কোন অরসিক পাঠক আশ্‌মানির স্বরূপ নিরূপণ করিতে না পারিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে সোজা কথায় বলিয়া দিতে পারি। বিমলার অপেক্ষা আশ্‌মানির বয়স প্রায় সাত বৎসর ন্যূন; মুখ, চোখ, নাক, কাণ সামান্য মত; বর্ণ শ্যামোজ্জল; মুখখানি একটু হাসি হাসি, চক্ষুও সেই ভাব; দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, শ্রী আছে। আকার খর্ব্ব; গঠন স্থূল; বেশ বিন্যাসের বড়ই পারিপাট্য। আশ্‌মানি বড় রসিকা; ব্যঙ্গ ছলনা প্রভৃতিতে বড় ভক্তি। হিন্দুস্থানির কন্যা, ভাল বাঙ্গালা কহিতে পারিত না; তাহার অর্দ্ধেক হিন্দি, অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শুনিয়া দাস দাসী সকলেই হাসিত; আশ্‌মানি

আপনিও হাসিত। আশ্মানি বিমলার ন্যায় বড় চতুরা বলিয়া খ্যাতা ছিল। বীরেন্দ্র জানিতেন সে বড় বিশ্বাসী। বিমলা জানিতেন সে সাধ্বী।

পৃ. ৩২, পংক্তি ৮-৯, এই পংক্তি দুইটি ছিল না।

পৃ. ৩৩, পংক্তি ৯, 'সুন্দরি!' কথাটির পূর্ব্বে ছিল—

রসিকঃ কৌষিকো বাসঃ—

পৃ. ৩৩, ১৮ পংক্তির পর ছিল—

"হাঁ, খাইবে বইকি—এই খাও দেখ" বলিয়া আশ্মানি হস্ত ধরিয়া টানিয়া বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ভোজনপাত্রের নিকট বসাইল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "ছি! ছি! ছি! রাম, রাম, রাম! করিলে কি? করিলে কি? উচ্ছিষ্ট মুখ, তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে?"

"ক্ষতি কি? পিরীতে সব হয়।"

ব্রাহ্মণ নীরব হইয়া রহিলেন।

"খাও।"

"গণ্ডূষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, তুমি আবার স্পর্শ করিলে, আবার খাইব?"

পৃ. ৩৩, পংক্তি ২৫ হইতে ৩৫ পৃষ্ঠায় পরিচ্ছেদের শেষ পর্য্যন্ত অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

"খাও; শোন," আশমানি গজপতির কাণে কাণে কি কহিল।

ব্রাহ্মণ আসন হইতে অর্দ্ধ হস্ত লাফাইয়া উঠিলেন।

"তবে খাই," বলিয়া দিগ্গজ উচ্ছিষ্ট অন্ন গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলেন। নিমেষ মধ্যে ভোজন-পাত্র শূন্য করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি কই?"

"মর্ এঁটো মুখে?"

"হুম্ হুম্—আঁচাই আঁচাই" বলিয়া গজপতি আস্তে ব্যস্তে মুখে জল দিতে লাগিলেন; কতক জল লাগিল কতক জল লাগিল না; দন্তমধ্যে আধপোয়া চালের অন্ন, পান্তা হাঁড়িতে রহিল।

"কই সুন্দরি অধরসুধা কই?"

"মর আগে হাত মুখ মোছ্।"

ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়া কোঁচায় হাত মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। সাড়ে চারি হাত ধুতির কোঁচা তাঁহার মুখ পর্য্যন্ত তুলিলে কাপড় পরা বৃথা হয়,—তা কি করেন?

"এখন সুন্দরি?"

"এদিকে আইস।" দিগ্গজ আশমানির কাছে গিয়া বসিলেন।

"মুখের কাছে মুখ আন।" দিগ্গজ আশমানির মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

"হাঁ কর।" যা বলে তাই, দিগ্গজ আধ হাত হাঁ করিলেন। আশ্মানি রুমাল হইতে একটি তাম্বূল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিল। দিগ্গজ হাঁ করিয়াই রহিলেন।

পাণ চিবাইয়া পাণের পিক এক গাল পরিপূর্ণ হইলে আশ্মানি সেই সমুদায় ছেপ্ দিগ্গজের হাঁর ভিতর নিক্ষেপ করিল।

দিগ্‌গজ এক গাল থুতু মুখের মধ্যে পাইয়া মহা অকষ্ট বন্ধে পড়িলেন ; প্রেয়সী মুখে পান দিয়াছে, ফেলিতে পারেন না, পাছে অরসিক বলে ; গিলিতেও পারেন না, এই ভোজনের পর এক গাল থুতু কেমন করেই বা গেলেন ; নীলকণ্ঠের বিষের ন্যায় গালের মধ্যেই রহিল।

এই অবকাশে আশ্‌মানি একটি খড়কা লইয়া দিগ্‌গজের বিপুল নাসিকার মধ্যে প্রেরণ করিল ; হাঁচি আসিল, আর মুখমধ্যস্থ সমুদয় অমৃতরাশি বেগে নির্গত হইয়া দিগ্‌গজের ক্ষীণ বপুঃ প্লাবিত করিল।

ব্রাহ্মণ দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গাত্র ধৌত করিতে লাগিলেন, এই সময়ে একটি সরস কবিতা আওড়াইলেন।

"দক্ষিণে পশ্চিমে বাপি ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।"

গাত্র ধৌত হইলে পর পুনরপি আশ মানির নিকটে আসিয়া বলিলেন, "প্রেয়সি, এ ত মুখসুধা পাইলাম ; মুখচুম্বন কই ? সুধা চ চুম্বনশ্চৈব নরানাং মাতৃলক্ষণঃ।'

আশমানি বলিল "আমি তোমার মুখচুম্বন করিব, না তুমি আমার মুখচুম্বন করিবে ?"

দিগ্‌গজ মনে ভাবিলেন "আশমানি বহুদর্শী, রসিকা, পাড়া গেঁয়ে মেয়ে নহে, আমি মুখচুম্বন করিলে পাছে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে ত আমাকে অরসিক বলিবে ; অতএব যা শত্রু পরে পরে ;" এই ভাবিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিকে, নায়িকার মান আগে ; তুমিই আমার মুখচুম্বন কর।"

আশমানি বলিল "মুখের নিকট গাল দাও।"

দিগ্‌গজ আশমানির মুখের নিকট গাল দিয়া হাস্‌পাতালের রোগির ন্যায় আড় হইয়া বসিলেন।

আশমানি ডাক্তরের ন্যায় আঁটু গাড়িয়া এক হস্তে তাহার জানু ; আর হস্তে চিবুক বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিল। কর্কশ, রোমশ, গণ্ড ; তাহাতেই অবলীলা ক্রমে আশমানি ছুরিকা অস্ত্রের ন্যায় কয়খানি দাঁত বসাইয়া দিল। প্রথমে কোমল অধর পল্লব-স্পর্শে দিগ্‌গজের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তার পরেই প্রাণ যায়। "উহুঃ উহুঃ, বেশ, উম্‌, ভাল-ও-ও-ও, আর না, আর না, যাই যাই, বেশ, মাগো, ও-ও-ওঁ"

আশমানি দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিল।

দিগ্‌গজ গালে হাত বুলাইয়া দেখেন রক্ত ; বলিলেন "একি রক্ত যে ?"

আশমানি বলিল "তুমি পাগল ? ও যে পাণের পিক্‌"

পৃ. ৩৫, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের গোড়া হইতে পৃ. ৩৬, ১ পংক্তির শেষ পর্য্যন্ত অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

এ দিকে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আশ্‌মানির পুনরাগমন না দেখিয়া বিমলা ব্যস্ত হইলেন, এবং আর প্রতীক্ষা অনুচিত বিবেচনায় স্বয়ং গজপতির অনুসন্ধানে গেলেন। কুটীরমধ্যে বিমলাকে প্রবেশ করিতে দেখিবামাত্র আশ্‌মানি কহিল, "এস এস চন্দ্রাবলি এস।"

দিগ্‌গজ কহিলেন "আজ আমার সুপ্রভাত, এক জনে রক্ষা নাই, আজ দুই জনের উদয়। শাস্ত্রে লিখেছেন, 'এক চন্দ্র স্তমোহন্তি, নচ মূর্খ শতৈরপি'।"

আশ্‌মানি আরবার কহিলেন, "আর শুনিয়াছ ? রসিকরাজের জাত গিয়াছে।"

রসিকরাজ কহিলেন, "কিসে জাত গেল ?"

আশ্‌মানি কহিল "আমার উচ্ছিষ্ট খাইয়াছ।"

রসিকরাজ কহিলেন "ক্ষতি কি? ও আমার মহা প্রসাদ—তুমি আমার মা ভগবতী।

আশ্‌মানি কহিল, "মর!"

এদিকে বিমলা কাণে কাণে আশ্‌মানিকে কহিলেন, "যাবে না?"

"এখনও বলি নাই।"

"তবে আমি বলিতেছি।"

এই কহিয়া বিমলা দিগ্‌গজকে

পৃ. ৩৬, পংক্তি ২৮, 'তল্লাস করি।' কথা কয়টির পর ছিল—

কিন্তু তোমার উপরই আমাদের প্রাণ।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ৫, 'একবারে চলিলাম।' কথা কয়টির পর ছিল—

দেখিতেছ না, অন্য দেশে গিয়া স্ত্রী-পুরুষের মত তিন জনে থাকিব।

পৃ. ৩৭, পংক্তি ৬, 'তৈজসপত্র রহিল যে।' কথাগুলির পর ছিল—

"দ্রব্যসামগ্রী ত বিস্তর।"

"তৈজসপত্র।"

পৃ. ৩৭, পংক্তি ১০, 'বিমলা বলিলেন' এই কথা দুইটির স্থলে ছিল—

বিমলা ভাবিলেন "এর পুথিপাঁজি ত ঢের।" ভাবিয়া বলিলেন

পৃ. ৩৭, পংক্তি ১৯, 'আসিতে পারিল না···তাকে কেন?' এই অংশের পরিবর্তে ছিল—

ধরা পড়িয়াছে, আসিতে পারিল না। কেন আমাতে কি তোমার মন উঠে না?

পৃ. ৩৮, পংক্তি ২৫, 'কলসী দিব ফেলে।' কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ৪১, পংক্তি ২৬, 'দেখিতে পাইলেন,' কথা দুইটির পর ছিল—

বিমলা আরও ভীতা হইলেন,

পৃ. ৪১, পংক্তি ২৭, 'মন্দিরাভিমুখে চলিলেন;' কথা কয়টির পর ছিল—

লম্ফ দিয়া মন্দিরের সোপানাবলি আরোহণ করিলেন;

পৃ. ৪৩, পংক্তি ২, 'করিয়াছে।' কথাটির পর 'এত বীর্য্য!' কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২, 'অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না।' কথাগুলির স্থলে ছিল—

অন্য কাহারও কখন পাণিগ্রহণ করিব না।

পৃ. ৪৮, পংক্তি ৯, 'অম্বরপতির' স্থলে 'আব্‌নীর্ পতির' ছিল।

পৃ. ৫০, ২৩ পংক্তির পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

রাজকুমার জানিতে পারিলেন, বিমলা গদ্‌গদ্‌স্বরে কথা কহিতেছেন, চক্ষে একবিন্দু বারি আসিয়াছে। সাতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, "সখি, আমি তোমার সাহস ও চতুরতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।

এক্ষণে তোমার চক্ষের জলে আরও সুখী হইলাম ; তুমি রমণী-রত্ন। যদি তুমি অসন্তোষ না হও, তবে আজি হইতে তোমায় সখী সম্বোধন করিব।"

পৃ. ৫১, পংক্তি ৪, 'উদ্ঘাটন করিলেন,' কথাগুলির পর ছিল--
সেই কক্ষ-মধ্য হইতে রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

পৃ. ৫১, পংক্তি ৬, 'আবার কাঁপে,' কথা দুইটির পর ছিল—
বুঝি স্পষ্ট জবাব দিলে!

পৃ. ৫১, ৯ পংক্তির পর এই অংশ ছিল—
বিমলা ডাকিয়া কহিলেন, "রাজকুমার, তিলোত্তমার সাক্ষাৎ লাভ কর।"
রাজপুত্রের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

পৃ. ৫১, পংক্তি ১৮, 'রহিয়াছেন ;' কথাটির পর ছিল—
শরীরভঙ্গী সে সময় দেখিলে কে নবযুবতীর প্রণয়স্পৃহা করিত ?

পৃ. ৫১, পংক্তি ১৯, 'হাস্য করিলেন।' কথা কয়টির পর ছিল—
পুরুষরত্ন জগৎসিংহকে স্বয়ং সযত্নে আনিয়া তাঁহাকে তিলোত্তমার আরাধনায় প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ক্ষোভে কি বিমলা হাসিলেন ? না ; তাহাতে বিমলার ক্ষোভ কিছুমাত্র নাই ; বরং অপরিমিত সুখ।

পৃ. ৫২, পংক্তি ১৬, 'সুন্দরীর মুখে···শুনায় না।' এই অংশের পরিবর্তে ছিল—
চীৎকার করিলে তোমার ও কোমল দেহ ছাদের উপর হইতে নিক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ করিব না।

পৃ. ৫৩, পংক্তি ১, 'ছাদ হইতে···ফেলিয়া দেওয়াও' কথা কয়টির পরিবর্তে ছিল—
সৈনিকের যে কথা সেই কাজ, করাও

পৃ. ৫৪, ৭ পংক্তির পর ছিল—
বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "অঙ্গস্পর্শ দূরে থাক্, এইমাত্র নীচে নিক্ষেপ করিয়া আমার অঙ্গ চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন।"

সেনাপতি কহিলেন, "প্রয়োজন পড়িলে সকলই করিতে হয় ; প্রয়োজন হইলে এখনও করিতে হইবেক।"

পৃ. ৫৪, পংক্তি ১৯, 'বস্ত্র ধরিলেন।' কথাগুলির পর ছিল—
বিমলা ওসমানের সতর্কতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

পৃ. ৫৪, পংক্তি ২২-২৩, 'বিমলাকে এক শত···এই বলিয়া' অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ৫৪, পংক্তি ২৫, 'প্রেমের ফাঁস' কথা দুইটির পরিবর্তে 'যুদ্ধের প্রয়োজন' ছিল।

পংক্তি ২৭-২৮, 'বিমলা চীৎকার···পাইল না।' এই অংশের পরিবর্তে ছিল—
কিয়দ্দূর গমন, পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের জিহ্বাকে বিশ্বাস নাই।" এই বলিয়া বিমলার মুখও বন্ধন করিয়া রাখিয়া গেলেন।

পৃ. ৫৫, পংক্তি ১১, 'প্রহরী থাক ;' কথাগুলির পর 'মুখের বন্ধন খুলিয়া দাও ;' ছিল।

পৃ. ৫৬, পংক্তি ২৫, 'সঙ্গে সঙ্গে নিজ' কথা কয়টির পর 'কামাগ্নি-বৃষ্টি-কারক' ছিল।

২৮ পংক্তির পর নিম্নলিখিত প্যারাটি ছিল—

অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শ হইল ; প্রহরীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

পৃ. ৫৭, পংক্তি ৬, 'কি বলিবে ?' কথাগুলির পর ছিল—

বিমলা প্রহরীর বাহুমধ্যে বাহু দিলেন—বাহুতে স্থূল বাহুর স্পর্শে আবার প্রহরী রোমাঞ্চিত হইল।

পৃ. ৫৭, পংক্তি ১০, 'আবার সেই' কথা দুইটির পর 'কামাগ্নি পূর্ণ' ছিল।

১২ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—

দিগ্‌গজ! দেখ আসিয়া, তোমার মত পণ্ডিত আরও আছে!

পৃ. ৫৯, পংক্তি ৩, 'মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ' কথাগুলির স্থলে 'দৃঢ়তর কঙ্কালবদ্ধ' ছিল।

পৃ. ৬০, পংক্তি ১৯-২০, 'ও রে,···মিলেছে রে!' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

একটা স্ত্রীলোক রে! স্ত্রীলোক রে! স্ত্রীলোক!

পৃ. ৬১, পংক্তি ৭-৮, 'নীরবে···নিরীক্ষণ করিতেছেন' কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

স্বকরে সুন্দরীর করপল্লব গ্রহণ করিয়াছেন

পৃ. ৬১, পংক্তি ১০, 'বিদায়ের রোদন।' কথা দুইটির পর ছিল—

যাহা হউক, ইহারা এ বিষম বিপত্তি কিছুই জানিতে পারে নাই। এ সংসারে প্রেমই ক্ষমতাবান্! এ বিষম কোলাহলেও কর্ণ থাকিতে দুই জনকে বধির করিয়াছে।

পৃ. ৬১, ১৩-১৫ পংক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

যখন বিমলা আসিয়া আগতপ্রায় মহা বিপদের সম্বাদ দিলেন, জগৎসিংহ প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই নিকটে কোলাহল ধ্বনি প্রবল হইয়া উঠিল ; আর অবিশ্বাসের স্থান রহিল না। বিমলা কহিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ; শত্রু আর তিলার্দ্ধ মধ্যে আসিবে।"

পৃ. ৬১, পংক্তি ২৫-২৬, 'একা কি করিতে পারি ? তবে' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

"হা বিধাতঃ! এই কি তোমার ইচ্ছা ? এমন সময়ে কি আমায় অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকের অঞ্চল ধরিয়া থাকিতে হইল ?"

গর্ব্বিতা বিমলারও অভিমানাগ্নি জলিয়া উঠিল ; রাজপুত্রকে কহিলেন, "কি প্রয়োজন যুবরাজ ? আমি কিছু না পারি তিলোত্তমার নিকটে দাঁড়াইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারিব।" বিমলার নয়ন-পল্লব জল-ভারাবকীর্ণ হইল।

রাজপুত্রও মনঃপীড়িত হইয়া কহিলেন, "আমি তিলোত্তমাকে এ দশায় রাখিয়া কোথায় যাইব ? আমিও

পৃ. ৬২, পংক্তি ১৭, ‘কটিস্থিত’ স্থলে ‘কঙ্কালের’ ছিল।

পৃ. ৬৩, পংক্তি ১, ‘কটি’ স্থলে ‘কঙ্কাল’ ছিল।

পংক্তি ৪, ‘কটিদেশে’ স্থলে ‘কঙ্কালে’ ছিল।

পৃ. ৬৭, পংক্তি ২২, ‘কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়’ কথাগুলির স্থলে ছিল—
কিন্তু গায়ে ঠেকিও না, ফোস্‌কা পড়িবে

পৃ. ৬৭, পংক্তি ২৫ ‘অথচ’ কথাটি ঐখানে ছিল না, কিন্তু এই পংক্তির শেষে ছিল—
অথচ আলোর আকরের দিকে চাহিবার শক্তি কাহার ? সে অগ্নিময়।

পৃ. ৬৮, পংক্তি ৭, ‘কেশ রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিতাম ;’ কথাগুলির স্থলে ছিল—
চুল আঁচড়াইয়া দিতে পারিতাম ; একগাছি বাঁকা নহে, একগাছি আর একগাছির সঙ্গে জড়ান নয় ;

পৃ. ৬৮, পংক্তি ২১, ‘ধীর মধুর কটাক্ষ !’ কথা কয়টির স্থলে ছিল—
চঞ্চল কটাক্ষ ! যোগবল না থাকিলে

পৃ. ৬৮, পংক্তি ৩০, ‘দেখিতে লাগিল।’ কথা দুইটির পর ছিল—
পাঠানেরই বা উহাতে দোষ কি ?

পৃ. ৭১, পংক্তি ৫-৬, ‘ওস্‌মান !···বাহির হইব না।’ এই অংশের স্থলে ছিল—

“একথা আমার পিতার নিকট উত্থাপন করিও, তোমাকে অদেয় তাঁহার কিছুই নাই।”

“একথা আমি তাঁহার নিকট প্রস্তাবিত করিতে ত্রুটি করি নাই।”

“কি উত্তর পাইয়াছিলে ?”

“তিনি বেগমের নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, তোমার মনোমত পাত্রে তোমাকে সমর্পণ করিবেন তোমার মন আজও জানিতে পারিলাম না।”

আবার সেই সৌন্দর্য্যমহিম মুখে মনোমোহন হাস্য প্রকটিত হইল। আয়েষা হাসিয়া কহিলেন, “স্ত্রীলোকের মন পুরুষে কবে জানিতে পারিয়াছে।”

“ইহাতে কি বুঝিব ?”

“যে আমি তোমাকে ভাল বাসি।”

ওসমানের শ্রীমতী মুখকান্তি হর্ষোৎফুল্ল হইল।

“ভবিষ্যৎ স্বামী ভাবিয়া স্নেহ কর ?”

“আমার প্রিয়তম ভ্রাতা জানিয়া স্নেহ করি।”

পৃ. ৭১, পংক্তি ২৪, ‘গতিক মন্দ।’ কথাগুলির পর ‘নাড়ী অত্যন্ত এলোমেলো।’ কথা কয়টি ছিল।

পৃ. ৭৪, পংক্তি ২১, 'জীবনে প্রয়োজন ?' কথা কয়টির পর ছিল—
তুমি যদি কেবল আমার প্রাণ বধ করিয়া ক্ষান্ত হইতে,—আমি

পৃ. ৭৫, ৯-১০ পংক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত অংশটুকু ছিল—

কহিলেন, "কি ? এ দগ্ধ হৃদয় চরণে দলিত না করিলে তোমার পরিতোষ জন্মায় না ?" পরে অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া কহিলেন, "তাহাই কর। আমি এ জন্মে আর তোমার কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট ইহার উত্তর দিও।"

কতলু খাঁর হৃদয়ে আঘাত লাগিল; পবিত্র নামে কোন্ পাপাত্মার শঙ্কা না হয় ? সে কহিল, "আর না। জল্লাদ! বধ কর্।"

পৃ. ৭৬, পংক্তি ২৮, 'যাইব।' কথাটির পরিবর্ত্তে ছিল—
না, কিঞ্চিৎ বিলম্বে।

পৃ. ৮০, পংক্তি ৩-৪, 'কতলু খাঁর অজ্ঞাতসারে···বলিয়া রাখিয়াছি।' অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ৮১, পংক্তি ৫-৬, 'এক দিনের তরেও···কর্ম্ম করুন।' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—
আপনি এ অপবিত্রাকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, আপনি সখার কার্য্য করুন।

পৃ. ৮১, পংক্তি ২৮, 'কলঙ্কিত হইয়া' স্থলে 'পিতৃতিরস্কারে অপমানিত হইয়া' ছিল।

পৃ. ৮২, পংক্তি ৩, ৬, 'শূদ্রী' স্থলে 'ছেত্রি' ছিল।

পৃ. ৮২, পংক্তি ২৪, 'প্রবল হইয়াছিল।' কথা দুইটির পর ছিল—
কেহ কেহ বলিত যে, এক জন যোগী কোন যোগসাধন জন্য বিনাশার্থ বালকসংগ্রহ করিত।

পৃ. ৮৫, পংক্তি ৫-৭, 'কিন্তু কি বলিয়াই · পারিবেন না বুঝিলেন।' এই অংশের স্থলে ছিল—
তিনি নিত্য নিত্য পিতার নিকট যাতায়াত করিতেন, এবং অনেক ক্ষণ থাকিতেন, অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেন, গল্প করিতেন, আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মধুর বাক্য-স্রোতঃ শ্রবণদ্বারে পান করিতাম। কায়মনে তাঁহার দাসী হইলাম; তিনিও আমাকে নিতান্ত ঘৃণা করিতেন না। সঙ্ক্ষেপে বলি, উভয়ে উভয়ের মন জানিতে পারিলাম। তাঁহার সহিত কথা কহিলাম। যে কথা আমার কাণে কাণে কহিয়াছিলেন, আজও মধুর বীণার ন্যায় কর্ণরন্ধ্রে বাজিতেছে।

প্রাণনাথের নিকটে বিনা মূল্যে চিত্ত বিক্রয় করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু মাতার দুর্দ্দশা আমার চিত্তে জাগরিত হইত; ধর্ম্ম বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইলাম। তথাচ তাঁহার অনুরাগের লাঘব হইল না।

পৃ. ৮৫, পংক্তি ২৪, 'করিতে লাগিলেন।' কথাগুলির পর ছিল—
বিচ্ছেদ কালে প্রণয়ী কি পদার্থ তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম।

পৃ. ৮৫, পংক্তি ২৯, 'সঙ্গে যাইব।' কথা দুইটির পর ছিল—
আবার প্রাণেশ্বরকে মনে পড়িল ; কহিলাম,

পৃ. ৮৬, পংক্তি ১১, 'অম্বরের' স্থলে 'আবনীরের' ছিল।

পৃ. ৮৭, পংক্তি ১৪-১৫, 'শীঘ্র মরিব,…বলিতে পারিতেছি।' এই অংশ ছিল না।

পৃ. ৯০, পংক্তি ৫, 'ঘনগর্জ্জন হইতেছে?" কথা কয়টির পর 'ঝড় বহিতেছে?' ছিল।

পংক্তি ১০, 'রোদন কর?' কথাগুলির পর ছিল—
কাহার সুখের জন্য দিন বসিয়া থাকে? তবে কেন আস্ফালন কর?

পৃ. ৯২, পংক্তি ৫, 'একবার আসিতেন।' কথা দুইটির পর ছিল—
তাহাও যখন আসিতেন, প্রায় ওসমানের সমভিব্যাহারে আসিতেন।

পৃ. ৯৪, পংক্তি ২৯, 'পড়িত লাগিল।' কথাগুলির পর ছিল—
চক্ষের জল এখনও শুকায় নাই ; অৰ্দ্ধেক রোদন অৰ্দ্ধেক স্বর!

পৃ. ৯৫, ৯ পংক্তির পর ছিল—
দিগ্‌গজ কহিলেন, "তাহার পর আবার আমাকে কল্মী পড়াইলেন।"
"কল্মা পড়াইলেন, তার পর?"

পৃ. ৯৬, পংক্তি ১৪, 'শক্তি নাই।' কথা কয়টির পর ছিল—
রাজপুত্র ওসমানের কথা গ্রাহ্য না করিয়া

পৃ. ১০৩, পংক্তি ১০, 'দিল্লীশ্বরের কি?' কথা দুইটির পরে ছিল—
রাজপুত কুলের কি? দিল্লীশ্বরের অনেক সেনাপতি আছে ;

পৃ. ১০৬, পংক্তি ১৮, 'বাস মধ্যে লুক্কায়িত' কথাগুলির পর 'কঙ্কালস্থ' কথাটি ছিল।

পৃ. ১০৮, পংক্তি ৪, 'বিমলা' কথাটির পর ছিল—
তিলোত্তমার মুখচুম্বন করিয়া

পৃ. ১০৯, পংক্তি ২০, 'আনন্দে উন্মত্ত।' কথা দুইটির পরিবর্ত্তে ছিল—
পানাসক্ত হইয়া নিজ নিজ আনন্দ ব্যক্তি করিতেছিল।

পৃ. ১১৪, পংক্তি ৪, 'সে যতদূর জানে,' স্থলে 'প্রহরীর জানিত কথা' ছিল।

পৃ. ১১৫, পংক্তি ১৫, 'সঙ্কোচ করিবেন না।' কথা কয়টির পর ছিল—
ভগিনী যেমন সহোদরের প্রতি কোন আদেশ করিতে সঙ্কোচ ত্যাগ করে আপনিও সেইরূপ করিবেন।

পৃ. ১১৫, পংক্তি ২১-২২, 'আমার মনের…পারি না।' এই অংশ ছিল না।

পংক্তি ২৫-২৬, 'আবার তখনই…ত্যাগ করিয়া,' এই অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ১১৫, পংক্তি ২৬, 'কুমার!' কথাটির স্থলে ছিল—
"জগৎ"

আয়েষা বলিতে বলিতে ক্ষণকাল নীরব হইলেন, তিনি রাজকুমারকে "জগৎ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। পরে কহিতে লাগিলেন, "জগৎ,

পৃ. ১১৬, পংক্তি ৪, 'রহিলেন।' কথাটির পর ছিল—
করে কর বদ্ধ তেমনই রহিল ;

পৃ. ১১৬, পংক্তি ৯-১০, 'গোলাব ফুলটি···শত খণ্ড হইলে' এই অংশের স্থলে ছিল—
জগৎসিংহের করাকর্ষণ করিয়া নিজ পার্শ্বে চৌপাঙ্গীর উপর বসাইলেন। রাজপুত্র বসিলে পূর্ব্ববৎ তাঁহার হস্তের উপর হস্ত রাখিয়া

পৃ. ১২০, পংক্তি ১৭, 'খচিত, দেখ!' কথা দুইটির পর ছিল—
কি বিশালায়ত লোচন! কেমন মেঘবৎ নীল, কি বিদ্যুৎবৎ কটাক্ষ।

পৃ. ১২০, পংক্তি ২৬, 'তাহাই কি দেখাইতেছ?' কথাগুলির পর ছিল—
আর এই যে গুরু নিতম্বিনী, নিদ্রাবশে সঙ্গিনীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া হেলিয়া পড়িয়াছে, উহাকে উঠিয়া বসিতে বল, বসিবার ভঙ্গীতে পীনোন্নত পয়োধর আরও পীনোন্নত দেখাইতেছে; কতলু খাঁ থর থর চাহিতেছে; উঠিয়া বসিতে বল।

পৃ. ১২১, পংক্তি ১, 'হাসিতেছ কিরূপে?' কথা কয়টির পর ছিল—
ও ত সহজ হাসি নহে; এ হাসিতে মুনীন্দ্র মুগ্ধ করিতে পারে।

পৃ. ১২১, পংক্তি ৭, 'গায়িকাদিগের' স্থলে 'গায়কীদিগের' ছিল।

পংক্তি ১১, 'মস্তক-দোলন' স্থলে 'মাথা লাড়া' ছিল।

পংক্তি ১৩, 'নাচিতেছে।' কথাটির পর ছিল—
আহা আহা! আহা হা! চলুক! চলুক!

পৃ. ১২১, পংক্তি ১৪-১৭, উঃ! কতলুর শরীরে···তুমি কোথা, প্রিয়তমে!" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—
কালানল জ্বলিতেছে! উঃ কতলুর শরীরে অগ্নি জলিতে লাগিল। পিয়ালা! আহা হা! দে পিয়ালা! আ, হা! আহা! আহা হা! আবার কি? এর উপর হাসি, এর উপর কটাক্ষ? সরাব দে সরাব! ওকি—কাঁচলি?

ওকি জাঁহাপনা? ওকি ওকি?—

হাসিতে হাসিতে রমণী মণ্ডলী উঠিয়া গেল।

বিমলা চকিতের ন্যায় কতলু খাঁর ভুজগ্রন্থি-মধ্য হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন।

কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া বিমলা কহিলেন "জাঁহাপনা, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। প্রদীপ জ্বলিতেছে।"

উন্মত্ত কতলু ফুৎকার দিয়া প্রদীপ সকল নিভাইতে লাগিল। বিমলা সকল কার্য্যে পটু, ক্ষণ কালমধ্যে সকল প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিলেন।

গৃহ অন্ধকার হইলে কতলু খাঁ কাতর-স্বরে কহিল, "কোথা গুল্‌বদন ?"

পৃ. ১২১, পংক্তি ২০, 'তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর' কথা দুইটির পূর্ব্বে ছিল—

কতলু খাঁ বিমলাকে বক্ষে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল।—

পৃ. ১২১, পংক্তি ২৩, 'চীৎকার করিল।' কথা কয়টির পর ছিল—

চীৎকার করাতে মুখ দিয়া ঘড়ঘড়ী উঠিল।

পৃ. ১২১, পংক্তি ২৭, 'বিবিরা যথাসাধ্য চীৎকার করিতে লাগিল।' এই অংশ ছিল না।

পৃ. ১২৩, পংক্তি ১৮, 'নিস্পন্দ।' স্থলে ছিল—

"নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।"'

পৃ. ১২৩, ২৫ পংক্তির পর নিম্নলিখিত অংশ ছিল—

কতলু খাঁ কহিলেন, "হস্ত।"

অভিপ্রায় বুঝিয়া ওসমান জগৎসিংহ-হস্ত গ্রহণ করিয়া তদুপরি কতলু খাঁর হস্ত স্থাপন করিলেন। জগৎসিংহের শরীরে অগ্নিবৃষ্টি হইল, কিন্তু নিবারণ করিলেন না।

পৃ. ১২৮, পংক্তি ২৮, 'আয়েষা অধীরা। কথাগুলির পর ছিল—

তাহা হইলে আমার হৃদয়ে ক্লেশ হইবে।

পৃ. ১২৯, পংক্তি ১৬, 'তাহাতে' স্থলে 'লোকে দোষিলে' ছিল।

পংক্তি ২৮, 'গ্রহণ করিও।' কথা দুইটির পর ছিল—

পিতার স্নেহের গুণে কন্যা হইয়াও যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছি তাহা ধনহীন দেশে রাজ্য বলিয়া গণিত; যদি তা আবনীর বংশে অগ্রাহ্য না হয়, তবে আসিয়া অধিকার করিও।

দানপত্র ঐ সিন্দুকে পাইবে।

পৃ. ১৩০, পংক্তি ৬-৭, 'এ পত্রের··· ইহার উত্তর দিব।' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

এই মাত্র জানিও যে তোমাকে চিরকাল প্রাণাধিক সহোদরা ভগ্নী জ্ঞানে হৃদয় মধ্যে যত্ন করিব।

পৃ. ১৩১, পংক্তি ১১, 'যাওয়া উচিত কি ?' কথা কয়টির পর ছিল—

পরে দেখিলেন, যে লেখা পরিশুদ্ধ দেবনাগরাক্ষরে, সুতরাং ব্রাহ্মণের লিপি হওয়াই সম্ভব।

পৃ. ১৩৪, পংক্তি ২৪, 'অমনই সরিয়া গেলেন।' কথাগুলির পর ছিল—

তিলোত্তমা ধরিতে গেলেন, জগৎসিংহ আরও সরিয়া গেলেন ;

ভ্রম-সংশোধন : এই গ্রন্থের "ভূমিকা (সম্পাদকীয়)" অংশে একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। পৃ. ৬/০, পংক্তি ২৮, "দামোদর মুখোপাধ্যায়" স্থলে "বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দামোদর মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে" হইবে।